দরিদ্রের ক্রন্দন

ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়,
এম-এ, পি-এইচ-ডি

দ্বিতীয় সংস্করণ
(পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত)

দি বুক্ কোম্পানি লিমিটেড্,
৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র
৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীশরৎশশী রায়
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১এ, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

S.E. 1927

নিবেদন

এই দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে যাদের অন্নবস্ত্রাভাব, হৃদয়ের বল ও অন্তরের আনন্দ আজ পর্য্যন্ত দূর করিতে পারে নাই, বাহ্য জীবনের গভীর নৈরাশ্য অবসাদে যারা আত্মপ্রসাদ হারায় নাই, প্রকৃতি ও ভগবানের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ সত্য ও জীবন্ত, আমার জাতির অন্তরতম প্রাণ—যারা আমার শ্রদ্ধেয়, আমার নারায়ণের প্রতিরূপ, যারা আমার ভক্তি ও পূজার পাত্র, ভারতের সেই বেদনায় চিরমূক জনসাধারণকে আমার ভক্তির নিদর্শন ও পূজার চিহ্নস্বরূপ তাহাদেরই নামে ও উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রচার করিলাম।

উৎসর্গপত্র

জগৎ অশ্রুতে ভরা। কেহ দুঃখে কাঁদছে, কেহ সুখে কাঁদছে, কেহ বা লোভের অতৃপ্তিতে কাঁদছে, কেহ বা দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের অভাবে কাঁদছে। রোগ, শোক, ভয়, অভাব, দৈন্য কত রকমেই না মানুষ কাঁদছে। কিন্তু সব চাইতে বুকফাটা অশ্রুজল কাদের?—তাদের,—যাদের দু'বেলা দু'মুঠো জোটে না ব'লে সমস্ত দেহটা, সমস্ত অস্তিত্বটা কোন রকমে শুধু টিকে থাকার জন্য কাঁদছে, যাদের শীতবস্ত্র দূরে থাক, লজ্জাবস্ত্রেরও অভাব,—আর যাদের মাথা ঢাকবার জায়গা গাছের ছায়া বা আকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই, দেশে যাদের ক্রন্দন দিনে দিনে, বর্ষে বর্ষে, জ'মে উঠে ক্রমশঃ দীননাথের চরণতল ছোঁবার জোগাড় করছে, যাদের দিনে দিনে, মাসে মাসে, অত্যাচার অবিচার ও বেদনার স্তূপ নারায়ণের সুদর্শনে বিদ্যুৎ আর বজ্রাগ্নিকে ঘনিয়ে তুলছে, যাদের

বংশপরম্পরাসঞ্চিত অপমান ও অভিমান ভাগ্যদেবতাকেও বিদ্রূপ করছে, তাদের এই

চিরন্তন ক্রন্দন

তাঁদেরই পুণ্যনামে উৎসর্গ ক'রলাম। যাঁরা এক দিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই ক্রন্দনে নিজেদের নানা কর্ম্ম, নানা স্বার্থ হ'তে মুখ তুলে সতৃষ্ণনয়নে এদের দিকে চেয়েছেন, অন্ততঃ এক দিনের জন্যও যারা ক্রন্দন হৃদয়ে অনুভব ক'রে অন্ততঃ এক মুঠোও তুলে রেখেছেন,—এক মুহূর্ত্তের জন্য যাদের অশ্রু নিজেকে ছাড়িয়ে পরের জন্য গড়িয়েছে,—

আমরা এই দরিদ্র দেশের বুকফাটা অশ্রুর এই এককণা তাঁদের চরণেই উৎসর্গ ক'রলাম।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
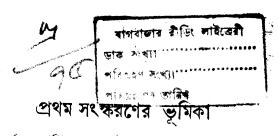
বর্ত্তমান দারিদ্র্য-সমস্যা এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের সহিত দেশের জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্য রাখিয়া বৈষয়িক উন্নতিসাধনের পন্থা ইঙ্গিত করিয়াছি। শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ-সংস্কার-ক্ষেত্রের মত বৈষয়িক-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অনুকরণের ভুল দেখাইয়া জাতীয় বৈষয়িক আদর্শের ক্রমবিকাশ সাধনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভারতীয় সমাজতত্ত্বের মত ভারতীয় বৈষয়িক তত্ত্বের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে—দুঃখের বিষয় এই বৈষয়িক যুগেও দেশে ভারতীয় বৈষয়িক তত্ত্ব এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। বৈষিয়ক ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তায় আমরা বিদেশীমোহে মুগ্ধ, আর কার্য্যে আলস্য ও জড়তায় আচ্ছন্ন। বিদেশী নাগরিক আদর্শের এখন প্রতিপত্তি। পল্লীগত প্রাণ ভারতীয় সভ্যতায় পল্লী-সমাজের অবনতিতে শুধু চিন্তারাজ্যে নহে, বৈষয়িক-ক্ষেত্রেও বিশেষ দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইয়াছে। দেশের দারিদ্র্যের সহিত পল্লীর অবনতির যে যোগাযোগ আছে তাহা দেখাইয়া পল্লীসমাজের উন্নতি ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন এখনই না করিলে আর দেরী সহিবে না। প্রত্যেক জিনিষের একটা সীমা আছে, আমাদের দারিদ্র্য সেই সীমাতেই পৌঁছিয়াছে। হয় ত অতিক্রম করিয়াছে।

বৈষয়িক তত্ত্ববিষয়ক আমার সব আলোচনাই ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী,' "গৃহস্থ" 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। "পল্লী-সেবক" সাহিত্য সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে ও "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা" উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। অনেক পত্রিকাতেই সে সময় এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। বিশেষতঃ 'পল্লী-সেবক' স্বতন্ত্রভাবে চতুর্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছে। বাকী অধ্যায়গুলি বহরমপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম অথবা পরিষদের মুখপত্র 'উপাসনা'র 'আলোচনা'র জন্য লিখিয়াছিলাম। কাশীমবাজারের মহারাজা মাননীয় স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বহরমপুর-পরিষদের প্রায় সকল অধিবেশনের সভাপতি থাকিয়া আমার প্রবন্ধ পাঠ শুনিয়াছিলেন। আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া এবং বহরমপুর-পরিষদ হইতে এই পুস্তকের প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া তিনি আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বহরমপুর পরিষদের সম্পাদক প্রবীণ লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকের কিয়দংশের প্রুফ দেখিয়া দিয়া এবং আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট কয়েক স্থানে ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে ঋণপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

আচার্য্য ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বৈষয়িক তত্ত্ব লইয়া আমাকে অনেক উপদেশ দেন। আমার ইংরেজীগ্রন্থ "The Foundations of Indian Economics" (লংম্যান্স

কর্ত্তৃক যাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে) প্রণয়নকালে তাঁহার নিকট যে সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম, বলা বাহুল্য বর্ত্তমান পুস্তক রচনার সময়ও তাহা হইতে বঞ্চিত হই নাই। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সাহায্য ও উৎসাহ ভুলিবার নহে। তিনি সুদূর ইংলণ্ড আমেরিকা ও জাপানে থাকিয়াও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। যদি 'দরিদ্র্যের ক্রন্দন' দেশবাসী সকলে শুনে তবেই তাঁহার মত লোকের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি।

দারিদ্র্য লইয়া শুধু কি অভাবক্লিষ্ট শিল্পী, বা ধনবিজ্ঞানবিৎ আলোচনা করিবেন? শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি, এমন কি ধর্ম্মের উন্নতি, দারিদ্র্য মোচন না হইলে অসম্ভব। শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক আর কতকাল শুধু কল্পনারাজ্যেই ঘুরিবেন? বাস্তবরাজ্যে একবার নামুন, বাস্তবের হাহাকার, দুঃখ বেদনার মধ্যে শিক্ষার ফল, বা ধর্ম্মের ভাবুকতা পাইবার কেহ কি কখনও আশা করেন?

দেশের সাহিত্যও এই বাস্তবকে আশ্রয় করুক। বাস্তবকে হীন ও হেয় বলিয়া উড়াইয়া দিবার ফলে বর্ত্তমান সাহিত্য কৃত্রিম হইতে চলিয়াছে। সাহিত্যের মূল হইতেছে বাস্তব, তাহাকে ছাড়িয়া ভাবরাজ্যের কলা ও সৌন্দর্য্যের উপাদানকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের জীবনী শক্তির হ্রাস লক্ষিত হইয়াছে।

সাহিত্যের পক্ষেও মঙ্গল, দেশের পক্ষেও মঙ্গল, বাস্তবকে সকলে দেখুক, চিনুক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন করুক। বাস্তবের এখন একমাত্র নিদর্শনই হইয়াছে

অভাবের নিদারুণ অভিযোগ, অনশন ও অর্দ্ধাশনের হাহাকার। সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠুক। সাহিত্যের ভিতর দারিদ্র্যের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিপ্রাণকে স্পর্শ করিয়া দেশের জ্ঞানী ও কর্ম্মীকে কল্পনা ও আলস্য হইতে জাগ্রত করুক। বর্ত্তমানে বঙ্গসাহিত্য বহুমুখী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু আধ্যাত্মিক অভাব অভিযোগের অপেক্ষা আধিভৌতিক অভাব এতই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে যে, আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে এই উপচীয়মান দারিদ্র্যের আক্রমণে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ত দূরের কথা, জাতীয় অস্তিত্বের বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইবে। অন্নসংস্থান যদি না হইল তাহা হইলে কি হইবে আমার সাহিত্য-কলা-বিজ্ঞান-দর্শন লইয়া? আমার নিজের দেহের লজ্জাই যদি একখানা মোটা বস্ত্রে দূর করিতে না পারি, জগতের মহাজাতির সভায় তবে আমার সাহিত্য ও দর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বক্তৃতা দ্বারা প্রচার করিবার জন্য কি হইবে প্রতিনিধি পাঠাইয়া?

আমার আজকাল যাহা প্রতিদিনকার অতি দুঃখের কথা, অতি লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, সেই জাতীয় দারিদ্র্য, আমার বাস্তবজীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের বেদনা, আমার অভাবাহত চৈতন্যের হাহাকার, আমার সাহিত্যের অন্তরে প্রকাশিত হয় নাই কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গের কৃষক', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', লাল-বিহারী দে-র ইংরেজী "গোবিন্দসামন্ত" সাহিত্যে যে সমবেদনা ও সহানুভূতির সুর জাগাইয়াছিল, সে সুর বন্ধ হইয়া গেল কেন? এখন ত আরও অভাব আরও বেদনা আরও হাহা-কার। আরও সমবেদনা, আরও সহানুভূতি এখন চাহি—

কোথায় পাইতেছি ? আমরা হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছি। হৃদয় চাই, প্রেম চাই। প্রেমধারায় সমগ্র সমাজকে ভাসান চাই। দারিদ্র্যের আকুল ক্রন্দন ভগীরথের শঙ্খনিনাদের মত দেশের নূতন সাহিত্যধারাকে আহ্বান করিতেছে। নূতন সাহিত্য আমার দেশের কর্ণে প্রেমের পতিতোদ্ধারণ মন্ত্র শুনাইয়া তাহাকে ভাবতরঙ্গোচ্ছ্বসিত পূত প্রেমধারায় অভিষিক্ত করিয়া, সুজলা সুফলা বিচিত্র ফল-পুষ্প-সম্পদসৌন্দার্য্য শোভিত করিয়া বিশ্বমানবের মহাসাগর সঙ্গম-তীর্থের সঙ্গে তাহার যোগ স্থাপন করুক।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সন ১৩২২ সাল

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বিষয় সূচী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। পল্লী গঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে যে আদর্শ এই পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা দেশে কার্য্যে—পরিণত হইতে পারে নাই। এই কয় বৎসরের মধ্যে পল্লীর আরও অবনতি দেখা গিয়াছে। এই অবনতির পরিমাণ দেখাইয়া এ সম্বন্ধে দেশের দায়িত্ব উদ্বোধন করিতে আবার চেষ্টা করিতেছি। ইহা শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নহে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে পল্লীর উথান পতনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। একটা কর্ম্মঠ, স্বাধীন সমৃদ্ধি-শালী, পল্লীজীবন ফিরিয়া না পাইলে দেশের নূতন প্রজাতন্ত্র ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইহা প্রজাতন্ত্র নহে, প্রজাতন্ত্রের বিকার মাত্র। ইহাতে কৃষকের মঙ্গল নাই।

এ দিকে পল্লীর ও কৃষির অবনতি সব দিক হইতে দেশে শিল্প বিপ্লবের যেটা মন্দ দিক তাহাই চোখের সম্মুখে ধরিয়াছে। শিল্প বিপ্লবের স্থচনা হয় ইংলণ্ডে। কিন্তু এখন একটা সংক্রামক ব্যাধির মত তাহা জগতের দিক বিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষ, চীন, জাপানের পল্লী-সভ্যতার অধোগতি ও জনভার-ক্লিষ্ট পঙ্কিল নাগরিক জীবন ইহার প্রধান সাক্ষী। এই শিল্প বিপ্লবে কি ভাবে আমাদের গ্রাম্য রীতি নীতির পরিবর্ত্তন আনি-তেছে এবং সামাজিক গ্রন্থিগুলিকে শিথিল করিয়া শ্রমজীবি-

গণের স্বাস্থ্য ও চরিত্র নষ্ট করিতেছে তাহা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। শ্রমজীবী সমস্যার নানা দিক আছে। প্রত্যেক দিকের সমাধান না হইলে দেশের কল্যাণ সুদূরপরাহত। সুন্দর ও মঙ্গল বর্জ্জিত সুবৃহৎ কারখানা অনুষ্ঠানের কুফল হইতে শ্রমজীবিগণকে রক্ষা করিতে হইবে।

ইংরাজী গ্রন্থ গুলিতে আমি যে ভারতীয় ধন-বিজ্ঞান তন্ত্রের আকার দিতে চাহিয়াছি তাহার প্রাণ এইখানে। ভারতবর্ষের যে সমূহ তন্ত্র পাশ্চাত্যের সমবায় অপেক্ষা অধিকতর সহজ ও পুরাতন তাহার রক্ষা ও বিকাশ সাধন করিয়াই পাশ্চাত্য বিষ মর্ম্মরিত শিল্প কারখানা অনুষ্ঠানের সংস্কার সাধন করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের আধুনিক সামাজিক চিন্তা বিশ্লেষণ করিয়া আমি দেখাইয়াছি সেখানে এখন একটা শিল্প সংস্কারের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। ধনী ও নির্ধনের শক্তি ও সুযোগের বৈষম্য যাহার উপর নূতন শিল্পানুষ্ঠান সুদৃঢ় ভাবে গত শতাব্দীতে গড়িয়া উঠিল তাহার বিরুদ্ধে এই যুগে কি ভীষণ প্রতিবাদ! কোথায়ও বা তাহা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন : পর্য্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিল।

যে শিল্প প্রণালী ইউরোপ এখন কোথায় ও ধীরে ধীরে কোথাও বা অকস্মাৎ রাষ্ট্র বিপ্লবের সাহায্যে বর্জ্জন করিতেছে তাহাকে ভারতবর্ষের গ্রহণ করিয়া কাজ নাই। প্রত্যেক দেশকে যে শিল্প ইতিহাসের প্রত্যেক ধাপে পা দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে এ কথা অবৈজ্ঞানিক, অসহ্য। সভ্যতা জিনিষটার যেমন এখন দেশভেদ নাই, তেমনি যে কোন দেশের নানা ক্লেশ লব্ধ

অভিজ্ঞতা এখন প্রত্যেকেরই। শিল্পবিপ্লবের ক্লেশ পর্য্যায়কে বাদ দিয়াই শিল্প প্রণালী অবলম্বন করা, ভারতবর্ষের প্রথম দায়িত্ব।

শিল্প গঠন যুগে এখন আমাদিগকে ইংলণ্ডের দিকে না চাহিয়া ইউরোপের ছোট ছোট কৃষি প্রধান দেশেরই শিল্প প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এই পুস্তকে ইহার নানা স্থানে ইঙ্গীত আছে। দুঃখের বিষয়, শিক্ষাই হউক, রাষ্ট্রনীতি বা শিল্প-প্রণালীই হউক সবক্ষেত্রে আমরা ইংলণ্ডের পথ অনুসরণ করিতেছি। সামাজিক গঠন, গ্রাম্য সমাজ ও কৃষি প্রাধান্যের দিক হইতে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশ সমুদায়ের অনেক সাদৃশ্য। এই সকল দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্ত্তন, ভূমিস্বত্বের আমূল পরিবর্ত্তন ও সমবায় প্রণালীতে কুটির-শিল্পের সংস্কার একটা বিপুল বৈষয়িক উন্নতির কারণ হইয়াছে।

বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি অবলম্বন না করিলে দারিদ্র্য মোচন অসম্ভব। প্রজার ভূমিস্বত্বকে জমিদার ও মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে। নানা দিক হইতে ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধীয় আইনকানুনের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। সমবায় পদ্ধতি অনুসারে গ্রাম্য শিল্প ও কৃষির আমূল সংস্কার অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সবদিক হইতে সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমরা শুধু যে ইতিহাস লব্ধ অনুষ্ঠান গুলির ধারা রক্ষা করিব তাহা নহে। পাশ্চাত্যের শিল্প ও রাষ্ট্র শক্তির সহিত যুঝিয়া আমরা এমন একটা স্বদেশীসমাজ গড়িব যেখানে আমাদের সভ্যতা শত বাধা বিঘ্নের মধ্যে উজ্জ্বল থাকিবে এই সব আন্দোলন যাহাতে দেশময় প্রচারিত হয় তাহার

জন্য পল্লীসেবকের প্রয়োজন। যাঁদের নির্জ্জন সাধনা ও নীরব আত্মত্যাগ দেশের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবে। জেলায় জেলায় পল্লী ও ভূমিস্বত্ব সংস্কার প্রভৃতি লইয়া রাজনৈতিক দলও তৈয়ার করা উচিত। দেশে যাহাদের উপর আসল চাষ কার্য্যের নির্ভর তাহারা কৃষিলভ্য ফসল আশানুরূপ ভোগ করিতে পারিতেছে না। পল্লীগ্রামে শিক্ষা প্রচার ও স্বাস্থ্য রক্ষা উদ্দেশ্যে আরও অনেক অর্থ ব্যয় করা উচিত। রাজনৈতিকগণ এখন ভূমিস্বত্ব, পল্লী সংস্কার, কৃষি শিক্ষা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি লইয়া দল বাঁধুক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ ইহাতে একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থার সহিত পরিচয় লাভ করিবে। আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনের সহিত কৃষকগণের অভাব অভিযোগের যত দিন না একটা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয় ততদিনই রাজনৈতিক চর্চ্চা একটা বস্তু-তন্ত্রহীন খাপছাড়া জিনিষ থাকিয়া যাইবে। দরিদ্রের ক্রন্দনই রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের ইন্ধন যোগায়, কোথায় পরিবর্ত্তন অতি অল্প ও অতিধীর, কোথায়ও তাহা আমূল ও অতিদ্রুত। কথা এই, যেখানে দরিদ্রের ক্রন্দন অরণ্যে রোদন হয় সেখানে যুগ পরম্পরা সঞ্চিত দরিদ্র শক্তি রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভোগবিলাসের অট্টালিকাকে চুরমার করে, মহানগরীকে অরণ্যে পরিণত করে। এ ভয়াবহ পরিণাম যেন কোন দেশের না হয়। দেশের চিন্তাশীল যুবকগণের হস্তে এই গ্রন্থ অর্পণ করিলাম।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়
চৈত্র, ১৩৩৩

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

দরিদ্রের ক্রন্দন

প্রথম অধ্যায়

বাঙ্গালীর পরমায়ু

আমরা হিন্দু সভ্যতার খুব বড়াই করিতেছি, হিন্দু আদর্শ লইয়া খুব আন্দোলন করিতেছি। আমরা বলিতেছি, বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজের ভাব ও আদর্শ জগতে একটা যুগান্তর আনিবে।

কিন্তু একবার ভাবরাজ্য হইতে নামিয়া আসিয়া বাস্তবের কেহ কি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন? জানেন কি, যে হিন্দু সমাজ এতকাল ধরিয়া কত বিপ্লব, কত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য ও সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল আজ এই শান্তি ও সুব্যবস্থার মধ্যে আপনার অস্তিত্ব শীঘ্রই হারাইতে বসিয়াছে? সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুর লোক-সংখ্যা এত শীঘ্র, এত ভয়াবহ ভাবে কমিতেছে যে, হিন্দুসমাজের একেবারেই লোপ পাইবার সম্ভাবনা।

আমাদের গর্ব্ব ছিল,—ব্যাবিলন্ গেছে, আসিরিয়া গেছে, ইজিপ্ট গেছে, গ্রীস গেছে,—তবুও ভারত সেই আদিম সভ্যতার সাক্ষী হইয়া যুগ-যুগান্তর কাল ধরিয়া নব নব সভ্যতার বিকাশ

সাধন করিয়া আপনার প্রাণময় সত্তার পরিচয় দান করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে আজ যে হিন্দুসমাজের জীবনী-শক্তির নূতন ও বিচিত্র পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা কি নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার উজ্জ্বলতার মত মরণেরই সূচনা করিতেছে?

একটা জাতি মরিতেছে বা বাঁচিতেছে, তাহা ঠিক করা যায় লোক-সংখ্যা হইতে নহে, লোক-সংখ্যার হ্রাস ও বৃদ্ধির হার হইতে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিলে আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, জাতি মরণোন্মুখ,—ইহাই সমাজতত্ত্ববিদের রীতি।

হিন্দুর লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ভয়াবহ ভাবে কমিতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াই হিন্দুর হ্রাস দেখা গিয়াছে; হিন্দু-সমাজ মরণোন্মুখ। হিন্দু এ ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইলে আর ১২০ বৎসর পরে হিন্দুস্থানে হিন্দুর নাম গন্ধ থাকিবে না। একটা জাতির জীবনে ১২০ বৎসর কিছুই নহে। ব্যক্তি মরণ যাতনা অনুভব করে; কিন্তু সমগ্র জাতির সে প্রকারের অনুভবশক্তি নাই। একটা জাতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়,—যেন সহজে বিনা যাতনায়, বিনা উদ্বেগে—হিন্দুজাতি বিনা উদ্বেগেই মরণের পথে চলিয়াছে! শুধু হিন্দু নহে, মুসলমানও। মুসলমান জাতিও ধ্বংসোন্মুখ,—মুসলমানের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার হিন্দুর মতই প্রায় সমান ভাবে কমিতেছে। পলাশীযুদ্ধ হইতে বর্ত্তমানকাল,—এখন হইতে সেই সময় অতিবাহিত হইলে হিন্দু মুসলমান একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

ইহাই ত প্রকৃত বাস্তব। যদি তোমার হিন্দু ও মুসলমানের সাধনার উপর বিশ্বাস থাকে, যদি তোমার ইহা বদ্ধমূল ধারণা হয় যে বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিন্তা ও ভারতীয় আদর্শ বিশ্বমানবের জ্ঞান ও কর্ম্মের ভাণ্ডারে একটা শূন্যস্থান অভিনব ও বিচিত্রভাবে পূরণ করিবে, যদি তোমার অতীত ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে এবং ভবিষ্যতের সার্থকতার জন্য ব্যাকুল-প্রতীক্ষা থাকে, তবে এই বর্ত্তমান বাস্তবের সঙ্গে লড়াই কর। বাস্তবের উপর প্রভুত্ব স্থাপন কর, তবেই তোমার অতীত সার্থক হইবে, তবেই ভবিষ্যৎ তোমার করতলগত হইবে, নচেৎ তোমার বর্ত্তমান অতীতের মত তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনন্ত কালস্রোতে মিশিয়া যাইবে।

আমরা ইতিহাস লইয়াই ব্যস্ত, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে আমরা জড় পাষাণস্তুপের মধ্যে মৃত অতীতের প্রাণকে খুঁজিতেছি। আমরা সাহিত্য আলোচনায় ব্যাপৃত, কেহ ভাব জগৎ কেহ বা দূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি, তাই বর্ত্তমান আমাদের নিকট অবজ্ঞাত। ভুলিয়া আছি,—বর্ত্তমানের ভিতরই অতীত এবং বর্ত্তমানের ভিতর দিয়াই ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমানের দুঃখ ও দৈন্যের সহিত এক্ষণে আমাদিগকে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক অবস্থাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের এই দুঃখ অবসাদের মধ্যে আশার বাণী প্রচার করিতে হইবে। ভাবরাজ্যে বিচরণ করিবার আর অবসর নাই।

ভাবরাজ্যে আর বিচরণ করিও না। কল্পনার রাজ্য হইতে ফিরিয়া এস। অতীত মহিমা,—সে ত মৃত আকাঙ্ক্ষার গলিত শব, ব্যর্থ আশার জীর্ণ-কঙ্কাল। বর্ত্তমান,—তাহারই ভিতর ত অতীতের পূর্ণ মহিমা লুক্কায়িত। আমাদের বর্ত্তমান,—সে যে আমাদের আশা ও অনুরাগে জীবন্ত, চৈতন্যময়—কল্পনার মৃত অতীত অপেক্ষা সেই আমার প্রিয়। আমাদের বর্ত্তমান যে অতীতের মহিমায় দৃপ্ত, আবার ভবিষ্যতের গরিমায় মনোমুগ্ধকর। বর্ত্তমানই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। আমাদের বর্ত্তমান বড় হীন, বড় শোচনীয়—বড় ভয়াবহ,—তবু বর্ত্তমানই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। তাই আমরা এখন শুধু বর্ত্তমানের কথা বলিব, বর্ত্তমানের শোচনীয় ভয়াবহ অবস্থা লইয়া দিন কাটাইব, বর্ত্তমান শোচনীয় হইলেও আমাদের বরণীয়, ভয়াবহ হইলেও বর্ত্তমানেই আমাদের বরাভয় লাভ হইবে। হে আমার জাতীয় জীবন-দেবতা! তুমি আমাদিগকে বর্ত্তমানকে বরণ করিতে শিখাও বর্ত্তমানের দুঃখ ও ভয়ের মধ্যে তুমি হৃদয়ে অবসাদ দিও না, ভবিষ্যতের আশার প্রতীক্ষায় সঞ্জীবিত কর।

ভারতের লোকসংখ্যা

বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কথা জাতির আয়ুক্ষয়।

ইংরাজী আমলে গত ১৮৭০ সাল হইতে এদেশের লোক-সংখ্যা প্রতি দশ বৎসর অন্তর গণনাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে

নিম্নের তালিকা হইতে ঐ সময়ের এদেশের লোক-সংখ্যা জানা যাইবে।

সন	লোক-সংখ্যা
১৮৭০	২০,৬০,০০,০০০ জন
১৮৮১	২৫,৩৮,০০,০০০ ,,
১৮৯১	২৮,৭১,১৪,০০০ ,,
১৯০১	১৯,৪২,০০,০০০ ,,
১৯১১	৩১,৫০,০০,০০০ ,,
১৯২১	৩১,৮০,০০,০০০ ,,
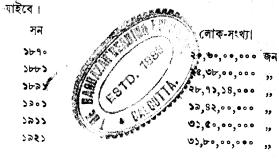
বৃদ্ধির হার

এই তালিকা হইতে ভারতবর্ষের লোক-বৃদ্ধির হার নিম্নের তালিকায় দেখান হইল।

সন	বৃদ্ধিহার
১৯১১—১৯২১	শতকরা ১·২
১৯০১—১৯২১	শতকরা ৭·১
১৮৯১—	শতকরা ২·৫
১৮৮১—১৮৯১	শতকরা ১৩·২

ভারত-গভর্ণমেণ্ট গত ১৮৮৪ সালে এদেশীয় প্রজাবর্গের তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে অনুমান করিয়াছিলেন যে, লোকসংখ্যা প্রতিবৎসর গড়ে প্রতিসহস্রে ১০ হইতে ১৫ বৃদ্ধি হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ-হীন শান্তিপূর্ণ উর্ব্বরা দেশে বৎসরে শতকরা ১০ জন হিসাবে লোকবৃদ্ধি কিছুই নহে। তদনুসারে ১৯০১

সালের গণনায় এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ২৮, ২১, ৭৯, ৮৮৬ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া তদপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৮৮১ সালে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ-রাজ্য ভুক্ত হয় নাই। ঐ দেশের লোকসংখ্যা বাদ দিলে ১৮৯১ ও ১৯০১ সালে লোক-সংখ্যা আরও কম হইবে।

অন্যান্য দেশের তুলনা

কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় যুক্ত-রাজ্য ও অষ্ট্রেলীয়ায় প্রতি দশবৎসরে গড়ে প্রতিসহস্রে ২৮ জন এবং ইটালী ও জার্ম্মানীতে যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৬ জন করিয়া লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি ১৯০১—১৯১১ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে শতকরা ১০.৯ জন তন্মধ্যে কেবল ওয়েল্‌সেই শতকরা ১৮.১ জন, স্কটল্যাণ্ডে শতকরা ৬.৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। আয়রল্যাণ্ডে পূর্ব্বে লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছিল। ১৮৫১—১৮৬১ এই দশ বৎসরে তথায় শতকরা ১১.৮ হারে লোকসংখ্যা কমিয়াছে। ঠিক্ এদেশেও ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৯০১—১৯১১ সালের মধ্যে শতকরা ১.৭ হারে লোকসংখ্যা কমিয়াছে। তৎপরে লোকসংখ্যার আর হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মের হার হাজারকরা ৪০ জনেরও বেশী ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এক্ষণে ২৬।২৭ জনে ঠেকিয়াছে। কিন্তু ঐ দেশে মৃত্যুর হারও ক্রমশঃ কমিয়া এক্ষণে পৃথিবীর

সর্ব্বাপেক্ষা কম আছে। ক্যানেডার লোকসংখ্যা ১৯০১—১৯১১ পর্য্যন্ত শতকরা ৩৪ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরাজ অধীনে আসার পর ঐ স্থানের লোকসংখ্যা ১৯০৪ সালে ৫, ১৭৫, ৮২৪ হইতে ১৯১১ সালে ৫, ৯৭৩, ৩৯৪ হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্বেতকায়গণ ১, ১৩৬, ৮০৬ হইতে ১, ২৭৬, ২৪২ অর্থাৎ শতকরা ১৮'২৮ জন এবং দেশীয়গণ ৩, ৪৯১, ০৫৬ হইতে ৪, ০১৯, ০০৬ অর্থাৎ শতকরা ১৫'১২ জন এই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মৃত্যুর হারবৃদ্ধি

যে প্রদেশের লোকের জন্ম-হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা অধিক সেই প্রদেশেই প্রকৃতপক্ষে লোক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমাদের দেশে ক্রমশঃ মৃত্যুর হার জন্মের হারের অপেক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মাননীয় গোখলে মহোদয় একবার বড়লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক-সভার সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে একথা স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল; তাহা হইতে কয়েক বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যার হার জানা যায়।

সাল	হাজারকরা	মৃত্যুসংখ্যা
১৮৮০	,,	২৩ জন
১৮৮৫	,,	২৬ ,,
১৮৮৯	,,	২৮ ,,
১৮৯৪	,,	৩৫ ,,

সাল	হাজারকরা	মৃত্যুসংখ্যা
১৮৯৭	,,	৩৬ ,,
১৯০০	,,	৩৯ ,,
১৯১৬—১৯২১	,,	৩৮·২ ,,

পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে বুঝা যায়—(১) অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের লোক-বৃদ্ধির হার কম, (২) এদেশের লোক-বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কম হইতেছে (৩) এদেশের জনসাধারণের মধ্যে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে (৪) ভারতবর্ষীয় সকল জাতি—হিন্দু-মুসলমান—কেবল মাত্র হিন্দু নহে—সকলেরই মধ্যে দিন দিন এইরূপ লোক-সংখ্যা কমিতেছে।

একথা সপ্রমাণের জন্য নিম্নে হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির বৃদ্ধির তালিকা দেওয়া হইল।

হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির হার কমিতেছে—

	হিন্দু	মুসলমান
১৮৮১	১৭৭,৯৩৭,৪৫০	৫০,১২১,৫৮৫
১৮৯১	২০৭,৭৩১,৭২৭	৫৭,৩২১,১৬৪
১৯০১	২০৭,১৪৭,৯২৭	৬২,৫৮৫,০৭৭
১৯১১	২১৭,৫৮৫,৯২০	৬৬,৬২৩,৪১২
১৯২১	২১৬,৭৩৫,০০০	৬৪,৭৩৫,০০০

এই তালিকা হইতেই হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির যে হ্রাস-বৃদ্ধির হার পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেখান হইল—

হ্রাস বা বৃদ্ধির হার (শতকরা)

	হিন্দু	মুসলমান
১৮৮১—১৮৯১	১০.৫	১৪.৪
১৮৯১—১৯০১	হ্রাস .৩	৮.৯
১৯০১—১৯১১	.৫	৬.৬
১৯০২—১৯২১	হ্রাস .৪	৫.১

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এদেশের লোক-বৃদ্ধির হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। শুধু কম নয়,—এদেশের লোক-বৃদ্ধির হার দিন দিন কমিতেছে। ১৮৮১—১৯১১ এই ৩০ বৎসরের মধ্যে হিন্দুর বৃদ্ধির হার অর্দ্ধেক হইয়াছে, মুসলমানের বৃদ্ধির হারও প্রায় অর্দ্ধেকের কিছু উপরে ঠেকিয়াছে। ১৮৯১—১৯০১ এই দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে শেষ দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সময়ে মুসলমানের বৃদ্ধির হার প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়াছে। ১৮৯১—১৯০১ হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির পক্ষেই প্রাকৃতিক বিশেষ কারণ বিদ্যমান ছিল। তদ্দ্বারা হিন্দুর সংখ্যা একেবারে বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইয়াছিল, আর মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার বিশেষরূপে কমিয়াছিল। তৎপর দশ বৎসরের হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান সংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দু পূর্ব্বে যে সংখ্যায় কম ছিল তাহাকে বৃদ্ধির দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে, উপরন্তু

তাহার উপর আর কতক সংখ্যা বৃদ্ধি দেখাইয়াছে এবং বৃদ্ধির হারও মুসলমানগণের বৃদ্ধির হারের অপেক্ষা বেশী কম নয়। কিন্তু এই শেষ দশ বৎসরের মুসলমানগণের বৃদ্ধির হার পূর্ব্বাপেক্ষাও আরও কম হইয়াছে। অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া বিশিষ্ট কারণে এক সময়ে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইয়াছিল বটে কিন্তু সে অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুর সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইয়াছে—তাহা অন্যান্য জাতির তুলনায় কিছুই নহে। কিন্তু মুসলমানগণকে হিন্দুদিগের কোন বিশেষরূপ দুরবস্থায় পতিত হইতে দেখা যায় নাই। তথাপি তাহাদেরও বৃদ্ধি কম হইয়াছে।

সুতরাং এক্ষণে কেবলমাত্র হিন্দুজাতিকে ধ্বংসোন্মুখ বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমান এতদুভয় জাতিরই অবস্থা একরূপ।

বাংলা দেশের পক্ষে এ লোক সংখ্যা হ্রাস আরও খাটে। বাঙালী আগে বাঁচুক তার পর আর সব করুক। আগে চাই বাঙালী জাতির আয়ু, তার পর আর সব।

	বাংলাদেশ	ইংলণ্ড
জন্মহার	৩২.৯	২৫.৪৩
মৃত্যুহার	৩৮.১	১২.৪

বাংলাদেশে ১৯১৮ সালে প্রতি হাজারে ৬ জন করিয়া কমিয়াছে ইংলণ্ডে ১৩ জন করিয়া বাড়িয়াছে।

বাঙ্গালী কি ভাবে ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে, ১৯১১ হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর হিসাব দিলে দেখা যাইবে।

সাল	বৃদ্ধি	হ্রাস
১৯১১	৩৬৩৬০৭	—
১৯১২	২৫০৫৫৬	—
১৯১৩	১৯৮০৫৩	—
১৯১৪	১০৩৭৯২	—
১৯১৫	—	৪৬৯৩৯

বাঙ্গালা দেশে ১৯১০ সালের গণনায় লোকসংখ্যা হইয়াছিল ৪৫,৩২৯,২৪৭। ১৯১১ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ৯১৬,০০৮ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং ১৯১৫ সালে ৪৬,৮৩৯ জন লোক হ্রাস হইলেও এই কয়েক বৎসরের হিসাবে সর্ব্বসমেত ৮৬৯,০৬৬ জন লোক বৃদ্ধি হওয়াই দেখা যায়। কোন এক বৎসরের লোক-সংখ্যা হ্রাস হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ হইত না কিন্তু ১৯১২ হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত লোকসংখ্যার যে হারে হ্রাস হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই ভয়াবহ। ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র ১,২৪৭,২৯২, সংখ্যার বৃদ্ধির হার ২'৪। কলিকাতার নিকট ছাড়া মধ্য ও পশ্চিম বাংলায় লোক কমিয়াছে। উত্তর-বঙ্গের বৃদ্ধির হার শতকরা ২'৫ ও পূর্ব্ববঙ্গের শতকরা ৪। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় লোক সংখ্যা শতকরা১০'৪ ও ৯'৪ কমিয়াছে। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ ও বর্দ্ধমানে ও বীরভূমে ম্যালেরিয়ার উপর জলপ্লাবন লোক-সংখ্যার হ্রাসের কারণ। নদিয়া ও মুর্শিদা-বাদেও রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে।

বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গালীর মৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিতেছে,—এদিকে জন্মের হারও ক্রমাগত কমিতেছে।

বাঙ্গালার সাধারণ মৃত্যুহার বৃদ্ধি

		মৃত্যু হার
১৯১২	হাজার করা	২৯.৭৭
১৯১৩	,,	১১.৯
১৯১৪	,,	৩১.৫
১৯১৫	,,	৩২.৮৩
১৯১৮	,,	৩৮.১
১৯২০	,,	৩২·৭

বাঙ্গালার সাধারণ জন্মহার হ্রাস

		জন্ম-হার
১৯১১	হাজার করা	৩৫.৩০
১৯১৩	,,	৩৩.৭৪
১৯১৪	,,	৩৩.৮৬
		মৃত্যু-হার
১৯১৫	হাজার করা	৩১.৮০
১৯১৮	,,	৩২.৯
১৯২০	,,	৩০.০

বাংলাদেশের সব জেলাতেই জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাড়িয়া গিয়াছে। নিম্নে এইরূপ মৃত্যুর হার বৃদ্ধির একটি ছবি দেওয়া হইল।

বাংলা

	১৯১১—১৯১৭	১৯১৮—১৯২০
জন্মহার	৩৩·৯	৩০·১
মৃত্যুহার	২৯·৯	৩৫·৬
কমবেশী	+২·৮	-৫·৫

ইংলণ্ড

জন্মহার	১৯·৬
মৃত্যুহার	১৪·১
কমবেশী	+৫·১

একটা বাতির দুই দিক জ্বলিলে সে যেমন শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়, বাঙ্গালী জাতি সেইরূপ শীঘ্র, ভয়াবহভাবে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে! জন্ম-হার হ্রাস ও মৃত্যু-হার বৃদ্ধি তাহারই সূচনা করে। রোগে ও অনাহারে বাঙ্গালী জাতি নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে; এক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখা গিয়াছে পূর্ব্ব-বঙ্গের জেলায়। মুসলমান প্রধান প্রদেশে অধিকতর উৎপাদিকা শক্তি, স্বাস্থ্যদায়ক আবহাওয়া ও উৎকৃষ্ট কৃষির প্রভাবে সেখানে লোক-সংখ্যা ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ৪·৩ বাড়িয়াছে। নোয়াখালিতে বৃদ্ধির সংখ্যা ১৩.০। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ও বাঙ্গালী কৃষকের পরিশ্রম সোণা ফলাইতেছে ও আসামের ধন জন গৌরব বাড়াইতেছে।

বাঙ্গালীর শিশু-মৃত্যুর হার-বৃদ্ধি আরও ভয়াবহ—

১৯১১	শতকরা	২৫·৯
১৯১২	,,	২১.২৩
১৯১৩	,,	২০.৯৫
১৮১৪	,,	২২.১৪
১৯১৫	,,	২১.৮৯
১৯১৮	,,	১২·৮
১৯২০	,,	২০.৭

দরিদ্রের ক্রন্দন

পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় ১৯১৮ সালে শিশু-মৃত্যু সব জেলাতেই অধিক হইয়াছে ২২ জেলায় শতকরা কুড়ি অপেক্ষা বেশী এবং ৫ জেলায় কুড়ির কম। পূর্ব্ববৎসরে মাত্র ১৩ জেলায় কুড়ি অথবা কুড়ির বেশী ছিল এবং ১৪ জেলায় কুড়ির কম। ইহাদের মত বর্দ্ধমান ৩০.৭; নদিয়া ২৯.৬; মুর্শিদাবাদ ২৮.৩।

পৃথিবীর সমস্ত রাজধানী অপেক্ষা কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৯১১ হইতে তাহা আবার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, শতকরা ১৫.২ হইতে বাড়িয়া তাহা এখন ৮৯.৭ হইয়াছে। লণ্ডনের শিশু-মৃত্যুর হার ১০.৩৩; বার্লিনের—১৫.৫; প্যারিসের ১২; নিউইয়র্কের ১২.৫। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় আমাদের শিশু-মৃত্যুর হার কত বেশী তাহা দেখা গেল।

হার্ব্বার্ট স্পেনসার ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রভেদ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, সমাজের একটা বিশিষ্ট স্বতন্ত্র জীবন আছে বটে, কিন্তু ব্যক্তির মত সমাজের একটা আলাদা অনুভব করার ক্ষমতা নাই। সমাজ ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া অনুভব করে। আমাদের সমাজ এখন মরণোন্মুখ,—কিন্তু সে তাহার বেদনা অনুভব করে না; নীরবে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত! সমাজের বেদনা অনুভব করে জ্ঞানী ব্যক্তি; কিন্তু দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এতই সহানুভূতির অভাব যে, সে সমগ্র সমাজের যন্ত্রণায় বেদনাবোধ করে না এবং করিলেও সে নিশ্চেষ্ট অথবা কার্য্যে অকুশলী। কিসের জন্য এত লেখাপড়া এত বিদ্যার্জ্জন

যদি মনে সমাজের দারুণ ব্যাধির খবর পাইয়াও তাহার বেদনা অনুভব করিবার শক্তি এবং ব্যাধির প্রতিকার করিবার চেষ্টা অথবা সামর্থ্য না থাকে ?

পূর্ব্বে কাশীমবাজার, বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যনিবাস ছিল—আজ সেখানে মৃত্যুর করাল ছায়া। গঙ্গা শুকাইতেছে, ছোট নদী জলকচুতে ভরিয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার সরোবর আজ পঙ্কিল রোগের আকর। নদীর "ব" প্রদেশে যদি সহজ জল সরবরাহের ব্যাঘাত ঘটে তবে জলনিকাশের অভাবে দেশের আবহাওয়া বদ্‌লাইয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে তাহাই হইতেছে। এক দিকে জলপ্লাবন অপর দিকে নদীর প্রবাহরোধের ফলে জল সেচনের অসুবিধা। উপর্য্যুপরি বন্যার পর জমির উপরে লবণের একটা সর পড়িতেছে। বাঙ্গালার কৃষির তাই আজ বিশেষ দুরবস্থা। উর্ব্বরতা কমিতেছে, অথচ পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া নূতন জমির ও চাষের অভাব। পরিবারের বৃদ্ধির সঙ্গে বিভাগের ফলে জমি যত ছোট হইতে চলিয়াছে ততই কৃষির অসুবিধা বাড়িতেছে, শেষে কৃষি হইতে পরিবার সঙ্কুলান হইতেছে না। এদিকে গৃহশিল্পও বিধ্বস্ত। আসাম ছাড়া চরকা কাটা ও তাঁত বুনা বাংলা দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর পল্লীগ্রাম হতশ্রী, বাঙ্গালীর সহর পঙ্কিল ও আবিলতাময়। পল্লীগ্রামে কৃষি অনুন্নত। সহরে বিলাসিতার আড়ম্বর, শিল্পকারখানা বিদেশীর হাতে এবং লোকের চাকুরীর উপর নির্ভর। ঘরমুখো বাঙ্গালী বাণিজ্য কাহাকে বলে জানে না, অথচ বাঙ্গালীর ঘর রোগ ও অনাহারে অতিষ্ঠ। বাঙ্গালী

না খাইয়া, ঋণ করিয়া শিক্ষালাভ করে, এবং শিক্ষালাভ করিয়াও খায় না, ঋণ করে। শিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালীর জীবিকার্জ্জনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। জীবনের সঙ্গে চিন্তার বিরোধ। বাঙ্গালীর মাথা কতকগুলি জঞ্জাল আবর্জ্জনায় অত্যধিক পুষ্ট, বাঙ্গালীর সমাজ-শরীর দুর্ব্বল শীর্ণ। মাথা শরীরের দিকে দৃষ্টিপাতও করে না। বাঙ্গালীর বিজ্ঞানের আবিষ্কার কৃষি ও শিল্পের কোন কাজে আসে না বৈষয়িক জীবন ক্ষীণ হইতে ক্ষীনতর হইতেছে। সমাজের ঠিক যেন মৃত্যু রোগের প্রলাপ। আর নয়, বাঙ্গালী একবার সমাজ-শরীরের পুষ্টিসাধনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক, একবার অন্ন-বস্ত্রাভাবের দিকে বাঙ্গালীর একান্ত চিন্তা নিয়োজিত হউক।

বাংলার ঘর	বাংলার হাট
বাংলার বন	বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক	পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক	হে ভগবান!

দ্বিতীয় অধ্যায়

তুলনা-মূলক ধনবিজ্ঞান

—o—

সমাজ-বিজ্ঞান

জাতীয়-জীবনের উদ্বোধনের দিনে মনুষ্যের শক্তি বিভিন্ন দিকে নিয়োজিত হয়, তাই আজ আমাদিগের দেশে—সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্য নূতন আন্দোলন এবং উন্নতির চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। কোথাও কলাবিদ্যার নূতন প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি চেষ্টা, কোথাও বা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-গঠনের উপযোগী ইতিহাসের সৃষ্টি, কোথাও সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলন, আবার কোথাও বা আধ্যাত্মিক জীবনের নূতন উন্মেষ। আজকাল সমাজের বিভিন্ন শাখায় স্বতন্ত্রভাবে উন্নতির আয়োজন দেখা গিয়াছে,—বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন শক্তিগুলিকে সমগ্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা সামাজিক জীবনে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এবং উন্নতির সূচনা দেখি।

প্রাণ-বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আজ ইউরোপে

কেহই সামাজিক-জীবন পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন না। মানব-সমাজের সহিত জীব-দেহের সাদৃশ্য আছে, পার্থক্যও আছে। সামাজিক ঘটনাগুলি মনুষ্য এবং পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। জীব যেমন পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়, সমাজের ভাব এবং কর্ম্মও সেরূপ পারিপার্শ্বিকের সহিত প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু প্রতিকূল পারি-পার্শ্বিকের উপর প্রভাব বিস্তার এবং তাহার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষেরই আছে, ইতর জীবের সে ক্ষমতা নাই। সামাজিক জীবন ও প্রাণী-জীবনের এইস্থানেই প্রভেদ, প্রাণ-বিজ্ঞানের সহিত সমাজ-বিজ্ঞানের বৈষম্য এই খানেই। মানুষের ক্ষমতার ত ইয়ত্তা নাই, তাহার আত্মা আছে, আত্মার অনুভূতির কোন সীমা নাই। তাহার বুদ্ধি আছে, সে বুদ্ধির দ্বারা পারিপার্শ্বিকের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে তাহারও কোন সীমা নাই। সমাজকে শুধু প্রাণীদের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। দেহের বিভিন্ন অংশের যেরূপ সম্বন্ধ, সমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সেরূপ একটি ভাব যে পরিলক্ষিত হয় তাহা সত্য, কিন্তু সমাজ যে শুধু ব্যক্তিজীবনের সমষ্টি তাহা নহে, ইহা বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পর সংঘর্ষণের প্রতি-ক্রিয়া, উহাদিগের বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, ইহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব (social personality) এবং স্বতন্ত্র বুদ্ধি (social will) আছে, ইহার অভিব্যক্তিও স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম, দুই প্রকার।

অর্থবিজ্ঞান ও অভাবতত্ত্ব

এক্ষণে বৈষয়িক জীবনের সহিত সমাজ-বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ তাহা দেখিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অথবা বেষ্টনীর প্রভাবে অভাবের উৎপত্তি। উদ্ভিদ এবং প্রাণী-জগৎ বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি অবস্থা বা বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, মনুষ্যজগতে এই-গুলিকে আমরা প্রবৃত্তি বলি। এই প্রবৃত্তিসমুদয়ের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ কর্ম্মতৎপর হয় এবং মনুষ্য-সমাজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে আপনার শক্তি নিয়োগ করে। বিভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই প্রবৃত্তি পূরণের উপযোগী বিভিন্ন শাখার প্রয়োজন। মানুষ আপনাকে কখনই পঙ্গু করিয়া সসীম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে ভালবাসে না। ক্ষুদ্র চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মজীবনের মধ্যে থাকিয়া তাহার মনে অতীন্দ্রিয় অনন্তকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিবার যে একটা প্রবৃত্তি স্বভাবতই জাগরিত হইতেছে, তাহা পূরণ করিবার জন্যই ধর্ম্মজীবন। তাহার স্নেহ ও প্রেমের বিকাশের জন্য তাহার পারিবারিক জীবন। বহিঃ এবং অন্তঃশত্রুর কবল হইতে সমাজ রক্ষা এবং সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্র-জীবনের সৃষ্টি। এইরূপে বিভিন্ন জাতীয় প্রবৃত্তি পূরণের জন্য সামাজিক জীবনের কর্ম্মের বৈচিত্র্য, সমাজের বিভিন্ন বিভাগ। মনুষ্য তাহার সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মশক্তি লইয়া কোনটি ধর্ম্মজীবনে, কোনটি গার্হস্থ্যজীবনে, কোনটি বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে অথবা শিল্পকলাবিদ্যা এবং বিজ্ঞান-সাহিত্য-

আলোচনায় নিয়োগ করিতেছে। সমাজের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। সভ্যতার নিয়মই এই যে, প্রবৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অভাবগুলি গঠিত হয়, মনুষ্যের শক্তি নিয়োগে উহারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট এবং উন্নত হইয়া পারিপার্শ্বিকের ভাব এবং শক্তিসমূহের গতি ও পরিবর্ত্তনের অনুগমন করে।* এরূপ বেষ্টনীর প্রভাবে সমাজের ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন, বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সাধিত হয়। রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, শিক্ষার ব্যবস্থা, সাহিত্যচর্চ্চা, বিজ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি মনুষ্যের মার্জ্জিত এবং মানসিক অভাব মোচনের সহায় হয়, কায়িক অভাবগুলির জন্য সংসারে কৃষি শিল্প কলা বাণিজ্যাদির সৃষ্টি এবং বিরাট আয়োজন। এগুলি লইয়াই আমাদের বৈষয়িক জীবন, কায়িক অভাবতত্ত্বই অর্থ-বিজ্ঞানের মূল কথা।

যে দেশের বিভিন্ন দর্শনের একই মূল কথা এই যে, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতেই মনুষ্যের আনন্দ, দৈহিক অভাবগুলি যত পরিমাণে খর্ব্ব হয় ততই মনুষ্যের আনন্দের কথা, সে দেশে কায়িক প্রবৃত্তি পূরণকে মূলতত্ত্ব করিয়া যে অর্থ-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইবে ইহা অনেকে সমাজের হিতকর মনে না করিতে পারেন। কিন্তু আধুনিক

---

* গতিবাদ অর্থবিজ্ঞানের (Dynamic Economics) ইহাই মূল তথ্য। পাশ্চাত্য জগতের দুই একজন ধনবিজ্ঞানবিৎ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আমেরিকার অধ্যাপক Patten এবং ইতালীর অধ্যাপক Pantaleoni প্রধান।

ভারতবাসী জানেন না যে, ভারতবর্ষেই অর্থবিজ্ঞানের * প্রথম সৃষ্টি।

সামাজিক ও বৈষয়িক অনুষ্ঠান

সমাজ রক্ষা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। এবং ইহাই বৈষয়িক অনুষ্ঠান ও প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করে। এটা কিন্তু তুলনামূলক ধনবিজ্ঞানের বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ। সকল সামাজিক প্রথা ও ইতিহাসের মূলে রহিয়াছে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণা। আবহমান কালের ইতিহাস ও প্রথাগুলির প্রভাব সভ্য সমাজেও বড়ই প্রবল ও বদ্ধমূল। বহুদিনের পুঞ্জীভূত রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ও প্রথার মধ্যে বৈষয়িক জীবনের ধারা লুক্কায়িত। সেই জন্যই তুলনামূলক ধনবিজ্ঞান এইরূপ বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাস ও জাতীয় মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল প্রথা অনুমোদিত, সেইগুলি কেমন করিয়া আমাদের আর্থিক ও সাংসারিক জীবনকে পরিচালিত করিতেছে, তাহার কয়েকটি স্থূল উদাহরণ গ্রহণ করিয়া দেখা যাউক। ভারতে জন-সমাজ-সমূহের প্রতিপত্তি ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিটা বড় বেশী। এই সমূহ-বোধ ও সহানুভূতি আছে বলিয়াই আমাদের

* বার্ত্তশাস্ত্র।
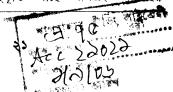
সাংসারিক জীবন ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি একটা নিজ স্বরূপ ধারণ করিয়াছে। ভূ-সম্পত্তির অধিকারের কথাই ধরুন না কেন—সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে ব্যক্তিগত স্বত্বকে অল্প বিস্তর নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। গ্রামে সাধারণ পুষ্করিণী, ক্ষেত্রে জলসেচন, নালী ও পতিত গোচারণ জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের স্বত্ব প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরও আমরা দেখিতে পাই, ছুতার কামার প্রভৃতি শিল্পী ও গ্রাম্য-সমাজের ধোপা, নাপিত প্রভৃতি চাকরকে বিনামূল্যে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। উৎপন্ন শস্যের বণ্টনকালেও দেখিতে পাই, ফসল পাকিলে পুরোহিত ও অন্যান্য কর্ম্মচারী যাঁহারা সমাজের পারমার্থিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতেছেন, তাঁহারা ভরণপোষণের জন্য এক অংশের অধিকারী। আর সমাজরক্ষা ও স্থিতিই ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ও বৃত্তি (মুষ্টি ভিক্ষা) প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মূলে নিহিত রহিয়াছে। আথিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি নানা শ্রেণীর মজুরের মধ্যে কেহ বা বেশী, কেহ বা কম মজুরী পাইতেছে। এই মজুরী প্রতিযোগিতার দ্বারা ধার্য্য হয় নাই। কোন্ শ্রেণীর মজুর কত কার্য্যকুশল এবং তাহার পারিবারিক অভাব অভিযোগই বা কি পরিমাণের, এই সকল বিচার করিয়া, একটা মজুরী ধার্য্য করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথা ও ইতিহাস-লব্ধ জীবন ধারণের পরিমাপ (Standard of subsistence) অনুযায়ী একটা মজুরী ধার্য্য করা হইয়াছে। ভারতে পৈতৃক

বাস্তুভিটা আর কয়েক বিঘা জমির বন্দোবস্ত সকল কৃষকের আছে। নির্দ্দিষ্ট বাস্তুভিটা আর খানিকটা জমিকে আঁকড়াইয়া ধরাই তাহাদের জন্মাধিকার, আর সে কারণে Economic Rent, যেটা জমিদারের প্রাপ্য তাহা মোটেই তফাৎ করা যায় না। কারণ, হয় এটা কৃষকের আয়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, না হয় সমাজের কাজে ব্যয়িত হইতেছে। সেইজন্যই অন্যত্র যাহাকে Economic Rent বলে, ভারতে তাহাকে সরকার বা গ্রাম্য সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা কর বলা যাইতে পারে। এক্ষণে এদেশে অন্যান্য দেশের আদর্শে জমিদারী স্বত্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর তাহার ফলে প্রতিযোগিতায় জমির খাজনাও ধার্য্য হইতেছে। তাহার ভীষণ ফল এই হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইয়াছে যাহাদের নিজের জমি বিন্দুমাত্র নেই, পরের জমিতে কার্য্য করিতেছে, ইহাদের অবস্থা ঠিক কলকারখানার মজুরদের মত। ভারতের কোন কোন প্রদেশে এদের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের লইয়া শাসক ও ধনবিজ্ঞানবিদেরা একটা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন, যেহেতু ইহারা অনেক অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতীতের সামাজিক ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করার ইহা একটি বিষময় ফল।

বৈষয়িক জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সামাজিক ইতিহাসই একমাত্র কারণ নহে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কারণ আছে, যথা—ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু এবং আহারের তারতম্য ভৌগলিক অবস্থানের অনুযায়ীই হইয়া থাকে। চিকিৎসকেরা গবেষণা

করিয়া দেখিয়াছেন যে, এদেশে একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের আহারে পুষ্টির জন্য যতটা প্রটীন পদার্থের প্রয়োজন তাহা ইউরোপীয় প্রাপ্তবয়স্ক লোকের তুলনায় প্রায় তৃতীয়াংশ কম। ভারতীয় শ্রমজীবী মাংসাশী না হইয়াও অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। মাংস ভক্ষণের হারের সহিত যে পরিমাণ শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহা এদেশে খাটে না। কিন্তু পাশ্চাত্য ধনবিজ্ঞানের ইহাই সিদ্ধান্ত। এতেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের মজুরেরা সাধারণতঃ কোন্ কাজের উপযুক্ত। যে কাজে একটানা দ্রুত কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, সে কাজ তাহারা পারে না। আর যে কাজ ধীরে ধীরে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিয়া করা যায়, সে কাজে তাহারা সকল দেশের মজুরকে হারাইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশই ইহার সাক্ষ্য, কারণ তাহাদের দ্বারাই ইংরাজ উপনিবেশের বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজ যে আমরা দেখিতেছি, কলকারখানার মজুররা বিদ্রোহ করিতেছে আর তাহাদের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, তার মূলীভূত কারণ হইতেছে—তাহারা কারখানায় পারিবারিক জীবনের সুবিধা পায় না, তাহারা জমি হইতে বঞ্চিত, তাহাদের বাসস্থান অত্যন্ত জঘন্য ও পঙ্কিল—সবদিক হইতে তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তির স্ফুরণ প্রতিরোধ হইতেছে—নূতন শিল্প-প্রণালীর সহিত মজুরের জীবনের কোন সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা হয় নাই।

আর এই কারণেই আমাদের কলকারখানার গণ্ডীর মধ্যে পৃথিবীর সব চেয়ে খারাপ বস্তির সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা সকল

রোগের বীজ ও নৈতিক অবনতির মূল। একে ত এ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান ও অত্যন্ত আর্দ্র, তাহার উপরে মজুরদের ঘন বিন্যস্ত আলয়—এতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিপদ বাড়িয়া উঠিয়াছে—যদিও প্রকৃতি এর প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছে—রৌদ্র ও বৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়া কেবল যদি আমরা ঐ ঘন বিন্যস্ত বস্তিগুলার মধ্যে জলবায়ু প্রবেশ করিতে দিই—ও উন্মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা করি।

এই যে আমাদের সামাজিক বিন্যাসের সহিত শিল্প-প্রণালীর সামঞ্জস্য সাধন করা হয় নাই তাহার অনেক উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। বৈষয়িক পরিবর্ত্তনের সব কেন্দ্রে হয় পুরাতনের স্থানে নূতনকে বাহির হইতে জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইতেছে, না হয় একটা পরানুকরণের ধারা চলিয়াছে। যতই গ্রাম ও সহরের আদর্শের বিভিন্নতা বাড়িয়া উঠিতেছে ততই কুটীরশিল্পের অবনতি হইতেছে; রপ্তানীর জন্য ফসল জন্মান হইতেছে। আর ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমিক আইন অনুসারে জমি এত ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হইতেছে যে, কৃষি হইতে জীবনযাত্রা সুকঠিন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশে আইন বদ্ধ করিয়া, জোর করিয়া, লাভ দেখাইয়া জালে ফেলিয়া মজুরদের অস্বাস্থ্যকর খনিতে ও বাগানে খাটান হইতেছে। রাজনৈতিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার চেয়ে আরও দুঃখের কথা হইতেছে এই যে, মজুরদের দেশ হইতে স্বেচ্ছায় দেশান্তরে বসতি করিতে দেওয়া হইতেছে না। আমেরিকা ও

পূর্ব্ব-দক্ষিণ আফ্রিকায় কটা ও হরিদ জাতিদিগকে অবাধে আসিতে দেওয়া হয় না। অনেক দেশের বিভিন্ন স্থানে এসিয়াবাসী মজুর প্রবেশ নিষেধ। পূর্ব্বে যাহাদের দ্বারা ঐ সমুদয় স্থানে ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ রাষ্ট্রীয় সুবিধা অসুবিধার দোহাই দিয়া তাহাদের বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে, আর এই যুক্তি তাঁহারা দেখান যে, এসিয়ার মজুরদের সঙ্গে মিশিলে ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রার আদর্শ অনেক খাটো হইয়া যাইবে। আফ্রিকা ও আমেরিকার যে যে স্থানের আজও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই, তাহাদিগকে সমবৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে হইলে ভারতীয় কৃষিবিৎ, খনিকারের ও ব্যবসাদারের দাবী অগ্রাহ্য করা চলিবে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পশ্চাৎপদ ও উন্নত শ্রমজীবীর অবাধ মিশ্রণ সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় এই বিষময় ফল দাঁড়াইয়াছে যে, শ্বেতাঙ্গজাতির কার্য্যশক্তি হানি হইয়াছে আর কৃষ্ণাঙ্গজাতির অশেষ দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে, নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে আর স্থানে স্থানে তাহারা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। প্রকৃতির বিধান এই যে, বর্ণকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন জাতির ক্রমোন্নতিসাধিত হয় না, বর্ণ-বিচার করিয়া মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া দিতে হইবে। বর্ণই হচ্ছে মানুষ, কোন্ কোন্ অবস্থায় ও কোন্ দেশে বাস করিবার উপযুক্ত তাহার বাহ্যিক নিদর্শন। প্রকৃতির বিধানকে সার্থক করিবার জন্য আজ শ্রমজীবিদিগের হাতে শিল্প পরিচালনের ক্ষমতা আসা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বিধি ও পরিদর্শনের প্রয়োজন

হইয়া পড়িয়াছে, কারণ Socialism প্রাণে যতই আশার সঞ্চার করুক না কেন, ইহা অনিবার্য্য যে, প্রবল দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করিবেই করিবে। 'কৃষ্ণকায়' শ্রমজীবির স্বত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে ও মঙ্গল বিধানের জন্য আজি হউক, কিছুদিন পরেই হউক, নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক পরিদর্শন ও পরিচালনের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হইবে এবং যাহাতে জলবায়ু ও জাতির স্বাভাবিক বৃত্তি সামঞ্জস্য রাখিয়া সামাজিক বিন্যাসের ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জমিজমার ও বাণিজ্যের সর্ত্ত ও প্রণালী বদ্‌লাইতে হইবে। রেলওয়ে, খনি ও বাণিজ্যের স্বত্ব কোম্পানীগুলি যাহাতে concession পাইয়া রক্ষা করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত জাতির বৈষয়িক বা আন্তর্জাতিক ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বৈষয়িক ঘাত ও প্রতিঘাতে যে কেবল আর্থিক লাভ হইবে তাহা নহে। ভারতের ও চীনরাজ্যের গোষ্ঠীচৈতন্য ও তাহার পরিচালন-প্রণালী ও অভিজ্ঞতা নূতন শিল্পপ্রণালী গঠনে বিশেষ উপকারে আসিবে। ইহা মানুষের ও সমাজের স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয়ের তুষ্টি বিধান করিয়া সেই আদিম ও স্বাভাবিকসমূহ তন্ত্রের বিকাশসাধন ও পুষ্টিবিধান করিবে। এই ধরণের আদর্শ আজকাল ইউরোপে প্রচার হইতেছে। এই প্রাচীন অভিজ্ঞতাই পাশ্চাত্য বৈষয়িক বিন্যাসের পুনঃ গঠনে এবং প্রাচ্যে Guild-Socialism-এর (পুগ-তন্ত্র) Syndicalism-এর (সমূহ-তন্ত্র) আদর্শে শিল্প-কৃষি-সমবায়ে ও বৈষয়িক

স্বরাজ্যে পুরাতন সমূহ-রাষ্ট্রকে পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিবে।

এইরূপে উন্নত ও অনুন্নত জাতিসমূহ পৃথিবীর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনে পরস্পরকে সহায়তা করিবে। সকল বিবাদ বিসম্বাদের কোলাহল দমিত হইয়া এক শান্তির রাগিণী বাজিয়া উঠিবে। উহাই তুলনামূলক ধনবিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া চাই।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল যখন ইউরোপে প্রচার করিতেছিলেন যে, মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ কেবলমাত্র সামাজিক জীবনেই সম্ভব, কারণ সমাজ মনুষ্যের অভাববৃত্তিনিচয় মোচন করিবার স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই, এখন হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ম্মবীর ও সাম্রাজ্য-সংস্থাপক বাৎস্যায়ন বলিয়া ছিলেন, "মনুষ্যানাং বৃত্তিরর্থঃ—মনুষ্যবতীভমিরিত্যঃ। অর্থএব প্রধানঃ ইতি কৌটিল্য—অর্থমলৌ হি ধর্ম্মকামাবিতি।" ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ইহাদিগের মধ্যে অর্থই সর্ব্বপ্রধান। এরূপে বাৎস্যায়ন এবং আরিষ্টটল উভয়েই বিভিন্ন দেশে একই রূপ গবেষণার দ্বারা সমাজতত্ত্ব এবং অর্থবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

দৈহিক ও মানসিক অভাব

এতক্ষণ সামাজিক প্রথা ও ইতিহাসের কথা বলিলাম, যাহার মূলে মানুষের উচ্চতর প্রবৃত্তি সমুদয়। কিন্তু মনুষ্য যতক্ষণ তাহার দৈহিক অথবা প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিতে না

পারে ততক্ষণ তাহার উচ্চবিধ অভাব অনুভব করিবার অবকাশ থাকে না। মনুষ্য শরীরী, এ জন্য শারীরিক অভাবগুলি অন্যবিধ অভাব অপেক্ষা তাহার উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলেরই সংস্থিতি-হেতু প্রাণ। এ জন্য প্রথম শ্রেণীর শারীরিক অভাবগুলি মোচন না করিয়া মনুষ্য মানসিক এবং সামাজিক অভাবগুলি তৃপ্ত করিতে প্রয়াসী হয় না। দারিদ্র্য হেতু যদি নিম্নশ্রেণীর অভাবগুলি তৃপ্ত না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তি বিকাশলাভ করিতে পারে না, এরূপে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজে নিম্নস্তরের মধ্যে কত লোকের যে কূটস্থ প্রতিভা দারিদ্র্যের কঠোর অত্যাচারে অচিরেই শুকাইয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্য জগতের দারিদ্র্যের পুরোহিত ভিক্টর হ্যুগো (Victor Hugo) এই হতভাগ্যদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, কোমল পুষ্পের মত ইহাদিগের অন্তঃকরণ আলো পাইয়া যেমন ফুটিয়া উঠিতে থাকে অমনি দারিদ্র্যের তীব্র তাড়নায় ফুলগুলিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া নিষ্ঠুরভাবে রাস্তায় নিক্ষেপ করে, ম্লান এবং কর্দ্দমাক্ত হইয়া কেবল গাড়ীর চাকায় ছিন্ন হইবার জন্যই উহারা সারাজীবন অপেক্ষা করে। মানুষ তখন সমাজে থাকে না, সমাজ যেমন তাহাকে ঘৃণা করে তাহারও সেরূপ সমাজের উপর আক্রোশ, তখন হতভাগ্য এবং জঘন্যে কোন প্রভেদ থাকে না, the unfortunate and the infamous are mingled and confounded in one word, the fatal word.

জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশে মনুষ্যত্ব

আবার প্রাথমিক অভাব মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানসিক শক্তির বিকাশ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে তাহাও বলা যায় না। যে ব্যক্তি স্বাভাবিক অভাবগুলি তৃপ্ত করিয়াই সন্তুষ্ট, উচ্চবিধ অভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, তাহার আর উন্নতি কোথায়! সেই জন্য কথায় বলে, Better to be Socrates dissatisfied than to be a pig satisfied—অজ্ঞের সুখ অপেক্ষা জ্ঞানীর নিরানন্দ ভাল! জ্ঞানের পরিসর যতই বাড়িতে থাকে ততই নূতন নূতন মার্জ্জিত অভাবের সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের মত মানুষের আশাও অতৃপ্ত এবং অনন্ত। জ্ঞানের বিকাশ হইলে মানুষ কায়িক অভাব মোচন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, তখন তাহার আত্মার অনুভূতি হয়। আত্মার ধর্ম্মই এই যে, সে কখনই সন্তুষ্ট থাকে না, অতৃপ্তি ও আশা তাহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। "নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। আত্মার আনন্দ তখনই যখন সে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, এই পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিবার জন্যই সে সমস্ত ক্ষুদ্র সুখকে অবহেলা করিতে প্রস্তুত হয়। দেহের সুখ হইলে যদি মানুষের পরম আনন্দ হয় তাহা হইলে মানুষ এবং পশুতে প্রভেদ কি? মানুষ জ্ঞান অন্তরাত্মার দ্বারা ইহা বুঝে, তখন সে দৈহিক সুখ-দুঃখকে তাহার খর্ব্বতার চিহ্ন মনে করে, যাহা কিছু তাহার আত্মাকে সেই পূর্ণ আনন্দ হইতে চুব্যিত করিয়া রাখে তাহাই

তাহার শৃঙ্খল হয়। এ শৃঙ্খল না ভাঙ্গিলে মানুষের অনন্ত ধনভাণ্ডার সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য বৃথা হয়।

আধ্যাত্মিকতার অভাবে পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবনে অশান্তি

ইউরোপ এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে পারে নাই। ইউরোপে অসংখ্য লৌহকলকারখানা, বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার, অসংখ্য রঙ্গশালা,—কায়িক অভাব মোচন ও আমোদ আহ্লাদের সেখানে কি বিরাট আয়োজন! অসংখ্য জাহাজ, অসংখ্য রেলগাড়ী বোঝাই হইয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে ইউরোপের প্রমোদের উপকরণ জোগাইতেছে। ইউরোপ পৃথিবীর যেন একটি প্রকাণ্ড বিলাস-ভবন। কিন্তু তবুও উহার সুখ কোথায়? বহু লোক যেমন ভোগ-বিলাস ছাড়া আর অন্য কিছুতে প্রবৃত্ত নহে, অপর দিকে তেমনই অসংখ্য লোক ভোগ জোগাইবার জন্য অহোরাত্র কলকারখানায় খাটিয়া মরিতেছে। আমেরিকা প্রদেশে প্রত্যেক একশত পরিবারের মধ্যে কেবলমাত্র একটি পরিবারের ধনসম্পত্তি, অবশিষ্ট নিরানব্বইটি পরিবারের ধনসম্পত্তি অপেক্ষা অধিক। নিরানব্বইটি পরিবার একটি মাত্র পরিবারের বিলাস এবং সৌখিনতার উপকরণের জন্য কল-কারখানায় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।* সেখানে কল-কারখানায় কাজ করা ভিন্ন উপায় নাই।

* Spahr: An Essay on the Present Distribution of Wealth in the United States.

দ্রব্যোৎপাদনে কলের সাহায্য লইতেই হইবে, শেষে মানুষ দিনরাত্রি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কল চালাইতে চালাইতে কলের মত অন্তঃসারশূন্য জড়পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। কারখানায় একটিমাত্র হাতল একই ভাবে সমস্ত দিন ঘুরাইতে হয়, শ্রমজীবীদিগের মস্তিষ্ক চালনা অনাবশ্যক, অভ্যাস অভাবে তাহাদিগের ধীশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, একটি মাত্র হাতল ছাড়া জীবনের মধ্যে অন্য কিছু অনুভব করিবার শক্তি লোপ পাইতে থাকে, তখন জীবনে বৈচিত্র্য থাকে না, শিল্পের নিকট মানুষের আত্মবিক্রিত হওয়াতে জীবনযাত্রা কঠোর এবং দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। এইরূপে ইউরোপ সভ্যতা এবং উন্নতির ভাণ করিয়া অসংখ্য লোকের মনুষ্যত্বকে নিষ্ঠুর ভাবে নিপীড়ন করিতেছে, বিলাস-পূজার বিপুল মণ্ডপে অসংখ্য লোককে মূঢ়, মূক এবং অসহায় ছাগ-শিশুদের মত প্রত্যহই বলি প্রদান করিতেছে। মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যদিগের ক্রন্দন ও আক্রোশের ধ্বনি শুনা যায়, তখন ধনী সম্প্রদায় উহাকে socialism, anarchism, bolshevism বলিয়া বিদ্রূপ করে। মনীষি পণ্ডিতেরা কিন্তু এই অস্ফুট রোদন ধ্বনিতেই ইউরোপের সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া মনে করিতেছেন। বাস্তবিক ইউরোপের বৈষয়িক জীবনে একটা সমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দরিদ্র এবং ধনীদিগের মধ্যে ব্যবধানটা যখন খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে, তখন সমাজে নূতন করিয়া ভাঙ্গা-গড়া হইবেই। ইউরোপে ধনী-সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন অনেকেই এখন শুধু বিলাস ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে

কোন দাবীই মানে না, ধনৈশ্চর্য্যের অহঙ্কারে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, দরিদ্র সম্প্রদায়ও সেরূপ সমাজের ধনী ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিতেছে। রাজ্য-শাসন না মানিয়া দেশের সমস্ত শ্রমজীবি-শক্তিকে সমবেত করিয়া বিরাট বিদ্রোহ-সূচনার আশা করিতেছে। যেখানে বিপ্লবের মধ্য দিয়া সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সেখানে শ্রমজীবীরা ধনী সম্প্রদায়কে নির্ম্মূল করিবে আশা করিতেছে, শ্রমজীবীরা যদি সমবেত হইয়া বারংবার বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয় তাহা হইলে রাজ্য-শাসন যে অচিরে সমূহ-মতানুযায়ী হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইতিপূর্ব্বেই রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রভৃতি দেশের ধনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আইন জারী হইয়া গিয়াছে, ভূমিস্বত্ব সকলের ভোগ্য হইয়াছে, এমন কি আমেরিকা ও ইংলণ্ডেও সঙ্ঘ একতাবলম্বীদিগের দল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অভাব অর্চ্চনার বিষময় ফল

বৈষয়িক জীবনের এই ঘোর অশান্তির মূলে—জীবনে আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ অভাব। মানুষ যদি অভাবের পর অভাব মোচন করিয়া ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়বিষয়ক অভাবের সৃষ্টি করিতে থাকে, উচ্চবিধ আধ্যাত্মিক অভাব কল্পনার জন্য তাহার যদি

অবসর না থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিণতি কোথায়? অভাবের নিত্য নূতন দাবী শুনিতে গেলে বিরাট কল-কারখানার আয়োজন চাই, বিরাট কল-কারখানাগুলি ঐশ্বর্য্যের অধিক তারতম্য সৃষ্টি করে—মুষ্টিমেয় লোক খুব অর্থোপার্জ্জন করে কিন্তু সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই নিঃস্ব হয়, কারখানায় অর্থোৎপাদনের (factory system) ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। কারখানা স্থাপন করিয়া মানুষ যে অভাব মোচনের শ্রেষ্ঠ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে তাহা নহে, কতকগুলি অভাব মোচন করা হইবে সত্য, কিন্তু আরও নূতন নূতন অভাব দেখা যাইবে, পুরাতন অভাব লোপ পাইবে। আবার এক প্রকার বস্তুর দ্বারা যে প্রতিদিনই একই প্রকার অভাব মোচন করা যাইবে তাহাও নহে। এইরূপে অভাব মিটিবার কোন আশাই থাকিবে না, অথচ সমাজের অভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইলে অনেক কারখানা বন্ধ হইবে, কত অর্থ যে নষ্ট হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক বোধ ও অভাব দমন

অভাব মিটাইবার একটা খুব সহজ পন্থা আছে,—তাহা অনুসরণ করিলে সুখশান্তির জন্য আর লালায়িত হইতে হইবে না। অভাবকে অভাব বলিয়া না মানা। কতকগুলি যে অদম্য ইহা সত্য, যেমন অশন, বসন, বাস; অন্য

অভাব অপেক্ষা যদিও ইহারা প্রবলতম, তথাপি ইহাদিগেরও একটা সীমা আছে। সে সীমা সহজে অতিক্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। অন্য অভাবগুলি শুধু ভোগবিলাসের জন্য,—ইহাদিগের সীমা নাই, যতই মোচন করিবে ততই ইহাদিগের দাবী বিচিত্র, অন্যায় এবং অসম্ভব হইয়া বাড়িয়াই চলিবে। ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক বোধের ফলে এ প্রকার অভাবগুলিকে অবহেলা করিতে শিখিয়াছে। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক বোধ দুর্ব্বিহ জীবনকে অনেক পরিমাণে সুখী করিয়াছে, এ আধ্যাত্মিক বোধ না হইলে জীবনে অভাবের আধিক্য হইতে কখনও নিস্তার এবং শান্তি নাই।

দারিদ্র্য হেতু বৈরাগ্যের ব্যর্থতা

কিন্তু আমরা যতই বলি না কেন যে, আধ্যাত্মিক সুখেই পরম সুখ, আমরা যদি আমাদিগের দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখি তাহাদিগের অন্নবস্ত্রের অভাবই এখন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। যাহার আছে সেই ত্যাগ করিতে পারে, ত্যাগের মহিমা বুঝিতে পারে ; কিন্তু যাহার অভাব সে বৈরাগ্যের মর্ম্ম কি বুঝিবে ? তাই আমাদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয়,

সমাজে অনেক সময়ে বৈরাগ্যের সুফল ফলে না। দারিদ্র্য-পীড়িত সমাজে প্রকৃত বৈরাগ্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

দারিদ্র্যের পরিমাণ নিরূপণ

আমাদের সমাজ দারিদ্র্যপীড়িত, কিন্তু দারিদ্র্যের গভীরতা এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা না জানিলে ব্যবসায়িক জীবনের উন্নতি এবং নূতন কর্ম্মক্ষেত্র আবিষ্কার একেবারেই অসম্ভব। অভাব বোধ না থাকিলে প্রতিকারের চেষ্টা কখনই হইবে না। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের দেশে এইরূপ বৈষয়িক তথ্যানুসন্ধানের কোন চেষ্টাই হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রই অর্থবিজ্ঞান পড়িতেছে কিন্তু দেশের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার কোন আগ্রহই দেখা যায় না। ইউরোপে জনসাধারণের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য ধনবিজ্ঞানবিদেরা একটি সুন্দর প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রুশিয়ার গভর্ণ-মেণ্ট সচিব ডাক্তার Engel এই প্রণালী আবিষ্কার করেন। কি ধনী কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ই আয়ের অধিকাংশ অন্নবস্ত্রা-ভাব পূরণের জন্য ব্যয় করে। যে সম্প্রদায় যত দরিদ্র, তাহার আয়ের তত অধিক অংশ অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যয়িত হয়। এই তথ্য অনুসারে দারিদ্র্যের পরিমাণ বুঝা যাইবে। ডাক্তার Engel পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া ইহা দেখাইয়াছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ে পারিবারিক ব্যয়ের অনুপাত

Saxony	শ্রমজীবি		মধ্যবিত্ত		ধনী	
১। আহার্য্য	৬২.০	৯৫.০	৫৫.০	৯০.০	৫০.০	৮৫.০
২। বসন	১৬.০		১৮.০		১৮.০	
৩। গৃহ	১২.০		১২.০		১২.০	
৪। ইন্ধন এবং আলো	৫.০		৫.০		৫.০	
৫। শিক্ষা, ধর্ম্মকর্ম্ম	২.০	৫	৩.৫	১০.০	৫.৫	১৫.০
৬। রাজকর	১.০		২.০		৩.০	
৭। চিকিৎসা	১.০		২.০		৩.০	
৮। আমোদ-প্রমোদ	১.০		২.৫		৩.৫	
	১০০.০		১০০.০		১০০.০	

দরিদ্রের ক্রন্দন

তালিকাটি পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, আয় যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে, শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ প্রভৃতি নূতন নূতন অভাব পূরণ করিবার জন্যও সেই পরিমাণে ব্যয় বাড়িতে থাকে। দরিদ্রেরা অন্নবস্ত্রের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া এই সকল অভাব তাদৃশ মোচন করিতে পারে না।

আমি আমার নৈশবিদ্যালয়সমূহের শ্রমজীবী ছাত্র এবং কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের একটি আদর্শ ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে আমি অনেকগুলি পারিবারিক আয়ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। নিম্নে ইহাদিগের একটি নমুনা দেওয়া গেল—

পারিবারিক আয়ব্যয়ের তালিকা

১।	স্থান—জেলা, গ্রাম, থানা	চট্টগ্রাম, শ্রীপুর
২।	বৃত্তি (পেশা—কৃষি মজুরী, শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী	কৃষি ও মজুরী
৩।	জাতি	হিন্দু, কায়স্থ
৪।	বাড়ীর লোকসংখ্যা।	৬ জন
৫।	কয়টি ঘর	৫
	(ক) খড়	(ক) ৫
	(খ) খাপড়া	
	(গ) ইট	

	(ঘ) টিন	
৬।	কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে সংসারের কোন্ কাজ করে)	২জন উপার্জ্জন করে বাকী ৪ জন সংসারের কাজ করে।
	(ক) বালক	
	(খ) স্ত্রীলোক	৪ জন
	(গ) পুরুষ	২ জন
৭।	জমি (ক) কত বিঘা	১০ কাণি
	(খ) পতিত, আবাদী, বন, চড়াই, জলা,	পতিত ৩ কাণি আবাদী ৫ কাণি জলা ২ কাণি
	(গ) স্বত্বের বিবরণ লাখেরাজ, মৌরুষী, কর্ষা, কোর্ফা, ঠিকা,	লাখেরাজ, রায়তি
	(ঘ) জমিদারের খাজনা ও অন্য বাবদে জমিদারকে দেয়।	১৩৲ টাকা, ১৪ আড়ি ধান।
৮।	কৃষক (ক) কিসের আবাদ	বর্ষাকালে ধান্য, অন্য সময়ে মরীচ।
	(খ) কয়খান লাঙ্গল	২ খান লাঙ্গল
	(গ) জমীর জন্য বীজ, সার, মজুর অথবা অন্য খরচ	বীজ ৭॥ আড়ি, মজুরের খরচ ২৪৲ টাকা।

(ঘ) ফসল, নাড়া, বিচালি ইত্যাদি বিক্রয়ের লাভালাভ, বিঘা প্রতি।

৯। শ্রমজীবী, শিল্পী, ও ব্যবসায়ী

(ক) শিল্পী ও শ্রমজীবীর মজুরী অথবা চাউল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কাজ করা।	মজুরী হইতে ২ জনের বার্ষিক প্রায় ৮০৲ টাকা উপার্জ্জন।
(খ) দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা	
(১) হাট কতদিন অন্তর	হাট—চার দিন অন্তর বাজার—প্রতিদিন।
(২) মহাজনের নিকট দাদন লইয়া বিক্রয়, কত হারে সুদ।	বার্ষিক শতকরা ১৫৲ টাকা সুদ।
(৩) বৎসরে কত বিক্রয়, লাভালাভ।	

১০। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন

(ক) ঘুঁটে অথবা জ্বালানি কাঠ বিক্রয়।

(খ) ধান ভানা, গম পেষা

(গ) সুতা কাটা

(ঘ) মজুরের কাজ

১১। বালকদিগের উপার্জ্জন

১২।	দুগ্ধ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বিক্রয়।	
১৩।	স্ত্রীলোকদিগের গহনা	
	(ক) স্বামী বা পিতার নিকট প্রাপ্ত	স্বামীর নিকট প্রাপ্ত, প্রায় ৮০৲ টাকা
	(খ) সোনা, রূপা, পিত্তল কাঁসা, গিল্টি, শাঁখা, কাঁচ বা গালা।	১০৲ টাকা সোনা ৬৭৲ টাকা রূপা ৩৲ শাঁখা
১৪।	মজুত ধান, খড়, নাড়া, অথবা অন্য ফসলের পরিমাণ	২০০ আড়ি মজুত ধান ৫৲ নাড়া
১৫।	ঘটী, বাটী, থালা	ঘটী ৮-টা, বাটী ৬-টা, থালা ৪ খানা
	(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা	লোহার কড়াই ৩-টা
	(খ) মাটী, পাথর	আর সব কাঁসার।
১৬।	কর্জ্জ	১২০৲ টাকা কর্জ্জ
	(ক) কত বৎসরের	চার বৎসরের
	(খ) কি হারে সুদ	শতকরা ২০৲ টাকা বৎসরে
	(গ) কি কারণে	চাষের জন্য
	(ঘ) বাকী আসল এবং সুদ	
	(ঙ) ধানের বাড়ি	
১৭।	খরচের বিষয়	
	(ক) চাউল, দিনে কয় বেলা	৶৬ সের, দিনে দুই বেলা

(১) তেল (২) মাছ	তেল ১৲ মাছ ২৲
(৩) ডাল (৪) দুধ	ডাল ৩৲ দুধ ১৲
(৫) লবণ (৬) শাকসবজী	লবণ ‖৹ শাকসবজী ।৹
(৭) চিনি অথবা গুড়	গুড় চিনি ।৹—মাসিক।
(খ) কাপড় (বৎসরে কয় জোড়া)	১২ জোড়া কাপড়
(গ) বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ (বৎসরে কয় বার)	বৎসরে একবার খরচ ৬০৲ টাকা
(ঘ) চিকিৎসা	১০৲ টাকা
(ঙ) শিক্ষা	
(চ) মামলা মোকর্দ্দমা	
(ছ) চৌকিদারী রাজকর	
(জ) মাদক দ্রব্য	
(ঝ) বিলাসের সামগ্রী, ছাতা জুতা, জামা ইত্যাদি	ছাতা ২ খানা, জামা ৮টা বার্ষিক ১৪৲ টাকা

১৮। উদ্বৃত্ত অর্থ, উহার প্রয়োগ।

(ক) গহনা ক্রয়

(খ) ধার দেওয়া

(গ) ফসল ক্রয়

(ঘ) সেভিংশ ব্যাঙ্কে অথবা অন্য লোকের নিকট গচ্ছিত রাখা

(ঙ) লাঙ্গল, বলদ, জমি, শিল্পীর অস্ত্রপাতি ক্রয়	বলদ ২-টি, বৃষ ১-টি এবং গাভী ১-টি আছে

ভারতীয় শ্রমজীবিগণের ব্যয়ের হিসাব

উপরে যে তালিকাটি দেওয়া গেল সেরূপ অনেকগুলি তালিকার সাহায্যে নিম্নে প্রদত্ত আদর্শ তালিকাটি গঠিত হইয়াছে,

	মজুর		কৃষক		সূত্রধর		কর্ম্মকার		দোকানদার		দীন মধ্যবিত্ত	
১। খাদ্য	৯৫.৪	৯৯.৪	৯৪.০	৯৭	৮৪.৫	৯৬.৫	৭৯.০	৯০.	৭৭.৭	৮৬.৭	৭৪.০	৭৮.৭
২। বসন	৪.০		৩.০		১২.০		১১.০		৯		৪.৭	
৩। চিকিৎসা			১.০		১.০		৫.০		৫.৯		৮.০	
৪। শিক্ষা									১.০		৩.৩	

৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	·৬	২·০	২.৫	৪.০	৫.০	৮.০
৬। বিলাসের সামগ্রী	—	—	১.০	১.০	১.৪	২.০
মোট	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শ্রমজীবিগণের বৈষয়িক অবস্থার তুলনা

ইউরোপ এবং আমেরিকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থা তুলনা করিবার জন্য এই দুইটি তালিকা দেওয়া হইল। এগুলি আমেরিকার শ্রমবিভাগের সপ্তম বার্ষিক রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক ডলারের মূল্য তিন টাকার কিছু বেশী।

আমেরিকা	আয় (ডলার) ২০০	আয় (ডলার) ৩০০-৪০০	আয় (ডলার) ৫০০-৬০০	আয় (ডলার) ৭০০-৮০০	আয় (ডলার) ৯০০-১০০০	আয় (ডলার) ১২০০
১। খাদ্য	৪৯.৫৪	৪৫.৫৯	৪৩.৮৪	৩৮.৮৯	৩৪.৩৪	২৮.৫৩
২। বসন	১২.৮২	১৪.১৪	১৫.২৭	১৬.৩৩	১৬.৮৪	১৫.৭১
৩। আশ্রয়	১৫.৪৮	১৪.৯৮	১৫.১৫	১৫.৫০	১৪.৯৬	১২.০৯

৪। ইন্ধন	৭'০৭	৬'০৪	৫.৬৩	৪'৪২	৪.০০	৩'৫৭
৫। আলো	১.০১	.৯৮	'৯৭	'৮৮	'৭৪	'৪৫
৬। অন্যবিধ খরচ (চিকিৎসা, শিক্ষা, বিলাসের সামগ্রী)	১৩.৯৪	১৮.২৭	১৯.১৪	২৩.৮৮	২৯.১২	৪০.০৫

ইউরোপ :—

১। খাদ্য	৪৮.৩২	৪৯.৫৮	৫০.৫৬	৪৪.০০	৪৬.২৪
২। বসন	১৯.০৮	১৪.১৮	১৫.২১	১৮.৯৭	১৪.১৫
৩। আশ্রয়	৯.৩৮	১১.৯৩	১০.২৬	৯.৪৯	১০.৪৯
৪। ইন্ধন	৫.৩৮	৫.৪৯	৩.৩২	৩.৯৭	৫.১৯
৫। আলো	১.৬৬	১.৫৯	১.৩৭	১.২০	১.৫৩
৬। অন্যবিধ খরচ চিকিৎসা, শিক্ষা, বিলাস সামগ্রী)	১৬.১৮	১৭.২৩	১৯.৭৮	২২.৩৭	২২.৪০
	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

ভারতীয় জনসাধারণের কঠোর দারিদ্র্য

তালিকাগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রত্যেক ব্যক্তিরই আয় হইতে অন্নাভাব পূরণের পর অর্দ্ধাধিক অংশ উদ্বৃত্ত থাকে। উহার ফলে ঐসব দেশের জনসাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি উচ্চবিধ অভাবগুলি মোচন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের জনসাধারণের আয়ের এমন কি দশ ভাগের নয় অংশই অন্নাভাব মোচন করিবার জন্ত ব্যয়িত হয়, ইহাদিগের উচ্চবিধ অভাব মোচনের অধিক সুযোগ থাকে না,—সমস্ত শক্তিই শুধু ক্ষুধার প্রবল তাড়না নিবৃত্তি করিতে নিয়োজিত হয়। তাহার পর, আমাদিগের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দাবী চিকিৎসা এবং শিক্ষা অপেক্ষা যে অধিক প্রবল ইহা খুব দুঃখের বিষয়। আমাদিগের সমাজ যে কতকগুলি কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের জীবন-যাত্রা অধিকতর দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই সকল কৃত্রিম অভাবের ভার না বাড়াইয়া দিয়া যদি সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির যথোচিত চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিত তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হইত সন্দেহ নাই।

লোকশিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতি

বৈষয়িক জীবনের উন্নতির মূলভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক কৃষি এবং শিল্প-প্রণালী নিয়োগ করিতে পারিলে আমাদিগের দেশের কৃষি এবং শিল্পজীবিগণ দারিদ্র্য হইতে

মুক্ত হইতে পারিবে এবং প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিয়া উচ্চবিধ অভাব পূরণের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিবে।

বৈষয়িক উন্নতি জাতির চরম লক্ষ্য নহে

পাশ্চাত্য জগৎ বৈষয়িক উন্নতিকেই জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিবার সুন্দর পন্থা নির্ণয় করিয়াছে ; কিন্তু উচ্চ আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধার ফলে সেখানকার সমাজে কতকগুলি ভয়ানক ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সমাজে অর্থলিপ্সা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধনী ও দরিদ্রদিগের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান খুব অধিক হইয়াছে এবং সমাজে ঘোর অশান্তি ও বিপ্লব দেখা দিয়াছে। এই অশান্তি ও বিপ্লবের কারণ সমাজে একটা ভুল আদর্শের আধিপত্য। বৈষয়িক উন্নতি জাতীয় জীবনের চরম উন্নতি নহে, ইহা একটি উপায় মাত্র। জাতির চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতির মাপকাঠির দ্বারা জাতির বৈষয়িক অনুষ্ঠান এবং অর্থোৎপাদনের প্রণালীগুলি বিচার করিতে হইবে। ইউরোপের অর্থোৎপাদনের প্রণালী এক্ষণে আধ্যাত্মিক জীবনের সহায় হওয়া দূরে থাকুক উহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থোৎপাদন সর্ব্বাঙ্গীন জীবন-স্ফুরণের উপায় না হইয়া সভ্যতার চরম লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে, অর্থ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া জীবনকে অসুখী করিয়া তুলিয়াছে। জীবনকে আধ্যাত্মিকায় পরম আনন্দের দিকে না লইয়া গিয়া ইউরোপের বিরাট অনুষ্ঠানগুলি ক্রমাগত উহাকে

গভীর এবং অনন্ত বেদনার দিকে টানিয়া লইতেছে। অভাবের উপর অভাব-সৃষ্টি, অভাব-অর্চ্চনার নিত্য নূতন প্রণালী এবং বিপুল সমারোহ, সকলি যেন একটি বিরাট বেদনায় পরিসমাপ্ত হইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতে নবযুগের সূচনা

কয়েক মাস হইল জার্ম্মাণীর একজন প্রধান ধনবিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার Emil Hammacher বলিয়াছেন, 'আমরা এতদিন জানি নাই, আমাদিগের অর্থলাভের সার্থকতা কোথায়? আমরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি তাহাতে আমরা সুখ পাই নাই। আমরা এখন অন্য প্রকার কিছু চাই। আমরা বুঝিয়াছি, আমাদিগের দেশে একটা যুগ আসিতেছে, এ যুগের আদর্শগুলি আমাদিগের বংশধরগণকে একটা আদর্শে নূতন অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে, নূতন যুগের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা আমাদিগের বৈষয়িক জীবনের পঙ্কিল স্রোতকে নির্ম্মল করিয়া দিবে, মানুষ তখন প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ অনুভব করিবে।'

বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতের নিকটে ভারতবর্ষের বাণী

ইউরোপের দুই জন পণ্ডিত মাঝে মাঝে যে আশার কথা প্রচার করিতেছেন, আমার বিশ্বাস বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি ভারতবর্ষের সমগ্র জাতীয় জীবনের সেই একই কথা বলিবার

আছে। ভারতবর্ষ অর্থকে কথনও জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করে নাই, এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত। ইউরোপকে এই আধ্যাত্মিক বোধশিক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণ। আমরা নূতন নূতন বিজ্ঞান শিক্ষা করিব, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক-প্রণালী আবিষ্কার করিব, দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে রেলগাড়ী চালাইব, লৌহের কলকারখানার বিরাট আয়োজন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিব কিন্তু আমরা ইউরোপীয় নব-নাগরিক ব্যবসায়ের অনৈক্য ও অসদ্ভাব আনিব না। তাড়িৎ শক্তি ব্যবহার করিলে ব্যবসায়ের কেন্দ্রীকরণ অসম্ভব। যে সামাজিকতা আমাদের প্রাণ তাহাকে নূতন ভাবে শিল্পপ্রণালীতে ফিরিয়া পাইলে বর্ত্তমান শোষণ ও যন্ত্রবৎ পরিচালন-রীতি দূর হইবে। ধন ও শ্রমের সম্বন্ধ তথন আর নির্ম্মম ব্যক্তির নিরাশ্রিত সম্বন্ধ হইবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর স্বামিত্বে ও স্বায়ত্তশাসনে থনি ও কারখানা পরিচালিত হইলে মানুষের সৃজনশক্তি নিরুদ্ধ হইবে না, বিলাস-ভোগের আদর্শে দ্রব্য প্রস্তুত করণ নিয়ন্ত্রিত হইবে না এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মিলিত সমবায়ে এমন নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিবে, যাহা বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বগ্রাসী শিল্পের মূর্ত্তির পথনির্দ্দেশ করিবে। আমরা গ্রামে গ্রামে দেশীয় শিল্পের সন্ধান করিব, তাড়িৎশক্তি এবং ধূমকল দ্বারা বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে উহাদিগের উন্নতি সাধন করিব,— —অসংখ্য কৃষককে যৌথ-ঋণদান-সমিতিতে সমবেত করিয়া

মহাজনের ঋণ হইতে মুক্ত করিব, বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে কৃষি-কার্য্যের আয়োজন করিব এবং এক বিরাট যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া ফসল ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিব, আমরা উন্নত জল-সেচন-প্রণালী নিয়োগ করিব, শুষ্কপ্রায় খাল এবং নদনদী-গুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া আমাদিগের প্রান্তরগুলিকে পুনরায় সুজলা সুফলা করিব, আমরা বিপুল যৌথ ব্যাঙ্কের ধুরন্ধর হইয়া অর্থসঞ্চয় এবং বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিব,—আমরা অর্থোপার্জ্জনের বিপুল আয়োজন করিব,—কিন্তু এই সমস্ত বিরাট বৈষয়িক অনুষ্ঠান আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না, কারণ আমাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাস এবং বর্ত্তমানে নিজেদের আধ্যাত্মিক-বোধ এই আছে যাহা আমাদিগকে বারংবার বলিয়া দিবে, অর্থ নহে শান্তিই সমাজের শ্রেয়, বিলাসভোগ নহে সামাজিকাতাই মানুষের শ্রেয়। অর্থ আমাদিগকে ভোগী ও স্বার্থপর করিতে পারিবে না, অর্থ দ্বারা আমরা শারীরিক অভাবগুলি মোচন করিয়া সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আরো সক্রিয় হইব। অর্থের বিপুল আয়োজনের মধ্যে থাকিয়া আমরা দারিদ্র্যের সম্মান ভুলিব না, কারণ অর্থোপার্জ্জনের মধ্যে যে অসদ্ভাব ও অসাম্য লক্ষিত হয় তাহাই ত বর্ত্তমান সভ্যতার হলাহল বিষ। অর্থোপার্জ্জনের বিচিত্র প্রণালীর মধ্যে আমরা মানুষে মানুষের সদ্ভাব স্থাপনের বিচিত্র প্রণালীও আবিষ্কার করিব।

দারিদ্র্য পূজা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মহিমাপ্রচার

ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততাময় কর্ম্মস্রোতের মধ্যে আমাদিগের জাতীয় প্রাণধারা, সেই ধর্ম্মজীবন এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের সাধনা যাহা কোন্ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গগনে প্রথম প্রভাত উদয়ের সঙ্গে তপোবনে প্রথম সামরবে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ দ্বারা আজও পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা আরও ক্ষিপ্র গতিতে বহিতে থাকিবে, বিচিত্র বৈষয়িক অনুষ্ঠান এবং নূতন কর্ম্মজীবনের মধ্যে আমাদিগের সাধনা জাতীয় ইতিহাসের বৃহৎ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইবে। আমাদিগের শিল্পকলা বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রাণ পাইয়া বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে সুস্পষ্ট এবং ধ্রুবরূপে দেখাইয়া দিবে, বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মোপলব্ধি সহজ করিয়া দিবে। বর্ত্তমান যুগের আর্ট ও শিল্পের যে বিরোধ তাহা নিবারণ করিয়া বৈষয়িক জীবনকে একটা উচ্চস্থরে বাঁধিয়া দিবে। যন্ত্র ও মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির সংঘর্ষ তখন দূর হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইবে। আর্ট, যন্ত্র, শিল্পকলা, প্রত্যেকে তখন নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে মানুষের বিচিত্রমুখী বৃত্তির পুষ্টিসাধন করিবে। তখন আমাদিগের সেই অতীত কালের শিল্পকলার আদর্শ আরো মহীয়ান হইয়া উঠিবে— পদ্মাসীন বুদ্ধ যোগনিমগ্ন হইয়া একটি শতদলের উপর বসিয়া আছেন, শতদল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিহ্ন, তাঁহার দক্ষিণ করতল উন্মুক্ত, উহাতে বিতর্ক মুদ্রাচিহ্ন, তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে উপ-

দেশ প্রদান করিতেছেন। স্থির প্রশান্ত পরমধ্যানের এই আনন্দমূর্ত্তি,—পৃথিবীর অন্য কোন দেশের স্থাপত্যে বা শিল্পকলায় ইহার তুলনা মিলে না। ইহাই ত ভারতবর্ষের অতীত এবং ভবিষ্য জীবনের আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি,—ভারতবর্ষের আপনার তপস্যার ধন, সমগ্র এসিয়ার হৃদয়ে ইহারই অমর সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা। আজ বহু শতাব্দী পর এ মূর্ত্তি আমাদিগকে ভবিষ্য জাতীয়জীবনের পরম সার্থকতার সংবাদ আনিয়া দিতেছে। আমরা বুঝিয়াছি, আমাদিগের বিচিত্র কর্ম্মজীবন আমাদিগকে একটি পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতির দিকে লইয়া গিয়া সার্থক হইবে, আমরা ভোগলালসার প্রতি অনাসক্ত হইয়া প্রেম এবং সদ্ভাব অনুশীলন করিব,—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সামাজিক শান্তির চরম আদর্শ দেখাইব, এবং আকাঙ্ক্ষা বাসনার বশবর্ত্তী না হইয়া সেই পরমজ্ঞান লাভ করিব, 'যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি,' যাহা লাভ করিলে মানুষ যাহা কিছু পাইবার তাহা পায়, যাহা পাইলে ইউরোপ বর্ত্তমান অশান্তি ও সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবে। আমরা জানিয়াছি, আমাদিগের বৈষয়িক জীবন পাশ্চাত্যের মূঢ় এবং অন্ধ অনুকরণ হইবে না, ইহা আমাদিগের আত্মপ্রকাশ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হইবে, আধ্যাত্মিক বোধকে জাগাইয়া দিয়া ইহা একটা নূতন শান্তিময় সমবায় জীবনের সূচনা করিয়া দিবে। অতীতের ইতিহাসে সমগ্র এসিয়া ভক্তি-অর্ঘ্য আনিয়া যে মূর্ত্তিকে বহু শতাব্দী ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল, আমাদিগের জাতীয়জীবনের সেই অমর মূর্ত্তি আবার দিব্য

সৌন্দর্য্য ও বিমল শান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, শক্তিমদমত্ত ইউরোপ আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসের ভবিষ্য বৃহৎবিকাশের দিনে সেই ধ্যাননিমগ্ন যোগীর নিকট সদ্ভাব ও সহানুভূতির জ্ঞান লাভ করিবে, "যদ্‌জ্ঞানাতুন্মত্তো ভবতি স্তব্ধো, পুমানাত্মারামো ভবতি", যে জ্ঞান লাভ করিয়া ইউরোপ শুদ্ধ হইবে, সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ লাভ করিয়া পরমআনন্দ এবং শান্তি লাভ করিবে।

বিশ্বজগৎকে শান্তিদান বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠদান হইবে, বিশ্বমানবের নিকট ঋণ হইতে ভারতবর্ষ তখন মুক্ত হইবে। বিশ্বদেবতা ভারতবর্ষকে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আহ্বান করিতেছেন, ভারতবর্ষ কি সে আহ্বান শুনিয়া শীঘ্রই কর্ম্মতৎপর হইবে না?

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক আয়-ব্যয়

[বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চুঁচুড়া অধিবেশনে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণকে আহ্বান করা হয়, এবং বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহের নিমিত্ত একটি অনুসন্ধান-সমিতিও গঠিত হয়। ঐ সমিতির কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আমি কলেজের ছাত্রগণকে এই সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে কতকগুলি তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েকটি এই স্থলে প্রকাশ করিলাম। এই উপকরণ-সমূহ বঙ্গভাষায় ধনবিজ্ঞান-রচনার সাহায্য করিবে। দেশের আর্থিক অবস্থাও এই তালিকাগুলি হইতে অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।]

(১) শ্রীপুর, পটীয়া, চট্টগ্রাম

১। বৃত্তি (পেশা)—চাকুরী

২। জাতি হিন্দু

৩। বাড়ীর লোক-সংখ্যা ৫ জন

৪। কয়টি ঘর

(ক) খড় — ৩ খান

(খ) খাপড়া — ৩ খান

(গ) ইট

(ঘ) টিন

(ঙ) তর্জ্জা

৫। কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে, সংসারের কোন্ কাজ করে)—একজন উপার্জ্জন করে, অবশিষ্ট ঘরকন্নার কাজ করে।

(ক) বালক ও বালিকা — ১ জন বালিকা

(খ) স্ত্রীলোক — ৩

(গ) পুরুষ — ১

৬। জমি

(ক) কত বিঘা (কানি)— ভিটা বাড়ী প্রায় ১ কানি

(খ) পতিত, আবাদী, বন, চড়াই

(গ) স্বত্বের বিবরণ— লাখেরাজ

(ঘ) জমিদারের খাজনা—২৸৹

৭। কৃষক

(ক) কিসের আবাদ

(খ) কয়খান লাঙ্গল

(গ) জমির জন্য বীজ, মজুর অথবা অন্যান্য খরচ

(ঘ) ফসল, নাড়া, বিচালি ইত্যাদি বিক্রয়ে লাভালাভ

দরিদ্রের ক্রন্দন

৮। শ্রমজীবী, শিল্পী, ব্যবসায়ী

(ক) শিল্পী ও শ্রমজীবী ও মজুরী (অথবা চাউল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কাজ করা)

৯। স্ত্রীলোকদিগের গহনা

(ক) স্বামী বা পিতার নিকট প্রাপ্ত,—স্বামীর নিকট হইতে প্রায় ১০৬৲ টাকা

(খ) সোনা, রূপা, পিত্তল, কাঁসা—সোনা ৪৫৲ টাকা, রূপা ৫৬৲ টাকা, ৫৲ টাকা শাঁখা, বালা।

১০। ঘটি, বাটী, থালা—৩, ৬, ৫

(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা—৮, ০, ৬

(খ) পাথর ২ খান

১১। কর্জ্জ ১০০৲ টাকা

(ক) কত বৎসর

(খ) কি হারে সুদ—১৫৲ টাকা হারে

(গ) কি কারণে—বাড়ী তৈয়ার করা ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য

(ঘ) বাকী, আসল

(ঙ) বাকী, সুদ

১২। খরচের বিষয়

(ক) চাউল দিনে ২ বেলা—৴৩৸০

(১) তৈল (২) মাছ—তেল ১॥০, মাছ ॥০

(৩) দুধ (৪) দাল—দুধ ॥০, দাল ২৲

(৫) লবণ (৬) শাকসব্জী—লবণ ৮০, শাক-সব্জী ।৵০

(৭) গুড়-চিনি—।০

(খ) কাপড় (বৎসরে কয় জোড়া)—বৎসরে ১২ জোড়া

(গ) বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ (বৎসরে কত বার) —বৎসরে প্রায় ১ বার ২ বার, খরচ ৪০, ৫০ টাকা

(ঘ) শিক্ষা ২৲ টাকা

(ঙ) চিকিৎসা ৫৲ টাকা

(চ) মামলা-মোকদ্দমা

(ছ) চৌকিদারী

(জ) মাদক-দ্রব্য

(ঝ) বিলাসের সামগ্রী ছাতা, জুতা কোট ইত্যাদি—ছাতা ১ খান, কোট ৩টি, জুতা ২ জোড়া বার্ষিক ৯।১০৲ টাকা

১৩। উদ্বৃত্ত অর্থ—উহার প্রয়োজন

(ক) গহনা-ক্রয়

(খ) ধান্য-ক্রয় প্রায় ৩০।৪০৲ টাকা

(গ) ধার দেওয়া

(ঘ) Saving bank অথবা অন্য কোন স্থানে গচ্ছিত রাখা

১৪। লঙ্গল, বলদ,—

১৬। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন নাই

১৬। বালকদিগের উপার্জ্জন নাই

(২) শ্রীপুর, পটীয়া, চট্টগ্রাম

১। বৃত্তি (পেশা) কৃষি—

২। জাতি হিন্দু

৩। বাড়ীর লোক-সংখ্যা ৭ জন

৪। কয়টি ঘর ৫

(ক) খড় ৫

(খ) খাপড়া

(গ) ইট

(ঘ) টিন

(ঙ) তর্জ্জা

৫। কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে, সংসারের কোন্ কাজ করে)—একজন উপার্জ্জন করে, একজন অধ্যয়ন করে, দুইজন ঘরকন্নার কাজ করে।

(ক) বালক, বালিকা ২ + ১

(খ) স্ত্রীলোক ২ জন

(গ) পুরুষ ২ জন

৬। জমি ৫ কানি

(ক) কত বিঘা (কানি)

(খ) পতিত, আবাদী, বন, চড়াই, জলা—আবাদি ৩ কানি জলা ২ কানি

(গ) স্বত্বের বিবরণ—লাখেরাজ রায়তি

(ঘ) জমিদারের খাজনা ৭৲

৭। কৃষক

(ক) কিসের আবাদ
(খ) কয়খান লাঙ্গল
(গ) জমির জন্য বীজ সার মজুর অথবা অন্য খরচ
(ঘ) ফসল নাড়া বিচালি ইত্যাদি বিক্রয়ের লাভা-লাভ

} লাগায়তি

৮। শ্রমজীবী শিল্পী ও ব্যবসায়ী

(ক) শিল্প ও শ্রমজীবীর মজুরি অথবা চাউল ইত্যাদি দ্রব্য লইয়া কাজ করা

চাকুরীতে একজনের বার্ষিক ১৪০ টাকা উপার্জ্জন

৯। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন

(ক) ঘুঁটে অথবা জ্বালানি কাঠ বিক্রয়
(খ) সূতা কাটা
(গ) মজুরের কাজ

১০। বালকদিগের উপার্জ্জন

১১। দুগ্ধ, পশু ইত্যাদি বিক্রয়

১২। স্ত্রীলোকদিগের গহনা

(ক) স্বামীর নিকট প্রাপ্ত—স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রায় ১৫০৲ টাকা

(খ) সোনা রূপা পিত্তল—৮০৲ টাকা সোনা
৬৫৲ টাকা রূপা, ৫৲ টাকা শাঁখা

১৩। মজুত ধান, খড় এবং নাড়ার পরিমাণ (বা অন্য ফসলের)

১৪। ঘটি বাটি থালা—১০, ১২, ৭

(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা—লোহার কড়াই ৪-টি, পিত্তল ৫-টি, আর সব কাঁসা

১৫। কর্জ্জ

(ক) কত বৎসর—১৪০৲ টাকা

(খ) কি হারে সুদ—শতকরা ১২৲ টাকা হার

(গ) কি কারণে—পরিবার-পালনের জন্য

(ঘ) বাকী আসল

(ঙ) বাকী সুদ

(চ) ধানের বাড়ি

১৬। খরচের বিষয়

চাউল (দিনে ২ বেলা)—৴৬৸০ সের (১) তেল—২৷৷০
(২) মাছ—২৲ (৩) দাল—৩৷৷০ (৪) দুধ—১৲ (৫) লবণ—১
(৬) শাকসব্জী—৷৷৴০ (৭) চিনি গুড়—৸০ (মাসিক হিসাবে)

(খ) কাপড় (বৎসরে কত জোড়া)—প্রত্যেকে ২ জোড়া মোট ১৪ জোড়া

(গ) বিবাহাদি বৎসরে (কত বার)—বৎসরে দুইবার খরচ প্রত্যেক বার ৫০।৬০৲ টাকা

(ঘ) চিকিৎসা—১২৲ টাকা

(ঙ) শিক্ষা—২২৲ টাকা বার্ষিক

(চ) মামলা মোকদ্দমা

(ছ) চৌকিদারী

(জ) মাদক দ্রব্য

(ঝ) (বিলাসের সামগ্রী) ছাতা, জুতা, কোট ইত্যাদি—ছাতা ২ খানা, জুতা ৪ জোড়া, কোট ৬-টি বার্ষিক ১৮।১৯৲ টাকা

১৭। উদ্বৃত্ত অর্থ—উহার প্রয়োগ

(ক) গহনা ক্রয়

(খ) ধার দেওয়া

(গ) ফসল ক্রয়— প্রায় ৫০ টাকা

(ঘ) Saving bank অথবা অন্য রকমে কোন স্থানে গচ্ছিত রাখা

(ঙ) লাঙ্গল বলদ

(৩) শ্রীপুর, পটীয়া, চট্টগ্রাম

১। বৃত্তি (পেশা)—কৃষি ও মজুরি

২। জাতি কায়স্থ

৩। বাড়ীর লোকসংখ্যা ছয় জন

৪। কয়টি ঘর পাঁচ খানা

(ক) খড়

(খ) খাপড়া

(গ) ইট

(ঘ) টিন

(ঙ) তর্জ্জা

৫। কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে, সংসারে কোন্ কাজ করে)—২ জন উপার্জ্জন করে, আর বাকী ৪ জন সাংসারিক ও ঘরকন্নার কাজ করে

(ক) বালক

(খ) স্ত্রীলোক — ৪ জন

(গ) পুরুষ — ২ জন

৬। জমি

(ক) কত বিঘা (কানি) — ১০ কানি

(খ) পতিত, আবাদী, বন, চড়াই, জলা—পতিত ৩ কানি, আবাদি ৫ কানি, জলা ২ কানি

(গ) স্বত্বের বিবরণ—লাখেরাজ, রায়তি

(ঘ) জমিদারের খাজনা অন্নবাবদে জমিদারকে দেয় ১৩৲ টাকা, ধান ১৪ আরি

৭। কৃষক

(ক) কিসের আবাদ—বর্ষাকালে ধান্য, অন্য সময়ে মরিচ প্রভৃতি অন্যান্য ফসল

(খ) কয়খানা লাঙ্গল—২ খানা

(গ) জমির জন্য বীজ, সার, মজুর অথবা অন্য খরচ—বীজ ৭॥ আরি, মজুরের খরচ ২৪৲ টাকা

৮। শ্রমজীবী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী—মজুরীতে ২ জনের বার্ষিক প্রায় ৮০৲ উপার্জ্জন

(ক) শিল্পী ও শ্রমজীবীর মজুরী (অথবা চাউল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কাজ করা)

(খ) দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা—যে সময়ে যে রকম ফসল উৎপন্ন হয় তাহা অবস্থানুসারে বিক্রয় করা হয়।

(১) হাট বাজার কতদিন অন্তর—হাট ৪ দিন অন্তর বাজার প্রতিদিন।

(২) মহাজনের নিকট দাদন লইয়া কতহারে স্বদ—বার্ষিক শতকরা ১৫৲ টাকা স্বদ

(৩) বৎসরে কত বিক্রয়, লাভালাভ

৯। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন

(ক) ঘুঁটে অথবা জ্বালানি কাঠ বিক্রয়

(খ) ধান ভানা, গমপেষা

(গ) সূতাকাটা

(ঘ) মজুরের কাজ

১০। বালকদিগের উপার্জ্জন

১১। দুগ্ধ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বিক্রয়

১২। স্ত্রীলোকদিগের গহনা

(ক) স্বামী বা পিতার নিকট প্রাপ্ত, শ্রমলব্ধ—স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রায় ৮০৲ টাকা

(খ) সোনা, রূপা, পিতল, কাঁসা, গিল্‌টি, শাঁখা, কাঁচ বা গালা ১০৲ টাকা, সোনা, রূপা ৬৭৲ টাকা, শাঁখা ৩৲

১৩। মজুত ধান, খড় এবং নাড়ার পরিমাণ (বা অন্য ফসলের) ২০০ আরি মজুত ধান, নাড়া প্রায় ১৫৲ টাকা

১৪। ঘটি, বাটি, থালা—ঘটি ৮, বাটী ৬, থালা ৫

(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা—লোহার কড়াই ৩-টা, বাকী কাঁসা

(খ) মাটি, পাথর

১৫। কর্জ্জ ১২০৲ টাকা

(ক) কত বৎসর চারি বৎসর

(খ) কি হারে স্থদ বার্ষিক শতকরা ২০৲ টাকা

(গ) কি কারণে চাষের জন্য কর্জ্জ

(ঘ) বাকী আসল

(ঙ) বাকী স্থদ

(চ) ধানের বাড়ি

১৬। খরচের বিষয়

(ক) চাউল ⁄৬ সের দিনে ২ বেলা (১) তেল ২৲ (২) মাছ ২৲ (৩) দাল ৩৲ (৪) দুধ ১৲ (৫) লবণ ॥০ (৬) শাকসব্জী ।০ (৭) চিনি গুড় ৭৲—মাসিক হিসাবে

(খ) কাপড় (বৎসরে কত জোড়া) প্রত্যেকে ২ জোড়া,

(গ) বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ (বৎসরে কতবার) —বৎসরে একবার, খরচ প্রায় ৬০৲

(ঘ) চিকিৎসা ১০৲ টাকা

(ঙ) শিক্ষা

(চ) মামলা মোকদ্দমা

(ছ) চৌকি, গাড়ী

(জ) মাদক দ্রব্য—আফিং মাসে ১৲

(ঝ) বিলাসের সামগ্রী—ছাতা, জুতা, জামা ইত্যাদি—ছাতা ২ খানা, কোট ৮-টি, বার্ষিক ১৪৷১৫ টাকা

১৭। উদ্বৃত্ত অর্থ—উহার প্রয়োজন

(ক) গহনা ক্রয়

(খ) ধার দেওয়া

(গ) ফসল ক্রয়

(ঘ) Saving bank অথবা অন্য লোকের নিকট গচ্ছিত রাখা

(ঙ) লাঙ্গল, বলদ, জমি, শিল্পীর অস্ত্রাদি—লাঙ্গল ২ খানা বলদ ২-টি, বৃষ ১-টি, গাভী ১-টি

(৪) ফুলবেড়িয়া, ভগবানপুর, মেদিনীপুর

১। বৃত্তি—চাষ ও চাকরী

২। জাতি— মাহিষ্য

৩। আশ্রিত পরিজনের সংখ্যা—২৮

(ক) বালক—১২

(খ) স্ত্রীলোক—৫ (গ) পুরুষ—১১

৪। ১১ জন পুরুষের মধ্যে ১০ জন উপার্জ্জন করে। উহাদের মধ্যে দুইজন চাকুরী করে ও বাকী ৯ জন চাষ করে।

৫। বাড়ী—(ক) বসত বাটী,

(খ) খড়ের ঘর

৬। (ক) জমি বা আবাদী জমির পরিমাণ—৪০ বিঘা রবিখন্দের চাষ

(খ) ৫ বিঘা বসত বাটীর জন্য, বাকী ৩৫ বিঘা

(গ) ঐ জমিগুলি মৌরশী স্বত্বে দখল।

৭। জমিদারকে খাজনা দেওয়ার পরিমাণ—৮২॥০

৮। (ক) ২ বিঘা জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হয়। তিন বিঘা জমিতে সরিষা ও আখ হয়। আখ—১ বিঘা ও সরিষা—২ বিঘা

(খ) ৪ খান লাঙ্গল

(গ) বীজ ও সার কিনিতে হয় না। জমি চাষের জন্য মজুর খরচ প্রায় ৪০৲ টাকা

(ঘ) আখের গুড় বিক্রয়ে লাভ প্রায় বৎসরে ৮০৲। কলুর বাড়ী হইতে সরিষার তৈল করিয়া আনা হয়।

(ঙ) তিন চার দিন অন্তর হাট বাজার। বৎসরে ধান্য বিক্রয় প্রায় ১০।১২ মণ

৯। স্ত্রীলোকগণ কোনরূপ উপার্জ্জন করে না।

১০। বালকগণও উপার্জ্জন করে না, উহাদের মধ্যে ৪ জন লেখা-পড়া করে।

১১। বাৎসরিক চাউলের খরচ—৬০০৲

(ক) মাছ কিনিতে হয় না।

(খ) তৈলের খরচ ১০৲; লবণ ৭৷৷০; লঙ্কা মশলা ৭৲; চিনি ১২৲

(গ) কাপড় বৎসরে প্রায় ৮৯ জোড়া, দাম প্রায় ১২২৲ টাকা

(ঘ) শ্রাদ্ধাদির খরচ আন্দাজ ৩৫৲

প্রতি বৎসর বিবাহাদি হয় না

(ঙ) শিক্ষার খরচ প্রায়—৪০৲

(চ) মোকদ্দমা হয় না

(ছ) চৌকিদারী—৬৲

১২। বিলাসের সামগ্রী—৩০৲

১৩। উদ্বৃত্ত অর্থে গহনা ক্রয় প্রায়—৫০৲

লাঙ্গল বলদাদি ক্রয়—২০৲

১৪। ধান্যের পরিমাণ—২৮০ মণ, দাম ৫৬০৲

১৫। চাকুরীর বাৎসরিক আয় ৮৪৲

১৬। গরু ও বলদের সংখ্যা—১৩; তন্মধ্যে বলদ ৮-টি

(৫) কলাগেছিয়া, খেজুরি, মেদিনীপুর

১। বৃত্তি—চাকুরী ও চাষ

২। জাতি—করণ

৩। আশ্রিত পরিজনের সংখ্যা—৭; (ক) বালক—২; (খ) স্ত্রীলোক—২; (গ) পুরুষ—৩।

৪। ঘর—(ক) বসত বাটী

(খ) খড়ের ঘর

৫। তিন জন পুরুষের মধ্যে দুইজন উপার্জ্জন করে

৬। (ক) মোট নিজ জমির পরিমাণ ৩৷৷০ বিঘা আর ভাগে আবাদী জমির পরিমাণ ৬ বিঘা

(খ) ৩৷৷০ বিঘা জমির মধ্যে আবাদি জমি ৩৷০ কাঠা আর ঘরের জন্য ।০ কাঠা

(গ) ঐ জমির রাইয়তি স্বত্বে দখল হইয়া থাকে অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে হয়

(ঘ) জমির মোট খাজনা ৪।৵০ ; রোডসেস ৵০

৭। (ক) ৯০ বিঘা জমির মধ্যে ৯ বিঘাতে ধান্য ও ।০ কাঠা জমিতে শাকশব্জী, আলু, বেগুন ইত্যাদি হয়।

(খ) একখান লাঙ্গল

(গ) উপরোক্ত জমিতে চাষ করিবার জন্য বীজ কিনিতে হয় না। তবে ৯ বিঘা জমিতে চাষ করিতে দুই মণ বীজ লাগে

(ঘ) ঐ ফসল বিক্রয় করা হয় না

(ঙ) বৎসরে ব্যবসায়ে ও চাকরীতে আয় প্রায় ৬৬৲

৮। হাট বাজার চারিদিন অন্তর। ধান্য বিক্রয় করা হয় না।

৯। স্ত্রীলোকেরা উপার্জ্জন করে না

১০। বালকেরা উপার্জ্জন করে না

১১। (ক) বৎসরে চাউল খরচ—১২০৲

(খ) মাছ—২৲; সরিষার তৈল—৬৲; নারিকেল তৈল—৩৲; লবণ—২৲; মশলা—১৲; লঙ্কা কিনিতে হয় না; চিনিগুড়—৩৲

(গ) কাপড় প্রায় বৎসরে ১২ জোড়া—১৭৲

(ঘ) প্রতি বৎসরে বিবাহাদি ক্রিয়া হয় না। তবে শ্রাদ্ধাদি বৎসরে ৩।৪ বার হয়, আর লক্ষ্মীপূজা, জন্মাষ্টমী রাধাষ্টমী ইত্যাদি পূজা হয়, মোট খরচ—২॥০

(ঙ) চিকিৎসা—২৲

(চ) শিক্ষার জন্য—৮৲

(ছ) মোকদ্দমার খরচ প্রায় নাই, চৌকীদারী ট্যাক্স—॥৶০

(ঝ) বিলাসের সামগ্রী—৫৲

(৬) ফরিদপুর

১। বৃত্তি—সূত্রধর

২। লোকসংখ্যা—৪

৩। ঘর—টিন ১, খড় ১

৪। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি—১

৫। জমি—সাধারণ কর্ষা—কানি ও বর্গা আবাদী

(ক) কিসের আবাদ—ধান, পাট

(খ) ফসল—ধান, পাট, নাড়া, খড়

৬। বাৎসরিক আয়—১২০৲ টাকা

৭। দুগ্ধ বিক্রয়—৩৬৲ টাকা বৎসর

৮। গহনা—প্রধানত রূপার, সোনার নলক,

৯। মজুত ধান—২।৩ মাসের

১০। ঘটী, বাটী, থালা—পিতল, মাটী

১১। কর্জ্জ—২০০৲

স্বদ—২৲

কর্জ্জের কারণ—বিবাহ ইত্যাদি

১২। খরচ—

চাউল—বৎসরে প্রায় ১৮ মণ—৬০৲

তৈল—১২ সের—৬৲

মাছ—৩৲ টাকা

লবণ—২০ সের

কাপড়—৮ জোড়া—১১৲

চৌকীদারী টেক্স—৷৷০ আনা

তামাক ১০ সের

ছাতা }
জামা } —২৲

গরুর আহার খরচ ১০৲ টাকা

(৭) ফরিদপুর

১। বৃত্তি—পিতলের কাজ

২। লোক সংখ্যা—৫

৩। ঘর—খড় ১, টিন ২

৪। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি—১

৫। জমি—

৬। স্বত্বের বিবরণ—সাধারণ কর্ষা

৭। দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা—

৮। বাৎসরিক আয়—প্রায় ১৮০৲

৯। বালকেরা উপার্জ্জন করে না

১০। গহনা—পিতল, কাঁসা, কিছু রূপা

১১। ঘটী, বাটী, থালা

(ক) পিতল, কাঁসা, লোহা, মাটী, পাথর

১২। কর্জ্জ—৫০৲

সুদ—১॥০

১৩। কর্জ্জের কারণ—বিবাহ এবং চিকিৎসা

১৪। খরচ—

চাউল	বৎসরে প্রায় ২৪ মণ—৮৪৲
তেল	বৎসরে প্রায় ১২ সের—৬৲
মাছ	বৎসরে—২৲
ডাল	„—২০ সের
লবণ	„—১৮ সের
কাপড়	„—১০ জোড়া
চিকিৎসা	„—১০৲
শিক্ষা—	৩৲

চৌকিদারী টেক্স—।৵০ আনা

তামাক— ৪৲ টাকা

ছাতা, জুতা

ইত্যাদি— ১৷৷০ টাকা

১৫। সরঞ্জাম ক্রয়— ২৷৷০ টাকা

(৮) ফরিদপুর

১। বৃত্তি—মজুরী

২। লোকসংখ্যা—৪

৩। ঘর—২ ; টিন ১, খড় ১

৪। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি—১

বালক—১

স্ত্রীলোক—১

৫। স্বত্বের বিবরণ

৬। বাৎসরিক আয় ১২৫৲

৭। গহনা রূপার

৮। ঘটী, বাটী, থালা—পিতলের, কাঁসার, মাটীর

৯। কর্জ্জ

১০। খরচ—

চাউল—বৎসরে ১৮ মণ—৫৮৷৷০

তেল— ,, ১০ সের—৫৲

মাছ— ,, ,, —২৲

লবণ— ,, ১৮ ,,

কাপড়—৩ জোড়া বৎসরে—৩৶৹

১১। উদ্বৃত্ত অর্থ যৎসামান্য

(৯) কলিকাতা

১। বৃত্তি—কেরাণী

২। লোকসংখ্যা—৪

৩। ঘর—৩

৪। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি—১

বালক—২

স্ত্রীলোক—১

৫। মাসিক আয়—৫০৲

৬। খরচ

(মাসিক)

চাউল—	২৫৲
কাপড়, জামা জুতা	—১০৲
আলো	—৩।৹
খাবার	—৪৲
চাকর খোরাকী সুদ্ধ	—১৭৲
ধর্ম্মকর্ম্ম	—২৲
অন্য খরচ	—৪৲
	৬৫।৹ টাকা

৭। বাড়ী হইতে বাকী খরচ আসে

তৃতীয় অধ্যায়

দুরবস্থা বনাম বিলাসিতা

—:*:—

অভাবমোচান ও বিলাস

মানুষ তাহার অভাব-মোচন উদ্দেশ্যে রাত্রিদিন পরিশ্রম করিতেছে। সংসারের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ্য মানুষের নানাবিধ অভাব মোচন করা। সহরের কল-কারখানা বা গ্রামের পারিবারিক শিল্পকর্ম্ম, মন্থরগতি গরুর গাড়ী অথবা বেগবান মেল-ট্রেন, নৌকা বা সামুদ্রিক জাহাজ, মুদীর দোকান অথবা বড় বড় হৌস্ বা ব্যাঙ্ক সবগুলিই মানুষের নানাবিধ অভাব-মোচনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অভাব-মোচনের জন্য সমগ্র সমাজ শ্রমবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে—

(ক)	(খ)	(গ)
কৃষি এবং খনিজ দ্রব্য হইতে দ্রব্য প্রস্তুত করণের উপকরণ সামগ্রী উৎপাদন।	দ্রব্য প্রস্তুত করণ	দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্য

(ঘ)	(ঙ)
ধনোৎপাদন ক্রিয়ার	উদ্বৃত্ত ধনভোগ
ক্ষতিপূরণ	বিলাস সামগ্রী
	মূলধন

প্রথমে কৃষিজাত দ্রব্য অথবা খনিজ পদার্থ হইতে দ্রব্য প্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী পাওয়া যায় (ক)। ঐ সমস্ত উপকরণ লইয়া কারখানা-ফ্যাক্টরীতে দ্রব্য প্রস্তুত হয় (খ)। পরে বাণিজ্যের দ্বারা যাহার অভাব তাহার নিকট নীত হইয়া অভাব মোচন করে (গ)। এই তিন প্রকার কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিশ্রম এবং মূলধনের সংযোগ প্রয়োজনীয়। ধনোৎ-পাদনের জন্য অহোরাত্র যে বিপুল পরিশ্রম লাগিতেছে, উহার বিনিময়ে মানুষ প্রথমতঃ আপনার অভাব মোচন করিতে পারি-তেছে। প্রাথমিক অভাব মোচন করিয়া উদ্বৃত্ত ধন হয় বিলাস-ভোগ (ঘ) অথবা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় ধনোৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োগ করিতেছে (ঙ)। শেষোক্ত অর্থপ্রয়োগেই সমাজের অর্থবৃদ্ধির বিশেষ সহায় হয়। দুই একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কোন কৃষক শস্য বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ঐ টাকায় যদি একখান লাঙ্গল অথবা জমির উপযুক্ত সার ক্রয় করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার কৃষিকার্য্যে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে। কিন্তু যদি সে তাহা না করিয়া মদ খাইয়া ঐ টাকা খরচ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব পরিশ্রমের কোন চিহ্নই থাকিবে না। সাময়িক উত্তেজনায়

ক্ষণিক আমোদের জন্য ব্যয়িত হইল, অর্থ ব্যয়ের কোন স্থায়ী ফললাভ হইল না। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন জমিদার কি করিয়া তাঁহার অর্থব্যয় করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। বিদ্যালয়-স্থাপন, পুষ্করিণীখনন, শিল্পব্যবসায়-প্রবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করা তাঁহার ইচ্ছা, কিন্তু সম্প্রতি পারিষদবর্গের পরামর্শে তিনি নৃত্যগীতাদির জন্য অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন। যেস্থলে অর্থব্যয়ের ফল অধিক কালব্যাপী হয় না, তাহাকে আমরা প্রচলিত কথায় বিলাস-ব্যাপার বলিয়া থাকি। নৃত্যগীতাদিতে অর্থব্যয়ের ফল বেশীক্ষণ থাকে না; অপরদিকে সেই পরিমাণ অর্থে যদি একটি ব্যবসায় বা বিদ্যালয় চলিতে থাকে, এই প্রকার অর্থ ব্যবহারের সুফল আমরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। ধনবিজ্ঞানের দিক হইতে শেষোক্ত প্রকার অর্থ-ব্যবহারকে মূলধননিয়োগ [৬] বলা হয়। ইহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি অথবা নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। একদিক হইতে দেখিতে গেলে মানসিক অথবা নৈতিক উন্নতি সমাজের ধনবৃদ্ধির উপায় মাত্র।

যেখানে অর্থ-ব্যবহার বৈষয়িক উন্নতির কোন কাজেই আসে না, অর্থ আছে অতএব অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, নিজের বা সমাজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যখন উহা নিয়োজিত হয় না, কেবলমাত্র ক্ষণিক সুখের জন্য স্বার্থান্ধদিগের দ্বারা ব্যয়িত হয়, তখন উহাকে আমরা বিলাসিতা, সৌখীনতা, বাবুয়ানী বলিয়া থাকি।

এইস্থলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। সামাজিক

রীতিনীতি এবং দেশের জল-বায়ু অনুসারে অনেক দ্রব্য বিভিন্ন দেশে নিত্য আবশ্যক অথবা বিলাস-সামগ্রী হইয়া থাকে। ইউ-রোপে জুতা এবং জামা পরিধান কোন শ্রেণীর পক্ষেই বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে উহা বিলাস হইবে। আমাদিগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে ছাতা ব্যবহার বিলাস নহে কিন্তু ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা বিলাস হইবে। চীনদেশে চা পান বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে ইহা বিলাস। বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন দেশের জল-বায়ু এবং সামাজিক অভ্যাস অনুসারে বিলাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। দেশের জল-বায়ু এবং সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেহ অবজ্ঞা করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ কতকগুলি কৃত্রিম অভাব মোচন করিবার জন্য শুধু ব্যস্ত হয়, অথচ ঐ সমস্ত অভাব মোচন না করিলেও বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামে তাহার শক্তির হ্রাস হয় না, তাহা হইলে ধনবিজ্ঞান অনুসারে আমরা তাহাকে বিলাসী বলিব।

বিলাস-ভোগ সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত

এক্ষণে বিলাস-ভোগ কোন্ ব্যক্তিবিশেষ এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা বিচার করিতে হইবে। বিলাসীরা বলিয়া থাকেন, আমরা যদি বিলাস ভোগ না করি, অধিক সংখ্যক লোক কোন কাজ না পাইয়া অনাহারে থাকিবে। অনেক লোক বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, উহা-দিগের কাজ গেলে সমাজের ক্ষতি হইবে। কিন্তু একটু ভাবিয়া

দেখিলে তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইবে। যে টাকা তাঁহারা বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য খরচ করিতেছেন, সেই টাকায় যদি তাহারা একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে রোগীদিগের শুশ্রূষা এবং তাহাদিগের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রায় অতগুলি শ্রমজীবী কাজ পাইত। শ্রমজীবীদিগের পক্ষে ফল সমানই হইত। উপরন্তু সমাজে একটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠানের সূচনা হইত; যাহাদিগের জীবন দুর্ব্বহ এবং অন্ধকারময় তাহারা কিয়ৎপরিমাণে সুখী হইয়া সমাজের শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি করিত। এমন কি, যদি ধনীরা বিলাস-ভোগে অর্থ ব্যয় না করিয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের দ্বারা উহা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবে। অনেক শ্রমজীবী এইরূপে কাজ পাইবে এবং ধনীদিগের অর্থও বৃদ্ধি পাইবে। য়্যাড্যাম স্মিথ বলিয়াছিলেন, কোন ধনী যদি কয়েকজন চাকর নিযুক্ত করেন তিনি গরীব হইতে থাকিবেন, কিন্তু যিনি শিল্পী নিযুক্ত করেন তিনি আরও ধনী হইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনীর নিজের অর্থবৃদ্ধি অপেক্ষা সমাজের অর্থ এবং আনন্দ বৃদ্ধি অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতে হইবে। বিলাসীরা আরও বলিয়া থাকেন, সমাজের যদি বিলাস-ভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে অভিনব অভাব-মোচনোপযোগী অভিনব দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইবে না। ইহার ফলে সমাজের ধনোৎপাদন-শক্তি হ্রাস পাইবে, কর্ম্মশক্তি ক্রমাগত একই প্রকার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইলে উহা বিকাশ লাভ করিতে পারিবে

না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ধনোৎপাদনের আর একদিকও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ধনোৎপাদন সময়-সাপেক্ষ। সমাজ যদি নিত্য নূতন জিনিষ চাহে, তাহা হইলে অনেক জিনিষ যেগুলি কারখানায় প্রস্তত হইতেছে, সেগুলি বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই পুরাতন হইয়া যাইবে। ঐগুলি যদি বিক্রয় না হয় তাহা হইলে সমাজের কত পরিমাণ শক্তি যে ব্যর্থ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে বিলাস-ভোগ সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

রাস্কিন এক স্থলে লিখিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই উপযুক্ত আহার এবং বাসস্থান লাভ না করিতে পারে, ততদিন সে সমাজে বিলাস-ভোগ অতি নিষ্ঠুর কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। রাস্কিনের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে ইউরোপ-আমেরিকায় অর্থের যেরূপ অপব্যবহার হয় তাহা ধারণা করিলে বিপুল অর্থশালী পাশ্চাত্য-সমাজের পক্ষেও এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আমেরিকার এক একজন কোটিপতি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ভোজনে বসিয়া এক রাত্রে কোটি টাকাও খরচ করিয়া থাকেন। সেখানকার ধনীরা কে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ভট উপায়ে অর্থ ব্যয় করিতে পারে এই চিন্তাতেই ব্যস্ত! পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ বিপুল অর্থোপার্জ্জন, সেরূপ অর্থের অপব্যবহারও সমান ভাবে দেখা দিয়াছে। অথচ অসংখ্য শ্রমজীবী আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া উঠিতে পারে না।

আমাদের বিলাসভোগ

আমাদের দেশে আজকাল বিলাসভোগ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে পারিবারিক ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া যে আদর্শ (average) তালিকা গঠিত হইয়াছে তাহা হইতে দেশের মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ বুঝা যাইবে—

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীন মধ্যবিত্ত
১। খাদ্য	৯৫'৪	৯৪'৫	৮৪'৫	৭৯'০	৭৭'৭	৭৪'০
২। বসন	৪'০	৩'০	১২'০	৯'০	৯'০	৪'৭
৩। চিকিৎসা	×	১'০	১'০	৫'০	৫'৯	৮'০
৪। শিক্ষা	×	×	×	×	১'০	৩'৩
৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	'৬	২'০	২'৫	৪'০	৫'০	৮'০
৬। বিলাসের সামগ্রী	×	×	১'০	১'০	১'৪	২'০
মোট	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০

ধনী লোকদিগের ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই, তাঁহাদিগের তালিকা সংগ্রহ করিলে তাঁহাদিগের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ জানা যাইত। উল্লিখিত তালিকাটি হইতে বুঝা যায় যে, কয়েক শ্রেণীর শ্রমজীবী শিক্ষার জন্য ব্যয় না করিয়াও বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করে। মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে বিলাস সামগ্রীর জন্য ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থব্যয় বিলাস শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয় অপেক্ষা অধিক।

সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যয় বিলাসিতা নহে

এ ব্যয়কে অনেকে অর্থের অপব্যবহার মনে করেন। আধুনিক কালে ইহার ভার যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে ইহা স্বীকার্য্য। ইউ-রোপীয় সভ্যতার সমাগমে এ দেশের চালচলন খুব বাড়িয় গিয়াছে। অনেকগুলি নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট হইয়াছে, কাজেই এক্ষণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সংক্ষেপে সারিতে অনেকে বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের মাপ-কাঠির দ্বারা আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি বিচার করা অনুচিত। আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্ম এবং সমাজানুমোদিত হিন্দুজাতি যে সামাজিক আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিল ঐ আদর্শের দিক হইতে ইহাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ

আমাদিগের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিপত্তি এখনও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বজাতি এবং সমাজের মর্য্যাদা এখনও লোপ পায় নাই। ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখে স্বজাতিদিগের সহানুভূতি এবং সমবেদনা এখনও শ্রদ্ধার সামগ্রী রহিয়াছে। কোন হিন্দুকে আমরা তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না। তাই হিন্দু তাহার মাথায় দারিদ্র্যের গুরুভার বহন করিয়াও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ প্রকার অনুষ্ঠান স্বেচ্ছারী ব্যক্তির নিকটতম বন্ধুদিগের সহিত বিলাসভোগের জন্য নহে,—ইহা আমাদিগের সামাজিক জীবনের সাধনার ফল। ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহা সমাজের বন্ধন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সমাজের সহিত হিন্দুর জীবন্ত যোগ-অনুভূতির ফল। হিন্দু জন্ম হইতেই সেবার জন্য বলিপ্রদত্ত। প্রথমে পারিবারিক জীবন, তাহার পর জাতি-গত বা সামাজিক জীবন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। পরিবার জাতি বা সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজ তাহার কঠোর শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছে। হিন্দুসমাজ ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতিত্ব বিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দেয়। গাছ

যেমন পৃথিবী হইতে শিকড় ছাড়াইয়া ফল ধরিতে পারে না, সেরূপ হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিশাল সমাজ-ভূমিকে অতিক্রম করিয়া বিকাশ লাভ করে না।

পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ-বিচার

আজকাল নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদিগের দেশ এক নূতন প্রকার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছে। এ ব্যক্তিত্ব পরিবার এবং সমাজবন্ধনকে অবজ্ঞা করে, এমন কি গৃহবন্ধনকেও অস্বীকার করিতে অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না। বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তি, তাহা ইহা স্বীকার করে না। সমস্ত বন্ধনকে শৃঙ্খলের মত দূরে নিক্ষেপ না করিতে পারিলে এ ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশ তখনই সম্পূর্ণ যখন বিলাস ভোগ উচ্ছৃঙ্খল হয়, নিজ ইচ্ছা সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের সমস্ত দাবীকেই অগ্রাহ্য করে। পাশ্চাত্য জগতে এ আদর্শ কোন দেশবিশেষের নহে। সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফলে এই আদর্শেরই পুষ্টিসাধন করিতেছে। বহিঃবাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ এবং স্বদেশে জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতার ফলে এই আদর্শই সেখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে মনুষ্যের

কর্ম্মশক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, জগতে আর কোথাও এরূপ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মনুষ্য সেখানে শক্তিশালী হইলেও আপনার শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। ইহাতে সমাজে ঘোর অশান্তি এবং বিপ্লবের সূচনা দেখা গিয়াছে। বিগত ৪ঠা মার্চ্চ প্রেসিডেন্ট উড্‌রো উইল্‌সন আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া একটি সুন্দর বক্তৃতাতে আমেরিকার জাতীয় জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমেরিকা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, আমেরিকার ব্যবসায়ী এবং ধুরন্ধরগণের প্রতিভার নিকট সভ্যজগৎ মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু বিপুল অর্থো-পার্জ্জনের সঙ্গে অর্থের নিকৃষ্ট ব্যবহারও আমেরিকাবাসিগণকে জগতের সমক্ষে লজ্জা দিতেছে। অর্থোপার্জ্জনের বিনিময়ে সমাজে যে সমস্ত ভয়ানক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দিকে দৃক্‌পাতও নাই—টাকার ঝনঝনানি শব্দে অসংখ্য শ্রমজীবীর রোদনধ্বনি শুনা যায় না। আমেরিকা বড় হইয়াছে, বড় হওয়াতে তাহার দীনতা আরও প্রকাশ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজ যে ব্যক্তিত্বকে তাহার বিপুল প্রয়াসের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, উহা মানব-সভ্যতার পরিপোষক নহে বলিয়া সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই একটা নূতন যুগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই নূতন যুগে সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবে। সমাজের বাহিরে, দীনদরিদ্রদিগের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ হইতে

দূরে নিঃসম্পর্ক ভাবে বাস করা তখন হেয় হইবে। সমাজ যে সকলকে লইয়া—সমাজে সকলেই সুখশান্তির জন্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী, এবং এজন্য সকলেরই পরস্পরের নিকট কর্ত্তব্য আছে, এ জ্ঞানের তখন উপলব্ধি হইবে। ধনী বা নির্ধন, পণ্ডিত বা মূর্খ সকলেই যে মানুষ—তাহার বোধ লইয়া মনুষ্যত্বের আর অমর্য্যাদা হইবে না। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যখন শ্রদ্ধা বাড়িবে, তখন প্রজাতন্ত্র এক নূতন প্রাণ পাইবে, সমাজের সকরুণ সহানুভূতির সুরের সহিত আপনার সুর মিলাইবে, উহার মঙ্গল সাধন করিতে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। রুশোর ঐক্যমন্ত্র, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের উচ্চ নৈতিক আদর্শ, শেলির গভীর সমবেদনা, এবং ম্যাজিনির ধর্ম্মমূলক প্রজাতন্ত্রবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্লাইল এবং এমার্শনের মানব-পূজা, ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমাজ-তন্ত্রবাদ, জেম্‌স ও বার্গসঁর আধ্যাত্মিকতা এবং আধুনিক চিত্রকলার অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে সকলেরই মধ্যে একটা নূতন যুগের ভাবুকতা, এক মহাপ্রাণ নবজীবনের সূচনা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য জগৎ এখন এক বিপুল আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়াছে।

আধুনিক হিন্দুসমাজে পরানুকরণ

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য, ইউরোপ যে সময়ে আপনার সভ্যতার মূলমন্ত্র এবং আদর্শগুলি আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য

ব্যস্ত হইয়াছে, আমরা এখন সেগুলিই খুব আগ্রহের সহিত আমাদের জাতীয় জীবনে অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইউরোপীয় জাতিদিগের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক উন্নতি, এবং তাহাদিগের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার করিবার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদিগের জাতীয় আদর্শ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। আমাদিগের দেশে পুরাতন এবং নূতন আদর্শের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভুত্ব এবং প্রাবল্যের নিকট আমাদের জাতীয় আদর্শগুলি হার মানিতে চলিয়াছে। ইউরোপ যখন আপনার মাপকাঠি পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে আমরা ঠিক তখনই ইউরোপীয় মাপকাটি এদেশে আনিয়া উহার দ্বারা আমাদিগের সমস্ত অনুষ্ঠান বিচার করিতেছি। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদপ্রথার প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে।

নৈতিক অবনতি

ইউরোপের সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের আদর্শ আমরা ভারতবর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি, অথচ আমাদের সমাজের পক্ষে ঐ আদর্শ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য একেবারেই নাই বলিলেও চলে। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অশান্তি কলহ আনিয়াছি, পাশ্চাত্য গৃহস্থের স্বার্থপরতা স্বার্থান্ধতা আনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা এবং কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিতে পারি নাই।

আমরা আমাদিগের জাতিভেদপ্রথাকে বন্ধন মনে করিয়া উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অথচ ইউরোপের ঐক্যমন্ত্র হজম করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় হইয়া সমাজের বিপুল অর্থোৎপাদনের সহায় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্য আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার আবরণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের কোন চেষ্টা হইতেছে না, অথচ পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্মে আনাস্থা হইয়াছে। স্বার্থপরতার সঙ্গে অর্থপৈশাচিকতা এবং ভোগ-বিলাস-স্পৃহা সমাজকে আক্রমণ করিতেছে। ইউরোপীয় আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আমাদের সমাজে বিলাসপ্রিয়তা এবং সমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য আনিয়া দিয়াছে।

বিলাসিতার কুফল

পূর্ব্বেই আমাদের শ্রমজীবিগণের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। মধ্যবিত্তদিগের বিলাস খাতে ব্যয় যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাও বলা হইতেছে। ইহার প্রতি এখনও সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশে এখন হিন্দুজাতির উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা যে হ্রাস পাইতেছে তাহার কারণ, সমাজে ভোগ বিলাসের বৃদ্ধি এবং বৈষয়িক জীবনের অবনতি। নদীপ্রবাহের বেগ হ্রাস, বহু বৎসর চাষ, কৃষকের অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে ভূমির

উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে। গ্রাম্যশিল্পগুলি কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত হইতেছে। শিল্পিগণের বংশ-পরম্পরালব্ধ কর্ম্মনৈপুণ্য ব্যর্থ হইতেছে। দেশে মধ্যবিত্তদিগের জন্য শিল্প-ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ধুরন্ধরগণেরও আবির্ভাব হয় নাই। অপরদিকে ভোগ-বিলাসের বাসনা বাড়িয়াই চলিতেছে। পল্লীগ্রামের কুটিরেও বিলাসিতার স্রোত পৌছিয়াছে। কৃষক এবং শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কাঁসা-পিত্তলের বাসনের পরিবর্ত্তে এনামেলের বাসনের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কাঁসা-পিত্তলের বাসনগুলি এনামেলের বাসন অপেক্ষা অধিক-কালস্থায়ী এবং ভাঙ্গিয়া গেলেও ঐগুলি কাঁসা-পিত্তলের দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু এনামেলের জিনিষগুলি অব্যবহার্য্য হইলে উহাদিগের পরিবর্ত্তে আর কিছু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে তৈজসপত্রগুলি দরিদ্রদিগের মূলধন বিশেষ। অবস্থা মন্দ হইলে ঐগুলি বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া দৈনিক খরচ চালান যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি কৃষকগণ দৃশ্য-মনোহর এনামেল বাসনে মুগ্ধ হইয়া দুর্দ্দিনের সহায় ঐ সমস্ত তৈজসপত্রকে ত্যাগ করিতেছে। জামা, জুতা, এবং মিহি সূতার বিলাতী কাপড় পরিধানও আরম্ভ হইয়াছে। দেশের বিদ্যালয়ের এমনি গুণ—কোন কৃষক এবং শ্রমজীবী কয়দিন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িলেই বাবু না হইয়া ফিরিতে পারে না। অনেক সময় এমনি 'চাল বিগড়াইয়া' যায় যে, তাহারা বসিয়া থাকিবে তবুও বাপ-পিতামহের কর্ম্ম করিবে না।

মূল্যাধিক্য ও মধ্যবিত্তদিগের দুরবস্থা

কিন্তু মধ্যবিত্তেরা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই চাকুরীজীবী। আফিস আদালতে তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়। কাজেই তাঁহারা বিদেশী বেশভূষা, চালচলন অবলম্বন করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাদিগের সহরে থাকা আবশ্যক। গ্রাম অপেক্ষা সহরে সংসারের খরচ অনেক অধিক। গ্রামে থাকিয়া অনেক গৃহস্থ মৎস্য শাকসব্জী বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন, কিন্তু সহরে আসিয়া ঐগুলি ক্রয় করিতে হয়। সহরে দ্রব্যের মূল্য খুব অধিক। নিম্নলিখিত তালিকাতে দেশের মূল্যাধিক্যের পরিমাণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

১৮৭৩ সালের মূল্যকে ১০০ বলিয়া ধরা হইয়াছে—

		১৮৭৩	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০
১।	কৃষিজাত খাদ্যসামগ্রী—চাউল, দাল, যব, ভুট্টা প্রভৃতি ...	১০০	১৭৬	১৮১	২২৬	১৯৩	১৫৫
২।	অন্য খাদ্য—ঘি, লবণ ...	১০০	৮২	৯৬	৯৪	৮১	৯০
৩।	চিনি এবং চা ...	১০০	৬৮	৭৮	৪০	৭৮	৮৫
	(১—৩) খাদ্য ...	১০০	১০৩	১৪১	১৬৭	১৪৬	১২৭
৪।	তুলা, রেশম, পশম, এবং পাট —বস্ত্রাদির উপাদান ...	১০০	১২২	১২৭	১০৮	৯৬	১০৮
৫।	খনিজ পদার্থ—লোহা, তামা, কয়লা	১০০	১১৯	১৩৪	১৩৫	১২৪	১২৩
৬।	অন্যবিধ—কেরোসিন, চামড়া, ইত্যাদি ...	১০০	১৩৬	১৪৩	১৩৮	১২৭	১৩১
	(৪—৬) দ্রব্য সামগ্রী ...	১০০	১২৭	১৩৫	১২৬	১১৪	১২০
	(১—৬) খাদ্য এবং দ্রব্যসামগ্রী	১০০	১২৯	১৩৭	১৩৯	১২৪	১২২

মূল্যাধিক্যের হার অনুসারে মজুরী বৃদ্ধি পায় নাই। যুদ্ধের ফলে জীবনযাত্রার নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য যে পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহার তুলনায় বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই।

(ক) যুদ্ধের ফলে মূল্যাধিক্য—

১৯১৪	১৯১৮
১০০	১৬৮

(খ) কয়েদীর ভরণপোষণের ব্যয়—

১৯১৪	১৯১৮
১০০	১৭০

(গ) আসামের চা-বাগানের কুলীর মজুরী পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ বাড়ে নাই।

১৯১৪	১৯১৮
৬ ৫৩	৬।/৯

(ঘ) লস্করদিগের মজুরী—

১৯১৪	১৯১৮
১৭৲	১৭৲

(ঙ) রাণীগঞ্জের মালকাটার মজুরী—

১৯১৪	১৯১৮
১১৵০	১৩।/০

বিগত যুদ্ধের পর হইতে, অন্নসত্র এবং আবশ্যক নানাদ্রব্যাদি আরও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রকোপ সমস্ত দেশই

ন্যূনাধিক ভোগ করিতেছে কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার প্রকোপ যত অধিক এমন আর কোথাও নহে।

যুদ্ধের ফলে ভারতে মূল্যাধিক্যের পরিমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	১৯১৪	১৯১৫	১০১৬	১৯১৭	১৯১৮	১৯১৯
বিদেশাগত দ্রব্য	১০০	১০১	১২৬	১৭০	২১১	২৬৮
স্বদেশজাত দ্রব্য	১০০	১০২	১০৩	১১৭	১২৫	১৫০
গড়ে	১০০	১০১.৫	১১৪.৫	১৪৩.৫	১৬৮	২০৯

যুদ্ধের সময় অর্থের অতি প্রয়োজনবশতঃ নোটের বহুল প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়াছিল, এই কারণে সব দেশেই অল্লাধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ ইহার প্রকোপে এবং তাহার নিজস্ব অনেকানেক কারণে যত ভুগিয়াছে এবং ভুগিতেছে এমন আর কোন দেশই নহে। গত দশ বৎসর দেশের চাউল উৎপাদন ক্রমবনতির দিকে চলিয়াছে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, ইহার কারণ কি? পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যখনই এইরূপ দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যাইত, বর্ম্মা হইতে চাউল আমদানি হইয়া আসিয়া দেশবাসীর অনেকটা কষ্টের লাঘব করিত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু দিন পর হইতে অর্থাৎ ১৯১৬ সালের প্রারম্ভ হইতে বাঙলা দেশে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকিলেও বর্ম্মা হইতে চাউল বাঙলা দেশে না আসিয়া, আমেরিকা ইংলণ্ড, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে চালান হইতে থাকে—শুধু তাহাই নহে, বাঙ্‌লা দেশ হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ চাউল মাসের পর মাস

বিদেশে প্রেরিত হইতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ তখন বলিয়াছিলেন—যে চাউল চালান করা হইতেছে তাহা উদ্বৃত্তাংশ। ইহা সত্য নহে। কেননা বাঙ্‌লা দেশে ১৯১৬ সাল হইতেই দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা গিয়াছিল, তথাপি বাঙলা দেশ হইতে প্রেরিত চাউলের পরিমাণ ১৯১৬—১৭ ও ১৯১৮—১৯ সালের মধ্যে ৭৫,০০০ হইতে ১,৫৩,০০০ টন বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন বাঙলা দেশবাসীরা ক্ষুধায় প্রপীড়িত তখন তাহার সম্মুখ হইতে খাদ্য লইয়া গিয়া অন্য দেশ-বাসীর মদ চোলাই হইয়াছে—পুরী জেলায় যখন লোকে ঘাস পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিল তখন তাহারই দেশে উৎপন্ন তাহার খাদ্য জাহাজ বোঝাই হইয়া অন্য দেশে গিয়াছে।

কিন্তু ইহাই এক মাত্র কারণ নহে।

অন্যান্য কারণের মধ্যে দেখিতে গেলে, প্রথম নজরে পড়ে যে, শস্য উৎপাদনের দরুণ যে প্রকার জমি আবশ্যক তাহা কথঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছে। উপরন্তু বর্দ্ধমান, মৈমনসিং এবং বরিশাল প্রভৃতি জেলায় জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে কৃষির অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

অনেক স্থলে শস্য উৎপাদনোপযোগী বিস্তৃত ক্ষেত্র দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে; নানাপ্রকার আগাছা আবার ক্ষেত্রগুলিতে শস্য উৎপাদনের পক্ষে বিস্তর বাধা বিস্তার করিয়া ক্রমাগতই সংখ্যায় বাড়িতেছে, ইহা ছাড়া অধুনা কৃষিকার্য্যকে অধিকাংশ লোকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে ইহার কারণ এই যে, কৃষিকার্য্য করিয়া লাভবান হইতে আমাদের দেশে প্রায় কাহাকেও দেখা

যায় না। আর এক সমস্যা এই যে, কৃষিতে সম্বৎসরের খোরাক না চলাতে বৎসরের অধিকাংশ সময় কৃষকদিগকে টাকা কর্জ্জ করিয়া সংসার চালাইতে হয়। জমিদারের নিকট হইতে তাহারা এ বিষয়ে সাহায্য পাইয়া থাকে। কিন্তু বাঙলার জমীদার শ্রেণীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হওয়াতে কৃষকেরা বাহিরে হাত পাতিতে বাধ্য হইয়াছে। এদিকে সুচতুর ইংরেজ বণিক কিংবা মাড়োয়ারীগণ টাকার থলি লইয়া কৃষকদিগের সম্মুখে হাজির। তাহারা উৎপন্ন শস্য নগদ মূল্যে এবং ভবিষ্যতের জন্য দাদন দিয়া নিজেদের জন্য জোগান লইতে কৃষকদিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছে। দাদন দিবার সময় শস্যের যে মূল্য থাকে পরে উহা বাড়িলেও কৃষকের তাহাতে আর কোন হাত থাকে না। এই রূপে বাঙলার ভাণ্ডার নানাদিক দিয়া নানা হাতে লুট হইয়া যাইতেছে।

কি উপায়ে চারি পার্শ্বের এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে?—দেশ হইতে টাকার জোগান দিতে পারিলেই কৃষকদিগকে তথা উৎপন্ন শস্যকে বিদেশীর হাত হইতে বাঁচাইবার উপায় হইতে পারে। এ জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং বাজার বিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষকশ্রেণী যাহাতে বিদেশী এজেণ্টগণের সঙ্গে কারবারে না ঠকিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আইন অনুসারে শস্য বিক্রয় এবং বিনিময় সমবায়-সমিতির অধীনে আনিতে হইবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। দাদনের হাত হইতে কৃষককে বাঁচাইতে হইলে তাহার নিত্য প্রয়োজনীয়

অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তাহার উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমেরিকায় ফ্রান্সে এবং বেলজিয়মে এইরূপ ব্যবস্থায় প্রচুর উপকার পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে সংসারযাত্রার অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যও হ্রাস হইবার কথা।

কাপড়ের বাজার

১৩২৭ সালের পূজায় কাপড়ের বাজার, মুদ্রাবিনিময়ের আনুকূল্যের নিমিত্ত যত সস্তা হওয়া উচিত ছিল, তত সস্তা হয় নাই। তাহার একমাত্র কারণ, ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসাবুদ্ধিপ্রণোদিত মৎলব এবং চাল। কিছুদিনের জন্য কাপড় খুব সস্তায় বিক্রী হইয়াছিল, কেননা সেই সময়টা বিলাত হইতে অধিকতর কাপড় আমদানী আশা করিয়া ব্যবসায়ীরা তাহাদের গুদামজাত মালের কতকাংশ বাজারে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের একচেটিয়া শাসন হইতে মুক্তি পাইয়া, কিছুকালের জন্য কাপড়ের মূল্য কম হইয়াছিল—কিন্তু কিছুদিন পরেই বিলাতে শ্রমজীবিদিগের গোলমাল হয়, এজন্য মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি এবং বিলাত হইতে সটান রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে, আবার মূল্য বাড়িয়া যায়। স্বদেশী মিলেরা সুযোগ বুঝিয়া এই সময় কাপড়ের মূল্য চড়াইয়া দেয়, এই কারণে মূল্যাধিক্য চলিতেই থাকে, যদিও সেই সময়ে মুদ্রাবিনিময় সানুকূল হইয়াছিল। বাঙলা দেশের মাড়োয়ারীরা প্রথম সুযোগ বুঝিয়া সময়মত মাল গুদামজাত করিতে পিছপাও হয় নাই—তদ্রূপ দেশের তন্তুবায়েরাও। এই

সময়ে বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী এবং কল্যাণ মিলের দেয় লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫ হইতে ২০—যখন পাশেই বুরিয়া কটন, দানবার এবং নিউরিং মিল্ শতকরা ৫০ হইতে ২০০ লভ্যাংশ দিতেছিল। শেষোক্ত মিলগুলি ১৯১৪ সালে কিছুমাত্র লভ্যাংশও দিতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইতেছে ব্যবসায়ীদের উদ্বৃত্তলাভের উপর উচ্চ মাশুল আদায় করা। এই সময়ে বণিকদিগের ন্যায্য লাভ সঠিক নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে ভাল হয় যাহাপেক্ষা কোন বণিককে অধিক লাভ করিতে দেওয়া হইবে না। ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্ট হইতে, এই রকম গোলমাল হইলেই, লোক নিযুক্ত হয়—যাহারা বণিকদিগের সব অন্যায়ের প্রতিবিধান করে এবং কৃষিদ্রব্যের মূল্য এবং কৃষিজীবীর পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত করিয়া এবং তৎসঙ্গে বণিক্‌দিগের ন্যায্য লাভের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি এইরূপ কোনো পন্থা আবিষ্কার আবশ্যক মনে করেন নাই।

আর এক কথা, ভারতবর্ষ হইতে তুলা রপ্তানি অল্পই হইয়াছে। তুলা রপ্তানি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিলে কিংবা রপ্তানি-শুল্ক বসাইলেও বিশেষ কোন ফল হইবে না, কারণ তাহাতে জাপানও ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে বস্ত্র আমদানির কোন ব্যাঘাত হইবে না।

ইংলণ্ডে যে শুধু গবর্ণমেণ্ট হইতেই শিল্প রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহা নহে, বিভিন্ন শিল্প-সংঘের মুখপত্রস্বরূপ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এক সঙ্গে মিলিয়া, ন্যায্যলাভ ও মজুরী প্রভৃতি আবশ্যক

প্রশ্নের সমাধান করে। আমাদের দেশেও এইরকম হওয়া প্রয়োজন।

মূল্যাধিক্যের ফলে কৃষক, মহাজন এবং ব্যবসায়িগণ লাভবান হইয়াছে। যেখানে কৃষক দরিদ্র এবং ঋণভারগ্রস্ত, সে ক্ষেত্রে মহাজন এবং ব্যবসায়িগণই অধিক লাভ করিয়াছে। কৃষকদিগের লভ্য তাহারাই আত্মসাৎ করিয়াছে। শিল্পীদিগের অবস্থা মন্দ হইতেছে। শিল্পজাত দ্রব্যের উপাদান-সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে, কিন্তু শিল্পীরা তাহাদিগের নির্ম্মিত দ্রব্যও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। কলকারখানার প্রতিযোগিতায় তাহারা উপরন্তু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মজুর ও মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে।

চাকুরীজীবিদিগের মাহিয়ানা বাড়িবার আশা নাই। বরং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই উহা কমিতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অথবা অন্য প্রকার স্বাধীন অন্নসংস্থানের দিকে বেশী মন দেন নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাশের হার-বৃদ্ধির সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের আফিস-আদালতে বা ব্যবসায়ীদিগের অফিসে কেরাণীগিরি পাওয়া কঠিন হইয়াছে; উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ি-গণের গড় আয় বিশেষ কমিয়াছে। অপরদিকে দেশের মূল্যাধিক্যের সমস্ত ভারই মধ্যবিত্তদিগের উপর পড়িয়াছে, কারণ মূল্যাধিক্যের সহিত তাহাদিগের আয়-বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধই নাই। পূর্ব্বেই তাহাদিগের সহরে অবস্থান পূর্ব্বক বিদেশী

চালচলনের অবলম্বনের কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অধিকমূল্যে বিদেশী বেশভূষা পরিধান, চা-পান, সিগার-সিগারেটের ধূমসেবন, বরফ-পান প্রভৃতির সঙ্গে সহরে অবস্থানের অন্যবিধ আনুসঙ্গিক ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাতায়াতে সময় সংক্ষেপ উদ্দেশ্যে নহে, অনেক সময়ে আরাম উপভোগের জন্য কেরাণীরা ট্রামের টিকিট ক্রয় করিতেছে। সহরে স্বাস্থ্যরক্ষা, জলের কল, জল-সরবরাহ এবং আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের জন্য মিউনিসি-পালিটিসমুদয়ের খরচ খুব অধিক হইয়াছে, অনেক সহরেই মিউনিসিপাল ট্যাক্সের পরিমাণ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর সহরের বাড়ীভাড়াও বাড়িয়াই চলিতেছে। উপরন্তু সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া চাকুরীজীবিগণ বিশ্রামলাভের জন্য উৎকট আনন্দ-উপভোগের পক্ষপাতী হইতেছে। উহাতে তাহাদিগের কেবলমাত্র যে অধিক ব্যয় হইতেছে তাহা নহে, নৈতিক অবস্থারও অবনতি হইতেছে। এই সমস্ত কারণে মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

উচ্চ জাতিসমূহের ক্রমিক সংখ্যা হ্রাস

মধ্যবিত্তদিগের ব্যয় বাড়িতেছে অথচ অন্ন-সংস্থানের সুবিধা হইতেছে না, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে আধুনিক চালচলন রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বৈষয়িক অবস্থার যদি ক্রমোন্নতি না হয় তাহা হইলে সমাজে হয় লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে, না হয় সমাজানুমোদিত চালচলন রক্ষিত হইবে না। অধিকাংশ স্থলেই

চালচলন রক্ষা করিবার জন্য সমাজের শক্তি ব্যয়িত হয়, লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে; ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা কঠোর হওয়াতে এই দুই দেশে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাত অধিক কম। এ জন্য এই দুই দেশের সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। আমাদের দেশে উচ্চজাতিসমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে তাহার প্রধান কারণ একই—আমাদের দারিদ্র্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চালচলন উচ্চ হইয়াছে, অনেক নূতন কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ঐ চালচলন রক্ষা, ঐ সমস্ত নূতন নূতন অভাব মোচন করিবার জন্য দেশে নূতন নূতন বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নাই। আমাদের বৈষয়িক জীবন-প্রবাহ প্রবলতর না হইয়া বরং বৎসরের পর বৎসর ক্ষীণ হইতেছে। কাজেই সমাজ তাহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া চালচলন রক্ষা করিবার জন্য অধিক ব্যস্ত হইয়াছে। হিন্দুজাতি মরণোন্মুখ।

লোকসংখ্যা হ্রাসের প্রতিকার,—
ধনবৃদ্ধি বনাম সমাজ-সংস্কার

লোকসংখ্যা হ্রাসের অন্য কারণও থাকিতে পারে। কিন্তু বৈষয়িক জীবনের ক্রমাবনতি যে ইহার প্রধান কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দেশের কয়েকজন সমাজ-

বিজ্ঞানবিদ্ একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথাকে লোক-সংখ্যা হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এই সবগুলি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সমাজবিজ্ঞানের দিক হইতে ইহাদিগের উপকারিতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন, আধুনিক কালে ঐগুলি আমাদের বৈষয়িক জীবন-যাপনের সহায় না হইয়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথা যে এখন আমাদের বৈষয়িক জীবন-প্রবাহের বাধাবিঘ্নরূপে পরিণত হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ প্রকার বাধাবিঘ্ন নদী-প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী প্রতিরোধস্বরূপ। নদীর গতি নদীমধ্যবর্ত্তী বাধাবিঘ্ন অপেক্ষা মূল প্রস্রবণের উপর অধিক নির্ভর করে। আমাদের দেশে বৈষয়িক জীবন-প্রবাহ যে ক্ষীণ হইয়াছে তাহার কারণ, উহার মূল প্রস্রবণ নানা কারণে শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। সমাজের ধনোৎপাদনশক্তি হ্রাস পাওয়াতে দেশে কঠোর দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে ধনোৎপাদনের মূল তথ্যগুলি আলোচনা না করিয়া যদি আমরা যৌথপরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতির আমূল পরি-বর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় শক্তির অসদ্ব্যবহার হইবে। সামাজিক বিপ্লবের সূচনা না করিয়া এখন দেশের ধনোৎপাদনশক্তি কিরূপে বৃদ্ধি পায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য সমস্ত চিন্তা নিয়োগ করিতে হইবে। দলাদলি এবং বিবাদের প্রশ্রয় দিবার অবসর আমাদের সমাজের নাই; এখন স্থির সংযতভাবে সমাজের সকলকে একই উদ্দেশ্য সাধনের

জন্য কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। ধনবৃদ্ধির জন্য সমাজের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারিলে, সমাজ তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হইবে। কঠোর দারিদ্র্য-ব্যাধি হইতে মুক্তি-লাভের পর সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি নূতন প্রাণ পাইবে, আপনা-দিগের ক্রমবিকাশ ফলে তাহারা নূতন অবস্থার উপযোগী হইবে, তর্কবিতর্ক বাক্‌বিতণ্ডা দলাদলির তখন কোন প্রয়োজন হইবে না। সমাজের যাহা গোড়ায় গলদ, সেই কঠিন দারিদ্র্য-ব্যাধির প্রতিকার হইলে সমাজ-শরীরের ব্যাধির কোন উপসর্গ ই আর দেখা যাইবে না, তখন সমাজ সবল হইয়া শান্তিলাভ এবং আনন্দ উপভোগ করিবে।

ধনবৃদ্ধির উপায়—বিলাসবর্জ্জন

ধন-বিজ্ঞানবিদেরা বলিয়াছেন, ধনাগমের প্রধান উপায় মূলধন বৃদ্ধি। ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অন্নবস্ত্রাদির অভাব মোচন করিয়া যদি বিলাস-সামগ্রীতে তাঁহাদিগের উদ্‌বৃত্ত ধন ব্যয় না করেন, পরন্তু উদ্‌বৃত্ত ধন শিল্পবাণিজ্য-ব্যবসা ইত্যাদিতে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি অতি শীঘ্রই হইবে।

ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিলাস-বর্জ্জন এবং কৃষি ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যোগদান এবং উদ্‌বৃত্ত ধন-নিয়োগ জাতীয় ধনবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। আধুনিক কালে আমাদের দেশে কোন্ শিল্প এবং ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক,—ফ্যাক্টরী, ছোট কারখানা অথবা গৃহ-শিল্প, ইহাদিগের মধ্যে কোন্ অর্থোৎপাদনপ্রণালী বিভিন্নক্ষেত্রে

অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা আমাদের মধ্যবিত্তেরা কি পরিমাণ লাভ করিতে পারে, এ সমস্ত বিষয়ের শীঘ্রই মীমাংসা না করিলে বৈষয়িক জীবনে উন্নতির আশা করা বৃথা। এই অধ্যায়ে উক্ত জটিল বিষয়গুলি আলোচনা করা হইবে না। কিন্তু ধনোৎপাদনের আর একটি দিক,—ধনী এবং মধ্যবিত্তদিগের বিলাসবর্জ্জন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বে সমাজের দিক হইতে বিলাসবর্জ্জনের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। যে সমাজে অনেক লোক অন্নবস্ত্রাভাব মোচন করিতে অসমর্থ, সেখানে বিলাস-ভোগ নিশ্চয়ই সমাজ-নিন্দিত এবং নীতি-বিরুদ্ধ। ধনোৎপাদনের দিক হইতে দেখিতে গেলেও বিলাসবর্জ্জনের উপকারিতা বেশ বুঝা যাইবে। ধনোৎপাদন-ক্রিয়ায় সমাজের অনেক শক্তি ব্যয় হয়। এই শক্তিব্যয়ের ফলে সমাজ তাহার নানাবিধ অভাব মোচন করিতে পারে। শারীরিক অভাবগুলি মোচন করিয়া সমাজ যদি ক্রমাগত নূতন নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহা হইলে শেষে সমাজ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও তাহারই চিন্তাপ্রসূত অভাবগুলি মোচন করিতে সমর্থ হইবে না। বিলাসিতার সৌখীনতার সীমা নাই, কিন্তু সমাজের শক্তির সীমা আছে। সুতরাং ব্যক্তির মত সমাজেরও তাহার নির্দ্দিষ্ট শক্তির যথোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বিলাস-ভোগে শক্তির অপব্যয় করিলে সমাজ ক্রমে দুর্ব্বল হয়। আবার সামাজিক জীবন শুধু বর্ত্তমান লইয়াই নহে, ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত আপদবিপদের জন্য সমাজের শক্তি সঞ্চয় করা উচিত। যে

সমাজ কেবলমাত্র বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত, যে সমাজের সমস্ত ধন একপুরুষেই আমোদ আহ্লাদ বিলাস উপভোগের জন্য ব্যয়িত হয়, সে সমাজ অপরিণামদর্শী, ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনে তাহার বিপদের সীমা থাকে না। সম্রাট নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ, ওয়েলিংটনের বীরত্ব নহে, ইংলণ্ডের ধনী এবং ব্যবসায়িগণের মিতব্যয়িতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথমে ইংলণ্ডে তাহার পর সমগ্র ইউরোপীয় জগতে এক বিরাট বৈষয়িক আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। উহার ফলে ইংলণ্ড ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইয়াছিল। ইংলণ্ড বিলাসভোগে অর্থ ব্যয় না করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। নেপোলিয়নের সহিত যখন ইউরোপের যুদ্ধ বাধিল তখন ইংলণ্ডই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতা হইল, ইংলণ্ডের অর্থ এবং সৈন্য-সাহায্যে স্পেন, জর্ম্মণী এবং অষ্ট্রীয়া মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শেষে নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে যখন নেপোলিয়ন তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন ফরাসীদের দারিদ্র্যের সীমা ছিল না। ফ্রান্স অপেক্ষা ইংলণ্ড যুদ্ধের গুরু ব্যয়-ভার সহজে বহন করিতে পারিয়াছিল।

ভোগে অশান্তি

কেবলমাত্র যুদ্ধ বা বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা এবং শান্তি স্থাপনের জন্য নহে, সামাজিক জীবনে আনন্দ-ভোগের জন্যও বিলাস-দমন আবশ্যক।

দরিদ্রের ক্রন্দন

যে সমাজ-ভোগে উন্মত্ত, তাহা শীঘ্রই কতকগুলি কৃত্রিম ব্যবধানের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের বিভক্ত হয়। সমাজের দরিদ্র সম্প্রদায়ের সমস্ত শক্তি তাহাদিগের প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিবার জন্যই ব্যয়িত হয়। ধনীসম্প্রদায় কৃত্রিম অভাব-মোচন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে। মানুষের কৃত্রিম অভাবের সংখ্যা স্বাভাবিক অভাব অপেক্ষা অধিক। কৃত্রিম অভাবসমূহের বৈচিত্র্যেরও সীমা নাই, কিন্তু প্রাথমিক অভাব-সমূহের ঐরূপ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। বিলাস-সামগ্রীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের সীমা নাই বলিয়া একদিকে যেমন দরিদ্রসম্প্রদায় অন্নবস্ত্রাভাব পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে,—অপরদিকে ধনীদিগের মধ্যে কে কত প্রকার বিলাস-সামগ্রী ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়। ক্রমশঃ ধনিগণের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ আরম্ভ হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর বিভিন্ন চালচলন নির্দ্দিষ্ট হয়। অবশেষে ধনী এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে ব্যবধান খুব অধিক হয়। ক্রমে অর্থের এবং বিলাসভোগের তারতম্যের সহিত সামাজিক ব্যবধান দেখা যায়। এইরূপে বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক জাতি নীচ জাতির সহিত বিবাহে আদান প্রদান করে না। অর্থের তারতম্যের উপর নির্ভর করিরা জাতিভেদ-প্রথা একবার সৃষ্ট হইলে সমগ্র সমাজ অর্থলালসার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। অর্থোপার্জ্জন সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারের উপায় হইলে সমাজের আর কোন লক্ষ্য থাকে না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপত্তি

বাড়িয়া উঠে। ইহার ফলে জাতির যাহা চরম আদর্শ হওয়া উচিত, সেই আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্য হইতে সমাজ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। উপরন্তু সমাজে ঘোর অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অহোরাত্র খাটিয়া মরে, অথচ তাহারা কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারে কি না সন্দেহ। অনৈক্য খুব অধিক হইলে সমাজে বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইবেই। পাশ্চাত্য জগৎ এখন ঠিক এই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজে অশান্তি

পাশ্চাত্য জগতে ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এ কারণে ধনী এবং দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য আর এক দিকে বিলাস-ভোগের লীলাখেলা, ইহাই পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক জীবনের চিত্র। অর্থের তারতম্য অনুসারে পাশ্চাত্য সমাজ বিশিষ্ট জাতিসমূহে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থপূজার বিপুল সমারোহের মধ্যে ধর্ম্ম, প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে! ধর্ম্ম এখন ধর্ম্মের ভাণ মাত্র হইয়াছে। ধর্ম্মের যাহা প্রাণ—ভাবুকতা, পাশ্চাত্য সমাজের আব্‌হাওয়াতে পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। ধর্ম্ম অভাবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর নাই, এমন

কি গৃহবন্ধনের শৈথিল্যও দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অসংযম, রাষ্ট্রীয় জীবন এখন দলাদলির ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে, দলাদলি ভুলিয়া সমগ্র সমাজের যাহা প্রকৃত অভাব তাহা চিন্তা করিবার কাহারও অবসর নাই। ইহার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপত্তিও দেখা দিতেছে।

ইউরোপে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনকুবেরগণই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত আইনকানুন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সমাজের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সাহিত্য জগতে মহনীয় ভাব ও সত্য আর আবিষ্কৃত হইতেছে না। যে বিদ্যা অর্থকরী নহে তাহার সম্মান কমিয়া আসিতেছে! শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে,—জীবিকার্জ্জনোপযোগী কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞান বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করণের জন্য নিয়োজিত হইতেছে,—সমাজের বিশ্রামভোগ যাহাতে সহজসাধ্য হয় এবং বিশ্রাম লাভ করিয়া সমাজ যাহাতে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার দিকে দৃকপাত নাই। বিজ্ঞানের সহিত চিত্রকলাও এখন বিলাস উপভোগের সহায় হইয়াছে। মধ্য যুগে সমাজের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত তাৎকালিক চিত্রকলার যে জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

প্রতিযোগিতা ও অনৈক্য

বিলাস-ভোগের সহিত সমাজে সহানুভূতির অভাব দেখা দিয়াছে। ডারুইন প্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন, সমাজ কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়াই উন্নতি লাভ করিতে পারে। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন, প্রতিযোগিতার ফল সক্ষমের জয় এবং অক্ষমের পরাজয়, সক্ষমেরাই সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এই মতই পাশ্চাত্য জগতে সাধারণতঃ গ্রাহ্য। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, সমাজের মধ্যে যে কত লোক জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া দুঃখ এবং কষ্টের সহিত কালাতিপাত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু তাঁহাদের মতে এই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। হার্ব্বর্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, অসমর্থদিগের বিলোপই সমাজের কল্যাণপ্রদ, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে সমাজশক্তির অপব্যবহার হইবে। কিন্তু বিবর্ত্তনবাদের এই মূল তথ্যটি সমাজ-বিজ্ঞানের শেষ কথা নহে। কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারাই সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না, প্রতিযোগিতার সহিত সহযোগিতাও সমাজের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সমাজ প্রতিযোগিতাকেই এখন সভ্যতাবিকাশের মূলমন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে,—সহযোগিতা সামাজিক উন্নতির কি রূপ সহায়, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল—অনৈক্যকে—বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগৎ স্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ

কিন্তু এই অনৈক্যের সহিত যে বিলাস-ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সমবেদনার অভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিতেছেন। তাহা অনৈক্য অস্বীকার করে, তাহা ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত—ইহার নাম সোসিয়ালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ। তাঁহারা বলেন, অনৈক্য নহে, ঐক্যই স্বাভাবিক,—পাশ্চাত্য সমাজে শতকরা ৮০ জন এখন যে দেশোৎপন্ন ধনসম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগও ভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ তাহাদিগের কর্ম্ম বা বুদ্ধিশক্তির অভাব নহে; তাহার কারণ ধনীরা শ্রমজীবিগণকে তাহাদিগের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে কৃত্রিম অবৈধ উপায়ে শ্রমজীবিগণকে দরিদ্র করা হইয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা ধনীদিগকে বিচার করিবার ভার নিজেদের হাতেই লইয়াছেন। ধনীরা বিলাস-উপভোগে উন্মত্ত, তাহাদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যদি তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ট্যাক্স করিয়া ধীরে ধীরে দেশের ধনসম্পত্তি ধনীদিগের নিকট হইতে দরিদ্রের আয়ত্তে আনিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত সম্পত্তি এবং মূলধন সমাজের হস্তগত না হয়, ততদিন তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে। শেষে সমাজ দেশের সমগ্র ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রত্যেকের

অভাবানুযায়ী ধন বিতরণ করিবে। বিলাসিতা চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। অথচ কর্ম্মশক্তিও হ্রাস পাইবে না। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ তখন আরও ঘনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রত্যেকে আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া সমাজের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। অলস হইয়া সমাজের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য লইতে সকলেই লজ্জিত বোধ করিবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের ইহাই আশা। মানুষ তখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে,—সমাজে প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য থাকিবে না, ভ্রাতৃপ্রেমে এবং সহকারিতা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া দিবে।

সমাজ-তন্ত্রবাদের অলীকতা

সামাজিক জীবনে ঘোর অশান্তির ফলে এই উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি। সমাজে অনৈক্য না থাকিলে এক বৈচিত্র্যহীন সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিবে, ইহাতে সমাজ অচিরেই প্রাণহীন এবং অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে। ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। অধিকন্তু মনুষ্য যতদিন দেবত্বপ্রাপ্ত না হয় ততদিন সমাজ-তন্ত্রবাদীদের আশা কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য যাহাতে সমাজের মঙ্গলবিধানে প্রযুক্ত হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

হিন্দুসমাজে ঐক্য ও অনৈক্যের সমন্বয়

আমাদের পুরাতন সমাজ বিভিন্ন আশ্রম এবং অধিকারভেদ

সৃষ্টি করিয়া একদিকে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং অপর দিকে গোষ্ঠীর প্রভাবকে প্রবল রাখিয়াছিল। ইহার ফলে সমাজ ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া উহার সহিত গোষ্ঠী-জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিল। একদিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অপর-দিকে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা-বিধান, হিন্দুসমাজের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাজের এ আদর্শ এখন লুপ্তপ্রায়। মুসলমান-বিজয়ের পর হিন্দুসমাজের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে হিন্দুসমাজের আদর্শগুলি পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। এই কারণেই হিন্দুর জাতি, কুল এবং ধর্ম্ম ক্রমশঃ ব্যক্তিগত হইতেছে, সমাজে গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাব লোপ পাইতেছে। বিশাল সামাজিকত্বের আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু এখন বাহ্য আচার-ব্যবহার এবং কার্য্যকলাপের বিশিষ্টতা সৃষ্টি করিয়া সমতাস্থাপন এবং গোষ্ঠীর প্রভাব রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহাতে পদে পদে হিন্দু অকৃতকার্য্য হইতেছে। আধুনিক কালে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম দিনে দিনে যতই কঠোর হইতেছে, ততই আচার-মূলক সামাজিক ব্যবস্থা হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার এখন হিন্দুজাতির মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে পারিতেছে না, আধুনিক হিন্দু সমাজবন্ধনকে অগ্রাহ্য করিতেছে, সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এখন পুষ্টি লাভ করিতেছে। হিন্দুসমাজের ক্রম-বিকাশ এখন ঠিক বিপরীত দিকে হইতেছে। হিন্দুসমাজ অহিন্দু হইতে চলিয়াছে।

হিন্দুসমাজের বাণী

কিন্তু এককালে হিন্দুসমাজই সাম্য ও বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের বৈষয়িক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধর্ম্ম-জীবনে শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। হিন্দুসমাজ প্রতি-যোগিতা রাখিয়া এ স্বৈরাচার্য্য ও অসংযমের শাস্তি বিধান করিয়া-ছিল, অধিকার-ভেদ মানিয়াও স্বার্থপরতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ অনৈক্যকে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রেম এবং ভাবুকতার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব, সমতা ও প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। আধুনিক ধন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিলাসবিষজর্জ্জরিত পাশ্চাত্য জগতে ঐক্যমূলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের ঘোর অশান্তি দূর করিবেন বলিয়া যে আশার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পাগলের পাগলামি। অনৈক্যকে না মানিয়া সমাজ গঠন করা অসম্ভব। অনৈক মানিতেই হইবে, অথচ অনৈক্য যাহাতে অত্যাচার ও নির্য্যাতনে পরিণত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এই কথা পাশ্চাত্যজগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজ এই কথাই পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করিবে। এ কথা প্রচারিত না হইলে পাশ্চাত্য জগতের দুঃখ এবং অশান্তির অবসান হইবে না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই,—বিলাস অর্চ্চনার নিস্ফল আয়োজনের ভারে প্রপীড়িত

দরিদ্রের ক্রন্দন

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃস্থল হইতে দীনতার করুণ ক্রন্দন বিশ্বদেবতার চরণে পৌঁছিয়াছে। তাই বিশ্ব-জগতের সর্ব্বত্র নূতন জীবনের প্রয়োজন চলিতেছে। হিন্দুসমাজ ঐক্য ও অনৈক্য, সাম্য ও বৈষম্য, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন করিয়া এক নূতন জীবনের অমৃত মন্দাকিনী-ধারা ধাতার কমণ্ডলু হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিবে। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সেই ভবিষ্যৎ সার্থকতার আশায় রহিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

——ঃ০ঃ——

কুটীর-শিল্প বনাম কলকারখানা

স্বাধীন জীবিকা জাতীয় উন্নতির সহায়

কর্ম্ম করিতে করিতেই মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অধিকন্তু ঐ কর্ম্মের জন্য যদি সে পরনির্ভর না হয়, কার্য্যে যদি তাহার স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে তাহার শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার জীবন ধারণের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বিনা পরিশ্রমে এ জগতে জীবিকার্জ্জন অসম্ভব। জীবিকার্জ্জনের উপায়কে আমরা বৃত্তি বলিয়া থাকি। যাহাদের পরাধীন বৃত্তি, তাহারা কর্ম্মক্ষম হইতে শিখে না, কারণ কার্য্যের ফল হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া তাহাদের অধিক পরিশ্রম করিবার উৎসাহ থাকে না। বাস্তবিক যে বৃত্তি যত অধিক পরিমাণে স্বাধীন, তাহাতে কর্ম্মশক্তির তত অধিক উদ্রেক হয় বলিয়াই অর্থাগমের তত সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

ইহা আমাদের অতি-প্রচলিত কথা। যাহাদের ভিক্ষাবৃত্তি, তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাব পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কাজেই লক্ষ্মী তাহাদিগকে কৃপা করে না। ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা রাজসেবা অথবা চাকুরীতে মানুষ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। ভিক্ষাবৃত্তিতে সে সম্পূর্ণ পরনির্ভর, কিন্তু চাকুরীজীবি হইলে সে তাহার পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফললাভ না করিলেও কিছু ফল পাইয়া থাকে। কৃষিকার্য্য, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই মনুষ্যের কর্ম্মশক্তির আমরা চরম বিকাশ দেখিতে পাই। যে এই সকল ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিবে, সে সেই পরিমাণ লাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হয় না। উপরন্তু স্বাবলম্বন হেতু কতকগুলি নৈতিক গুণও বিশেষ পরিস্ফুট হয়। চিন্তার স্বাধীনতা সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশেষ কল্যাণপ্রদ। স্বাধীন জীবিকা চিন্তার স্বাধীনতার পরিপোষক। বাস্তবিক স্বাধীন অন্নসংস্থান একদিকে যেরূপ কর্ম্মশক্তি বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়, অপরদিকে মনুষ্যের চিন্তাস্রোতকে বিভিন্নমুখে প্রবাহিত করাইয়া উহাকে স্বচ্ছ এবং প্রবল করিয়া তুলে। কোন নির্দ্দিষ্ট খাতে যদি চিন্তাস্রোত ক্রমাগতই প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে উহা অচিরেই আবিল পঙ্কিল হইয়া উঠে। এইরূপে পরাধীন জীবিকা চিরকালই কর্ম্ম ও চিন্তাবিকাশের প্রধান অন্তরায়। জীবিকা-অর্জ্জনে যে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে, সেখানে নিত্য নূতন অর্থাগমের উপায় এবং অর্থোৎপাদন-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সে সমাজ অতি সহজেই

তাহার অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়। চিন্তাজগতেও সেখানে নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার হইয়া থাকে,—সমাজের সকল দিকেই উন্নতি হয়।

"স্বদেশী" আন্দোলন ও স্বাধীন-জীবিকা

আমরা চাকুরীজীবী; কিন্তু চাকুরীজীবী হইলেও আমাদের দেশে প্রধান অন্নসংস্থানের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। চারি দিকেই শিল্প এবং ব্যবসায়-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। দেশের নানা স্থানে বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদেশ-প্রেরণ-পরিষৎ স্থাপিত হইতেছে। রাজা মহারাজা জমিদারেরাও বিদেশে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন। বহু ছাত্র অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশের কারখানায় শিল্পবিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা করিতেছে। বহু ছাত্র ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, অনেকে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ব্যবসায়ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। ১৯০৫ সাল হইতে এই কয় বৎসরের মধ্যে যে কতগুলি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু দেশে যে বিপুল ব্যবসায়-আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহার হঠাৎ প্রতিরোধ দেখা গিয়াছে। অনেকগুলি ব্যবসায়ই "ফেল" করিয়াছে, ব্যবসায়-জগতে আবার অবসাদ দেখা গিয়াছে। বিদেশীয় পণ্যে আমাদের বাজার আবার ভরিয়া গিয়াছে। দেশে কয়েক বৎসর সুবাতাস বহিয়াছিল, এখন বাতাস বিপরীত দিকে

বহিতেছে। ব্যবসায় জগতে আমাদের এই আকস্মিক উত্থান এবং পতনের কারণ কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

"স্বদেশী"র অবনতির কারণ

আমাদের বৈষয়িক জীবনের এই কয় বৎসরের ইতিহাস স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা আমাদের দোষ দেখিতে পাইব। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিদেশের যে কোন কারখানায় যে কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিলেই—যে কোন ব্যক্তি এ দেশে অতি সহজেই কলকারখানা চালাইতে পারিবে। দেশে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, কোন্ ব্যবসায় অতি সহজেই বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও লাভজনক হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি নাই। দেশের প্রকৃত অভাবের দিকে মনোযোগ না দিয়া আমরা কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। উপরন্তু বিদেশে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অত্যধিক পরিমাণে ছিল। বিদেশের কারখানায় দুই এক বৎসর শিক্ষানবিশরূপে থাকিয়া যে কোন ব্যক্তি এখানে কারখানা স্থাপন করিয়া অতি সহজেই এখানকার বাজার হস্তগত করিবে, ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বিদেশ হইতে একজন যে কোন শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইবার জন্য আমরা তখনই বহু অর্থব্যয়ে বিরাট কলকারখানার আয়োজন করিয়া ফেলিলাম। আমরা

যদি তাহাকে কয়েক বৎসর দেশের বিভিন্নস্থানে শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্রে ভ্রমণ করিবার সুযোগ প্রদান করিতাম, বিভিন্ন বাজারের দালাল পাইকার এবং শ্রমজীবিগণের সহিত পরিচয় লাভের অবসর দিতাম, তাহা হইলে আমাদের অনেক অর্থব্যয় সার্থক হইত। দেশের কোন্ স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে যাতায়াতের সুবিধাহেতু দ্রব্যবিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে, দেশীয় শিল্পী শ্রমজীবীর শক্তি এবং কর্ম্মকুশলতা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে, দ্রব্য প্রস্তুত করণের উপাদানসামগ্রী অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করা যাইবে,—এ সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল না। কোন স্থানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে সে স্থানের সুবিধা অসুবিধাগুলি বিশদভাবে দেশে আলোচিত হয় নাই। এ জন্য কারখানা স্থাপন করিবার পর দ্রব্যোৎপাদন এবং দ্রব্যবিক্রয়ের অসুবিধা বোধ হওয়াতে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থের অযথা অপব্যয় হইয়াছে। তাহার পর আমাদের একটি দোষ হইয়াছে, আমরা অবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। আমাদের মূলধনের পরিমাণ অল্প, আমাদের শিল্পীদের বংশপরম্পরালব্ধ শিল্পনৈপুণ্য থাকিলেও আমরা তাহাদিগকে কারখানার কার্য্যে না লাগাইয়া অপটু শ্রমজীবিগণকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, অথচ আমরা আশা করি বিলাতের বড় বড় কারখানার মত অতি সুন্দর মনোরম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিব। দৃশ্যমনোহর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা অপেক্ষা সাধারণ ব্যবহৃত সুলভ দ্রব্য প্রস্তুত করা সহজ। লৌহ ইস্পাতের কারখানা স্থাপন না

করিয়া ছুরি, কাঁচী, কব্জা, পেরেক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কারখানা, বড় বড় কাঁচের কারখানা না করিয়া ভাঙ্গা কাঁচের জিনিষ হইতে বোতল চুড়ী প্রভৃতির কারখানা, কাগজের পরিবর্ত্তে কার্ড বোর্ড প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করিলে ফেল হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু আমরা আশার বশবর্ত্তী হইয়া সহজসাধ্য কাজ ছাড়িয়া কঠিন কাজে হাত দিয়াছি, সুতরাং আমাদের পরিণামে ঠকিতে হইয়াছে,—

'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিববামনঃ।'

অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক

আপাততঃ বড় বড় কারখানা খুলিবার জন্য প্রভূত অর্থ এবং শ্রমজীবীশক্তি ব্যয় না করিয়া যাহাতে অল্প মূলধনে স্বাধীন জীবিকার উপায় হয় আমাদের তাহা দেখা এখন আবশ্যক।

(ক) বাণিজ্য

আমাদের আধুনিক অবস্থায় দালাল বণিক প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করা শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য এবং আশু ফলপ্রসূ হইবে। বাংলাদেশে প্রায় ৩০ কোটী টাকার পাট ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, ইহাতে বাঙালী যে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহা অতীব দুঃখের বিষয়। পাট ক্রয় বিক্রয় করিয়া বিদেশী দালাল বণিকগণ বৎসর বৎসর ৩০ লক্ষেরও অধিক টাকা লাভ

করিয়া থাকে। বিদেশী বণিকগণ আমাদের দেশে আসিয়া আমাদেরই কৃষকগণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন শস্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধনী হইতেছে। আর আমরা এক মুঠা অন্নের জন্য চাকুরী খুঁজি-তেছি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত আমরা শিল্পে ও বাণিজ্যে খুব ব্রতী ছিলাম। ইংরেজ, ওলন্দাজ ও দিনেমারগণের সহিত ব্যবসা করিয়া আমরা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতাম। তাহার পর ইংরেজ যুগে, কলিকাতার হৌসসমূদায়ে মুৎসুদ্দীর কাজ আমাদের এক চেটিয়া ছিল। শীলেরা, দে'রা, গুহরা, চন্দ্ররা ইউরোপীয় সওদাগরগণের সাহায্যে লক্ষপতি ক্রোরপতি হইয়াছিলেন। শিল্পবাণিজ্যে বাঙালীর সে প্রতিভা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। বণিকবৃত্তিতে ব্যবসায় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও বেশ চলে, কোন বিশিষ্ট ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবহারিক বিদ্যার আবশ্যকতা নাই। অর্থব্যয় করিয়া আমেরিকা ও জর্ম্মাণীর শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন নাই। এ দেশেরই প্রধান প্রধান হাট বাজারে ভ্রমণ করিয়া ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। অধিক মূলধনেরও আবশ্যকতা নাই। অল্প টাকায় আরম্ভ করিয়া ব্যবসায় খুব বাড়িয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বড় বড় কারখানা খুলিয়া দ্রব্যোৎপাদন করা অপেক্ষা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আমাদের দেশে আধুনিক কালে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে।

(খ) এবং ক্ষুদ্র কারখানার উপযোগিতা

কেবল বাণিজ্য নহে, বড় বড় কারখানায় দ্রব্যোৎপাদন

অপেক্ষা আধুনিককালে ছোট ব্যবসায়ই আমাদের অধিক উপযোগী এবং লাভজনক। কলিকাতার বড় বড় পাটের কল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশ কারখানাই ক্ষুদ্র আয়োজনে পরিচালিত হয় এবং অনেকগুলি বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী কর্ত্তৃক পরিচালিত ও লাভজনক হইয়াছে। ক্ষুদ্র কারখানাগুলির মধ্যে ৩৬৭-টি ভারতবাসী, ১৭৯-টি ইংরেজ, ৪-টি ইংরেজ ও ভারতবাসী, এবং ৭-টি চীনা কর্ত্তৃক পরিচালিত। ব্যবসায়ের অনেক বিভাগেই ভারতবাসীর কেবল প্রাধান্য নহে, প্রভুত্বও রহিয়াছে। দড়ি, কাঠ, টাইপ, পিতল, তেল, সাবান, ময়দা, চিনি, ছাতা, সুরকী প্রভৃতির কারখানার প্রায় সবগুলিই ভারতবাসীরই হস্তগত। ছাপাখানা, কেমিকেলওয়ার্কস, পাটপ্রেস, প্রভৃতি আমাদেরই একচেটিয়া। বাস্তবিক আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ধীরে ধীরে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছে, তাহা আমরা এতদিন চিন্তা করি নাই। এই বৎসরের কলিকাতার লোক-গণনায় এ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় মোট ১০৫-টি যৌথ কারবার এবং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহাদের মধ্যে কেবল ৭-টি কোম্পানীর মধ্যে ভারতবাসী ডিরেক্টর আছে। বাকী সবগুলিই সাহেব ডিরেক্টর। সুতরাং যৌথ কারবার দেশে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই, ইহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত কারবারের মধ্যে ৩৬০ কারখানা ভারতবাসী এবং ৮৫ ইংরেজেরা পরিচালনা করিতেছে।

দেশে শিল্প ব্যবসায়ের আন্দোলনের প্রারম্ভে ব্যক্তিগত ভাবে

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক এবং অধিক ফলপ্রদ। প্রথমতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রে আপাততঃ অল্প পরিমাণে মূলধন পাওয়া যাইবে, সুতরাং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিতে যৌথভাবে মূলধন-সংগ্রহের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীর দ্বারা ব্যবসায় চালিত হইলে দায়িত্ব-বোধ লঘু হয়, একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ে যেরূপ শৃঙ্খলা এবং সুবন্দোবস্ত দেখা যায়, কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ে আমাদের দেশে সেরূপ দেখা যায় নাই। সুতরাং যতদিন আমাদের ব্যবসায়িগণ আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিক্ষা না করিবে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়-প্রচলনই শ্রেয়স্কর। কলিকাতার ক্ষুদ্র কারখানাগুলি ব্যক্তিগত দায়িত্ব-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐগুলি বিশেষ লাভজনক হইয়াছে। ব্যবসায়ের আনুমানিক ব্যয় অধিক হয় না, বন্দোবস্তও সুচারু হওয়াতে লাভ হইয়া থাকে। এরূপে মধ্যবিত্ত লোকেরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আপনাদের অল্প মূলধন নিয়োজিত করিয়া ধনী হয়।

মধ্যবিত্তদিগের ধনবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ। ধনীদের বিলাসিতা সৌখীনতা আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তদিগের স্বোপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় হয় না। উপরন্তু মধ্যবিত্তদিগের ভাবুকতা আছে, তাহারা সমগ্র সমাজের অভাব আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে অধিক সক্ষম, সুতরাং সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য তাহারা অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে পারে। বাস্তবিক আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীন ব্যবসায়ক্ষেত্রে আরও অধিক পরিমাণে অর্থ

নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র সমাজে চিন্তা এবং কর্ম্মের স্বাধীনতা দেখা যাইবে ; এবং দেশে এমন একটা চিন্তার আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইবে যাহা আমরা এখনও ভাবিতে পারি না। মধ্যবিত্তেরাই চিরকাল সমাজের নেতা। জীবিকার্জ্জনে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে সমাজের চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তির পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কলিকাতার ব্যবসায়জগতে মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাহারা স্বাধীন ভাবে ক্ষুদ্র কারখানাগুলি পরিচালনা করিতেছে, তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণ	৬১
কায়স্থ	৩৫
তিলী	২৮
সদ্গোপ	২৮
কলু	২০
বৈদ্য	১৬
চাষীকৈবর্ত্ত	১২
সুবর্ণবণিক	১০

ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু মহাশয় বাঙ্গালীর দ্বারা চালিত বঙ্গদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একটি মোটামুটি তালিকা সম্প্রতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহা অবলম্বন করিয়া এই তালিকা দেওয়া হইল।

Bhowanipur Banking Corporation Ltd.
Rajsahi Banking Corporation
Co-operative Hindusthan Bank Ltd.
Bengal National Bank Ltd.
Indian Industrial Bank Ltd,
Bank of Dacca, Ltd.

রাসায়নিক দ্রব্য (CHEMICAL)

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ltd.
Calcutta Chemical Company, Ltd.
Datta Chemical Works, Ltd.

ঔষধাদি (PHARMACEUTICALS)

Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Ltd,
Pal's Bengal Sattie Food,
Mathur Babu's Sakti Oushadhalaya, Dacca
Dacca Ayurvedic Works.
Laugen & Co.
C. K. Sen & Co.
Butta Kristo Paul & Co.
Bose's Laboratory Ltd.

Bengal Immuity Co., Ltd.

Lister Antiseptics & Dressings Ltd.

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি (SCIENTIFIC INSTRUMENTS)

Calcutta Tools and Implements Manufacturing & Co.

Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd.

Bose's Laboratory Ltd.

Nag's Scentific Instruments Works (Kasimbazer)

চীনমাটীর দ্রব্য (POTTERY)

Bengal Potteries Ltd. (Calcutta Pottery

এনামেল

Bengal Enamel Works Ltd.

রবার

Diex Aye Rubber Factory Ltd.

কাগজ (PAPER)

Assam Paper Mills, Ltd.

Indian Paper & Paste Board Co.

কলম, পেন্সিল ইত্যাদি (PEN, PENCIL & STATIONERY)

F. N. Gupta & Co.

Small Industries Development Co. Ltd.

কালি (INKS)

Bengal Miscellany Ltd. (Writing Inks)
P. M. Bagchi & Co. do.
Dass Gupta & Sons (Printing Inks)

মোরব্বা ও চাটনি (PRESERVES & CONDIMENTS)

Pioneer Condiment Co. Ltd.
Bengal Canning & Condiments Works, Ltd.
Sreekissen Dutt & Co.
A. K. Dodd's Condiment Factory.

কাচ (GLASS)

Calcutta Glass & Silicate Works, Ltd.
Bengal Galss Works
Car's Glass Works

সাবান (SOAP)

Calcutta Soap Works, Ltd.
National Soap Factory.
British India Soap Works.
Oriental Soap Factory Ltd.
Science Students' Union.
Indian Soap Factory.

দেশলাই (MATCHES)

Govinda Match Factory (Naraingunj)

Vikrampur Match Factory

Comilla Match Factory

Kalighat Match Factory

Outsahi Match Factory

বিস্কুট (BISCUITS)

K. C. Bose & Co.

P. C. Set' Biscuit Factory

কল (MACHINERY)

P. N. Dutt & Co.

Bando & Co.

Ghatak Iron Works (Behala)

Belting Works, Ltd.

Bengal Bridge & Bolts Co. Ltd.

চিনি (SUGAR)

Kusthea Sugar Cane Mills Ltd.

বস্ত্রের কল (COTTON MILL)

Bengal Luxmi Mills Ltd.

Mohini Mills Ltd. (Kusthea)

চামড়া তৈয়ারি (TANNING)

National Tannery (Calcutta)

টিনের জিনিস (TIN GOODS)

Calcutta Colour Printing & Hollowwares Ltd.

সেলাই শিক্ষা (TAILORING)

Industrial School, Bengal Social Service League.

ষ্টীল ট্রাঙ্ক

Arya Factory

Swaraj Factory

Bharat Factory Ltd.

Jangli Shah (Jiagunj)

Bejoy Factory

বোতাম

Horn and Button Manufacturing Co.

চিরুণী

Jessore Comb and Celluloid Factory.

অন্য প্রদেশের ভারতবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত।

বস্ত্রের কল (COTTON MILL)

Keshoram Cotton Mills Ltd.

এলুমিনিয়ম্ ধাতুর দ্রব্য (ALLUMINIUM GOODS)

Jiwanlal & Co. (Calcutta)

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিবধ শিল্পবিজ্ঞান, ব্যবসা ও কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় :—

INSTITUTIONS FOR TECHNICAL EDUCATION.

Sibpur Engineering College.

University College of Science (Technological Chemistry Dept.)
Indian Association for the Cultivation of Science (Commercial Analysis class)
Dacca Agricultural School.
E. I. Railway Workshop. Lillooah.
E. B. S. Ry. Workshop, Kanchrapara.
Serampore Weaving Institute.
Maharaja Cossimbazar Polytechnic (Calcutta)
Midnapore Weaving School.
Bankura Weaving School.
Technical School, National Council of Education.
Government Commercial Institute, Calcutta
Commercial Department of Krishnanath College, Berhampur.
Agricultural School, Chinsura.
Sericultural School, Berhampur, Malda, Rajsahi.

মাড়োয়ারীদের মধ্যে ১৯-টি এবং শেঠদিগের মধ্যে ১২-টি কারখানার স্বত্বাধিকারী বর্ত্তমান। কলিকাতায় যেভাবে মধ্যবিত্ত-

শ্রেণী কারখানা প্রভৃতির স্বত্বাধিকারী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, সেরূপ দেশের সর্ব্বত্রই বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় শিল্প-পদ্ধতি—কুটীর-শিল্প ও ক্ষুদ্র কারখানা

আমাদের দেশে এখন সাধারণতঃ দুই প্রকার শিল্পপদ্ধতি দেখিতে পাই—(ক) কুটীর-শিল্প এবং (খ) কারখানা। কুটীর-শিল্পে শিল্পী সাধারণতঃ আপনার পরিবারবর্গের সাহায্যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। যেখানে শিল্পী কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মজুরী দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লয়, আমরা তাহাকে কারখানা বলিয়া থাকি। কুটীর-শিল্পকে আমরা পারিবারিক শিল্প বলিতে পারি, কিন্তু কারখানায় শিল্পীরা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কুটীর-শিল্পে শিল্পী আপনার মূলধন যোগাইয়া থাকে। কারখানায় ওস্তাদ অথবা মিস্ত্রী শিল্পের সমস্ত মূলধন দেয়, শিল্পীরা তাহার মজুর মাত্র। আমাদের দেশে প্রত্যেক সহরেই আমরা কারখানা দেখিতে পাই। বিশেষতঃ যে সমস্ত শিল্পে মূলধন অধিক পরিমাণে আবশ্যক, যেখানে বহুমূল্য যন্ত্রপাতী ক্রয় করিতে হয়, অথবা দ্রব্যের কাটতি খুব কম হয়, বড়লোকের পছন্দের উপরই যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কারখানাই দৃষ্টিগোচর হয়। শিল্পীদের মধ্যে একজন ধনী হইয়া কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে এবং অপেক্ষা-

কৃত দরিদ্র শিল্পিগণকে আপনার কারখানায় নিযুক্ত করে। সোনা, রূপা, কাঁসা, উৎকৃষ্ট কাঠ এবং হাতীর দাঁতের কাজ সহরের কারখানাতেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার কাঁসারীপাড়া, চিৎপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানার কাজ বিখ্যাত।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিচালনা

আধুনিক কারখানার ওস্তাদ অথবা বড় মিস্ত্রী দ্রব্যপ্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতী ক্রয় করিয়া থাকে এবং দ্রব্যসমূহের বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করে। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি শিল্প-শিক্ষার আয়োজন হয়, তাহা হইলে কারখানা-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। বাজারে কি প্রকার দ্রব্যের কাটতি হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিক জ্ঞান থাকে, সুতরাং দ্রব্যবিক্রয়ের অধিক সুবিধা হইবে, নূতন যন্ত্র এবং প্রক্রিয়া প্রভৃতিও অতি সহজেই প্রচলিত হইবে। বাস্তবিক বিভিন্ন সহরে যেখানে দ্রব্যের অধিক কাটতি আছে, সেখানকার কারখানাগুলি যদি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় যদি বিভিন্ন শিল্পের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া তাহাদের মূলধন নিযুক্ত করে এবং শিল্পিগণের বিদ্যাচাতুরী নিয়োগ করে, তাহা হইলে কেবল শিল্পসমূহের যে উন্নতি হয় তাহা নহে, তাহাদের নিজেদেরও স্বাধীন অন্নসংস্থানেরও উপায় হইয়া থাকে।

কারখানা-শিল্পগুলি মধ্যবিত্তদের হস্তগত হইলে যেরূপ সমাজের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা, কুটীর-শিল্পগুলিতেও তাহাদের প্রভাব বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

কলের সহিত হস্ত-শিল্পের প্রতিযোগিতা— ব্যবসায়-জগতের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শিল্পের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী

আমাদের দেশে পল্লীগ্রামসমূহে কুটীর-শিল্পগুলি যে একবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। দ্রব্যোৎপাদনে কলের শক্তি অধিক স্থলে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে শিল্পীকে কলকারখানার নিকট হার মানিতে হইবে তাহা নহে। যে ক্ষেত্রে একই প্রকার দ্রব্য অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে, সেখানে মনুষ্য-শক্তি তড়িৎ অথবা ষ্টীম এঞ্জিনের শক্তির নিকট হার মানিবে; কিন্তু যেখানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, সেখানে শিল্পীর কর্ম্মকুশলতাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। দ্রব্য ক্রয়-ব্যাপারে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি প্রকটিত হয়, সে ক্ষেত্রে দ্রব্যোৎপাদনে শিল্পীর বিদ্যা ও চাতুরী কলের শক্তি অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইবে। বাস্তবিক আমাদের দেশে যতদিন রুচির বৈচিত্র্য আছে, ততদিন শিল্পীর

ব্যবসা কখনও মন্দা হইবে না। উপরন্তু পল্লীগ্রামে মূলধন খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় এবং কাটতি অধিক হয় না; সুতরাং ক্ষুদ্র ব্যবসাই সেখানে লাভজনক হয়। অল্প মূলধন বৎসরে তিন চারিবার ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসিলে গড়ে লাভ অধিক হয়। বহুল পরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, যে পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেই পরিমাণই বাজারে কাটে।

পাশ্চাত্য ব্যবসায়-জগৎ হইতে ইহার উদাহরণ

হস্ত ও পারিবারিক-শিল্পের নানা সুবিধাহেতু ইউরোপেও কুটীর-শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় এখনও বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস, ইউরোপ বড় বড় কারখানা ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াই বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বড় বড় কারখানার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্ষম হইয়াও এখনও যে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা অনেকের ধারণা নাই। জর্ম্মাণীতে ১৪'৩ ক্রোর শ্রমজীবির মধ্যে ৫'৪ ক্রোর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। ইংলণ্ডে বড় বড় কারখানা, যেখানে ১০০০-এর অধিক লোক কাজ করে, সেখানকার শ্রমজীবিদের সংখ্যা, ছোট ব্যবসায়ে যে সকল লোক

কাজ করে, তাহাদের সংখ্যার সমান। ইটালী, বেলজিয়াম, সুইট্জারলণ্ড প্রভৃতি দেশে কুটীর-শিল্প এখনও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং বড় কারখানা বা ফ্যাক্টরীর সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদ্র ব্যবসায় অথবা কুটীর-শিল্প যে সমূলে বিনষ্ট হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবন হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য-জগতে একদিকে কল কারখানার, কুটীর-শিল্পের এই সকল সুবিধা হেতু দেশের তাঁত এখনও মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে। তাঁতীরা নিরক্ষর, বাহিরের জগতের তাহারা কোন খবরই রাখে না, সেই পুরাতন বংশপরম্পরালব্ধ যন্ত্রপাতী ও প্রণালী ছাড়া তাহারা কিছুই জানে না। মোগল আমলের পর হইতে এখন পর্য্যন্ত তাহাদের কেবল-মাত্র এই উন্নতি হইয়াছে যে, তাহারা চরকায় কাটা অসমান ও অমজবুত সূতার পরিবর্ত্তে মিলের তৈয়ারী সমান সূতা লইয়া কাজ করিতে শিখিয়াছে। কাপড়ের কলগুলা ভাল সূতা পায়, সস্তায় অনেক সূতা ক্রয় করে, বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সহজে দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং সুবিধা মত, ব্যাপারীদিগের কবলে না গিয়া, কাপড় বিক্রয়ও করিতে পারে। এত সুবিধা সত্ত্বেও মিল তাঁতকে হটাইতে পারে নাই। এখন পর্য্যন্ত দেশের এক চতুর্থাংশ কাপড় তাঁতের তৈয়ারী। অবনতি দূরে থাক, ১৯০০ সাল হইতে কুটীর-শিল্পের উন্নতিই বরং লক্ষিত হইতেছে। ভারতীয় শিল্প-কমিসন কর্ত্তৃক প্রস্তুত নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তাঁতের তৈয়ারী কাপড়ের পরিমাণ

প্রত্যেক বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে, পাঁচ বৎসরের তাঁতে নিয়োজিত কাপড়ের পরিমাণের গড় নিম্নে দেওয়া গেল।

১৮৯৫-১৯০০	১৯১০-১৯১৫
(মিলিয়ন পাউণ্ড)	
২১৮	২৮৭

ইহার অর্থ এই যে ১২৯'১ কোটী গজ কাপড়, অথবা সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত কাপড়ের এক চতুর্থাংশ বৎসর বৎসর কুটীর-শিল্পে তৈয়ারী হইতেছে। কাপড় ছাড়া তাঁতে অতি সুন্দর সুন্দর বাণিজ্যোপযোগী রেশম ও পশমের দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হয়। 'ফ্লাই-সাট্‌ল লুম' আজকাল তাঁতীরা ব্যবহার করিতে শিখিতেছে—উহা তৈয়ারী ও মেরামতও গ্রামে অসম্ভব নহে। আজকালকার চরকায় তৈয়ারী সূতা অসমান ও কম মজবুত হওয়ায় তাঁতে দেশী মিলের কাটা-সূতায় টানা করা হয় ও চরকার সূতায় পড়েন দেওয়া হয়। গ্রামে গ্রামে যখন বিজ্ঞান গিয়া তাঁতীর ঘরে বিদ্যুৎ-শক্তি পৌঁছাইয়া দিবে, তখন হস্তচালিত বিলাতী অথবা ভারী 'অটমেটিক লুম' সব ব্যবহৃত হইতে পারিবে। বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে অথবা তেল বা বাষ্পের ছোট এঞ্জিনের সাহায্যে তখন জর্ম্মাণীর গ্রাম্য তাঁতীদের মত আমাদের তাঁতীদের পরিশ্রম লাঘব হইবে এবং উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাইবে। সমবায় ও বিজ্ঞানের মিলন হইলে মালিক যেমন কারখানায় বাষ্প অথবা তড়িৎ-শক্তি ব্যবহার করে, তেমনি সহজে কুটীর-শিল্পীও ঘরে বসিয়া ঐ সকল শক্তি ব্যবহার করিতে পারিবে—কৃষির অবসরে চরকা কাটা,

কাপড় বুনা, গৃহস্থালী করা, সবই চলিতে থাকিবে সেই পুরাতন শান্তি ও সামাজিকতা, এবং নূতন আসিবে একটা দৈনিক পরিশ্রমের সার্থকতা ও ফলপ্রদ কর্ম্মকুশলতা। যেরূপ বিরাট আয়োজন, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবসায়ের সেরূপ বিপুল বিস্তৃতি।

কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন-প্রণালী—
(ক) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতী ও প্রক্রিয়া-অবলম্বন

আধুনিক কালে কুটীর-শিল্পসমূহ যে কারখানার প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইবে, পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু নানা উপায়ে কুটীর-শিল্পগুলির উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা সুকঠিন। পাশ্চাত্য জগৎ অনেক উপায়ে কুটীর-শিল্পগুলির উন্নতি সাধন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নূতন নূতন যন্ত্রপাতী ও প্রক্রিয়ার প্রচলন প্রভৃতি কারণে শিল্পগুলি নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। জর্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক সোম্বার্ট বলিয়াছেন যে, ১৯০৭ সালের লোকগণনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জর্ম্মাণীতে পুরাতন গৃহ-শিল্পসমূহের মধ্যে যেগুলি নূতন বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবম্বলন করিতে

পারিতেছে না, সেগুলির ক্রমাবনতি হইতেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনেক গৃহ-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ব্যতীত আর এক উপায়ে পাশ্চাত্য জগতের গৃহ-শিল্পগুলি নবজীবন লাভ করিয়াছে, —তাহার নাম সমবায়।

(খ) শিল্পে সমবায়-পদ্ধতি-প্রচলন

রাইফেজেন কৃষিকার্য্যে সমবায় প্রচলন করিয়া পাশ্চাত্য কৃষক-সমাজে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। হারস্থলৃজ ডেলিট্‌জ শিল্পী এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে যৌথকারবার প্রচলন করিয়া শিল্পীদের মধ্যে সেইরূপ আর একটি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। শিল্পীদের মধ্যে সমবায়ের উদ্দেশ্য মোটামুটি এই,—শিল্পীরা মূলধন অভাবে পাইকার অথবা ধনীর নিকট দ্রব্য-প্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী লইতে বাধ্য হয়। অবশেষে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাইকার অথবা ধনীকে উহা প্রদান করে, এবং তাহাদের নিকট মজুরী পাইয়া থাকে। অনেক সময়ে ধনী ও পাইকার শিল্পীকে অত্যল্প মজুরী দিয়া লভ্যের অধিকাংশই আত্মসাৎ করে। শিল্পীদের মূলধন নাই বলিয়াই তাহাদের দারিদ্র্যের সীমা থাকে না। এ স্থলে যদি কয়েকজন শিল্পী সমবেত হইয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং ঐ

মূলধনে উপকরণ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং অবশেষে নিজেরাই দ্রব্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা হইলে দ্রব্যোৎপাদনের ন্যায্য লাভ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে পারে না। ইহাকেই শিল্পে সমবায়-পদ্ধতি বলা হয়। শিল্পে সমবায় এদেশে নূতন নহে। আমাদের সমাজে অনেক স্থলেই সমবেতভাবে শিল্প-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কাশীর বিখ্যাত 'বারাণসী সাড়ী' প্রভৃতি সমবেত প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। তন্তুবায়-গণ সম্মিলিত হইয়া রেশম ইত্যাদি ক্রয় করে এবং বস্ত্র বয়ন করিয়া অবশেষে তাহাদিগেরই নিযুক্ত পাইকার দ্বারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। কাশীর মদনপুরা পল্লীতে যাইয়া অনেকে ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পশ্চিম অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির মধ্যে অনেক সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেগুলিরও বিশেষ উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে।

শিল্প-প্রচারকের আবশ্যকতা—তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী

পল্লীগ্রামের অসংখ্য শিল্পী এবং শ্রমজীবিগণকে যদি কঠোর দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই এই সমবায়-পদ্ধতির প্রচলন আবশ্যক। সমবায়-পদ্ধতি যাহাতে দেশময় প্রচলিত হয় তাহার জন্য প্রচার আবশ্যক। মধ্যবিত্তদিগকেই এই প্রচার-কার্য্য করিতে হইবে। উপরন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর পক্ষে এ

কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের সহায় হইবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা-প্রচারক, স্বাস্থ্য-প্রচারক দেখা দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের দুঃখ-দৈন্য-ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শিক্ষা-প্রচারক এবং স্বাস্থ্য-প্রচারের মত পরহিত-ব্রত শিল্প ও ব্যবসায়-প্রচারকও এখন দেশে আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যেখানে শিল্পীরা তাহাদের বিরল কুটীরে বসিয়া সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, সেখানে গিয়া তাহাদিগের নিকট আশার কথা প্রচার করিতে হইবে। জগতের বিভিন্ন স্থানে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেখানকার শিল্পীরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতি-বাহিত করিতে পারিতেছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে; জর্ম্মাণী, ইতালী, হল্যাণ্ড এবং জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্প-জগতের বিচিত্র খবর আমাদের শিল্পীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। আমাদের শিল্পীদের জানাইতে হইবে যে, তাহাদেরই মত কুটীরে বসিয়া এই সমস্ত দেশের শিল্পীরা নানা-বিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে এবং নূতন নূতন প্রক্রিয়া দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র ব্যবহার এবং প্রক্রিয়া-প্রচলন যাহাতে সহজসাধ্য হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঋণ-ভারে জর্জ্জরিত শিল্পীদের নিকট সমবায়-পদ্ধতির উপকারিতা বুঝাইয়া তাহাদের ভগ্নহৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার করিতে হইবে। সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া জর্ম্মাণী,

বেলজিয়াম্, ইতালী, প্রভৃতি দেশের শিল্পী তাহাদের অবস্থার কি বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া যৌথযন্ত্র-ক্রয়-সমিতি এবং দ্রব্য-ভাণ্ডারের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় শিল্পশিক্ষার এই বিপুল আন্দোলনের নেতা হইবেন। শিল্পপ্রচারকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নূতন নূতন স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় আবিষ্কার করিবেন। এই উপায়ে একই সঙ্গে শিল্পপ্রচার এবং স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবনতির কারণ—
আমাদের চিত্ত-সম্মোহন

দেশে শিল্পপ্রচার এবং স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উদ্যোগ হইবার পূর্ব্বে আমাদের বৈষয়িক জীবনে আত্মশক্তির অনুভূতি হওয়া আবশ্যক। আমাদের সমাজে সাহিত্য, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতির ভিতর দিয়া চিত্ত-সম্মোহন এবং পরানুকরণের কুফল মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমাদের চিত্ত-সম্মোহন সর্ব্বাধিক পরিমাণেই দেখা গিয়াছে। এ কারণে ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়া

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অনেকটা নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে ; এই চিত্ত-সম্মোহন যতদিন না সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি একবারেই অসম্ভব। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এখনও ধারণা আছে যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ,—ভারতবাসী শিল্প-বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া কৃষিজীবি হইবে ; শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা এ দেশে অসম্ভব ; কারণ তাঁহারা উদাহরণ দিয়া বলেন, লোহাকে গড়িয়া পিটিয়া কখনও কেহ সোনা করিতে পারিবে না। সুতরাং শিল্পব্যবসায়-প্রবর্ত্তনের জন্য সমস্ত চেষ্টা-উদ্যোগ যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ ; প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব হেতু যে আমাদের দেশে শিল্প-ব্যবসায় কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য ;—ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় না। ইতিহাস বলে যে, আমাদের শিল্পীদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য জগতে রোম এবং পূর্ব্ব জগতে চীন, জাপান এবং ভারতীয় সাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল। ভারতবর্ষ কেবল কৃষির জন্য যে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, তাহার শিল্পজাত সামগ্রী পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ প্রভূত অর্থ দিয়া ক্রয় করিত। এমন কি এক সময়ে রোম নগরীর বিপুল অর্থ ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হেতু নিঃশেষ হইয়া যাইবার আশঙ্কা হইয়াছিল বলিয়া প্লিনি প্রমুখ রোমীয় স্বদেশসেবকগণ ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন পাশ করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকল বিষয়েই ভারতবাসীরা উন্নতি লাভ করিয়াছিল

বলিয়াই ভারতবর্ষে তদানীন্তন কালে সভ্যজগতের সমস্ত অর্থ আসিয়া সঞ্চিত হইত। সুতরাং আমাদের দেশে শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা প্রকৃতির বিরুদ্ধ আয়োজন এবং আমাদিগকে চিরকালই বিদেশী পণ্যের দ্বারা নিত্য অভাব মোচন করিতে হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। এ কথা আমাদের চিত্ত-সম্মোহনের একটি উদাহরণ মাত্র।

আজকাল অনেকেই এ ধারণার ভুল বেশ বুঝিয়াছেন এবং দেশময় শিল্প-ব্যবসায়ের বিপুল আয়োজনে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এদেশের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, তাঁহারাও যে চিত্ত-সম্মোহনের ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাহা নহে। বিদেশের ফ্যাক্টরী কল-কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের কুটীর-শিল্পগুলিকে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া তাঁহারা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, এ দেশের কুটীর-শিল্পগুলি একেবারেই সেকেলে, আধুনিক বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুতরাং তাঁহারা বলেন, এগুলি রক্ষা করিতে গেলে জাতীয় শক্তির অপব্যয় হইবে। কুটীর-শিল্পগুলির বিনাশ একেবারে অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া তাঁহারা সকল প্রকার দ্রব্যোৎপাদনের জন্য কারখানা-প্রতিষ্ঠা আমাদের বৈষয়িক উন্নতির একমাত্র সোপান মনে করেন। পাশ্চাত্য-জগৎ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃথিবীর সমস্ত হাট-বাজার করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অতএব আমাদিগকেও কল-কারখানার বিপুল আয়োজন করিতে হইবে, নচেৎ আমাদিগের রক্ষা নাই—এই ধারণার মূল আমাদের পরানুকরণের প্রবৃত্তি।

অনুচীকির্ষা ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্প-পদ্ধতির লোপসাধন

বহু বৎসরের ধীর ক্রমবিকাশের ফলে পাশ্চাত্যজগতের বৈষয়িক জীবন বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়া আধুনিক কালে কল-কারখানা-গুলিকে দ্রব্যোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, আমরা মনে করিতেছি আমরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার দুই একটা বুলি শিখিয়াই উহার ভিতর দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবল শক্তির প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহারও ভাগ লইতে সমর্থ হইয়াছি। বড়লোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমরা তাহার মনুষ্যত্বটুকুও পাইলাম মনে করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি। জাতীয় শক্তি যে জাতীয় সাধনার ফল তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু তাহা নহে, আমাদের চিত্ত-সম্মোহন এতদূর হইয়াছে যে, পাশ্চাত্যজগতের সাধনা সফল হইয়াছে কি না তাহার দিকে আমাদের দৃকপাত নাই। পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি সেখানকার সমাজে যে চির-অশান্তি কলহ আনিয়া দিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। ধনীদিগের সহিত শ্রমজীবি-সমাজের সংঘর্ষ পাশ্চাত্য-জগতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে তাহা আমরা মোহান্ধ হইয়া দেখিতে পাই না। চিত্ত-সম্মোহনের ফলে আমরা বিদেশীয় অনুষ্ঠান-

গুলির গুণ ভিন্ন দোষ দেখি না, এবং স্বকীয় বৈষয়িক অনুষ্ঠান-গুলিকে অবজ্ঞা অবিচার করিতেছি। আমাদের পারিবারিক শিল্পগুলি আমাদের শিল্পীদের কিরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহায় হইয়াছে এবং গৃহকেই জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্র করিয়া দৈনন্দিন কর্ম্মকে কিরূপ সুন্দর ও শান্তিদায়ক করিয়া তুলিয়াছে তাহা না ভাবিয়া আমরা ইহাদের বিনাশসাধনের পথ মুক্ত করিয়া দিতেছি। আমাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শগুলি আমাদের শিল্প-কলাতে পরিস্ফুট হইয়া বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনে প্রেম ও ভাবুকতা আনিয়া দিয়াছে, ইহা অনুভব না করিয়া আমরা দৃশ্য-মনোহর বিদেশী পণ্যের লোভে দেশীয় শিল্পকলাকে বিসর্জ্জন দিতেছি। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার, জাতি ও গ্রাম্য-সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ব্যক্তি-জীবনের সহিত সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজে কিরূপ শান্তি সদ্ভাবের স্রোত প্রবাহিত করাইয়াছে, এবং সামাজিক জীবনে দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যেও একটা সহজ সরল ত্যাগের সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা জন্মের মত ভুলিতে বসিয়াছি। দেশীয় বিচিত্র বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি যতদিন নবজীবন লাভ করিয়া নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া বিকাশলাভ না করে, ততদিন আমাদের বৈষয়িক উন্নতি অসম্ভব। বৈষয়িক জীবনে আমরা যতদিন আত্মশক্তির মর্য্যাদা অনুভব না করিব ততদিনই আমরা আমাদের পারি-বারিক শিল্পকলা ব্যবসায় প্রভৃতি নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠন করিতে পারিব না।

জাতীয় শিল্পের আদর্শের ক্রমবিকাশ

অনুচীকির্ষা বলবতী থাকিলে আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইতে হয়। এ জন্য আমরা স্বকীয় বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে যে নূতনভাবে নবযুগের উপযোগী করিয়া পুনর্গঠিত হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সমাজের চিন্তা ও কর্ম্ম এ কারণে এ বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হয় নাই। এক্ষণে আমাদিগকে পরানুকরণের পরিবর্ত্তে আত্ম-শক্তির মর্য্যাদা প্রচার করিতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ কি এবং তাহার সার্থকতা কোথায়, সমগ্র সমাজের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সমাজকে ধীরে ধীরে অনুকরণের প্রবল-স্রোত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহা কি আমরা এখনও বুঝি নাই যে, পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি এ দেশে আনয়ন করিতে গেলে দেশের সামাজিক শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, আধ্যাত্মিকতা একে-বারেই লোপ পাইবার সম্ভাবনা আছে? আদর্শের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে এগুলিকে অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার পরিচয় মাত্র। আমরা কি এত দিনেও অনুভব করিতে পারি নাই যে, পরানুকরণ করিয়া কোন জাতি বড় হইতে পারে না, জাতীয় জীবন কখনই পরানুকরণ হইতে শক্তিলাভ করে না? ভগবান প্রত্যেক জাতিরই এক একটি ক্রমবিকাশের ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ঐ পথ বিপুল অধ্যবসায়ের

সহিত অনুকরণ করিতে পারিলে সে জাতি তাহার চরম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোঃ বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥

জাতীয় সাধনা একমুখী হইয়া একাগ্রতার সহিত রথচক্রাঙ্কিত নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। জগতের নিয়মই এই—প্রত্যেক জাতি আপনার সেই নির্দ্দিষ্ট পথে ক্রম-বিকাশ লাভ করিয়া বিশ্বের সভ্যতা-মন্দিরের এক একটি গুপ্ত দ্বার খুলিয়া দেয়। বিবিধ রত্নরাজি-মণ্ডিত বিশ্ববিধাতার বেদীতে উপনীত হইবার যে কেবল একটি মাত্র পথ আছে, তাহা নহে। এবং মণিময় বেদীর উপর বিশ্বসভ্যতার যে একই রূপ তাহাও নহে; বেদীর উপর বিশ্বদেবতা লক্ষ মূর্ত্তিতে,—লক্ষ অবতার, লক্ষ মহাবিদ্যার মূর্ত্তিতে দেখা দেন। যে যে-পথ দিয়া আসিবে, সে সাধনশেষে এক নূতন দ্বার খুলিবে, নূতন মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইবে —"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহম্।" ভগবানের ইহাই অমোঘ বাণী।

অতীতকালে আমাদের জাতীয় জীবনের নিকট বিশ্বদেবতা এক স্বতন্ত্র অপরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন, আমাদের সামগান-মুখরিত তপোবনে, শিল্প-ভাস্কর্য্য-কারুকার্য্যখচিত দেবমন্দির গুহা-গহ্বরে, ধর্ম্মরাজাধ্যুষিত বিচারমণ্ডপে, ধর্ম্মপ্রচারকবাহী সামুদ্রিক পোতের সে মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া জাতীয় আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। বিশ্বদেবতার সেই মূর্ত্তির প্রতি বিমুখ হইয়া তাঁহার

অন্য মূর্ত্তি চাহিলে তিনি আমাদিগকে কখনই কৃপাচক্ষে দেখিবেন না। ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অন্য মন্দিরে খুঁজিতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই বিফল হইব। তিনি ত তাঁহাকে পাইবার পথ আমাদিগকে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে সেই পথে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ হইয়া বিপুল প্রয়াস এবং কঠোর অভ্যাসের সহিত একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে; যতই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব, ততই আমাদের জাতীয় জীবনদেবতার সনাতনী মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এখনকার সমস্ত দ্বিধা-আশঙ্কা তখন দূর হইবে। এখন চাই শুধু কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর ভবিষ্যতের সার্থকতায় অটল বিশ্বাস।

পঞ্চম অধ্যায়

—:০:—

শিল্প-প্রণালী

শিল্পের আদর্শ

আধুনিক কালে ভারতবর্ষে অর্থোৎপাদন-প্রণালীর বিভিন্ন আদর্শ লইয়া একটা তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। শত শত যুগের ক্রমবিকাশের ফলে ভারতের সমাজ যে ভাবে যে পদ্ধতিতে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আজ পাশ্চাত্য জীবনযাপন ও অর্থোৎপাদন-পদ্ধতির সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত। এই উভয়ের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে একদিকে যেমন কতিপয় ধনী বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া বিলাস-সাগরে মগ্ন রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি সহস্র সহস্র দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট শ্রমজীবি অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য অপর দিকে বিলাসিতার নির্লজ্জ বিকাশ—এই বৈষম্য সেখানকার সমাজে একটা চির-অশান্তি ও কলহের সূচনা করিয়াছে।

নগরের বস্তি-সমস্যা

পাশ্চাত্য শিল্প-প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে পল্লীর অবনতি ও এক বিকৃত জনবহুল নাগরিক জীবনের পুষ্টিসাধন হইয়াছে, যেখানে দেশের শান্তি ও সামাজিকতা একবারে লুপ্ত প্রায়। শুধু আছে মালিক ও বণিকের অর্থলোভ ও লোভের অবিচার, হৃদয়হীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ;—শ্রমজীবিগণ সে অবিচার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছে।

বাস্তবিক পল্লীবর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যে দূষিত ও বিকারপ্রাপ্ত নগরীর বিষম সমস্যাসমূহ আমাদের জাতীয় জীবনকে মূঢ় ও ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে সে সমস্যাগুলি সেরূপ ভাবে এ দেশে এখনও আলোচিত হয় নাই। অথচ এ সকল সমস্যার আলোচনা ও সমাধান না হইলে জাতীয় জীবনের সম্যক ক্রমবিকাশ ও পরিসর বৃদ্ধির পথ আমরা খুঁজিয়া পাই না। নষ্টপ্রায় পল্লীসমাজের আর একটি দিক, পাশ্চাত্য অর্থোৎপাদন পদ্ধতির আর একটি অভিব্যক্তি হইতেছে অতিরিক্ত জনভারক্লিষ্ট পঙ্কিল নাগরিক জীবন। যে ব্যবসায়িক কারণের সমবায়ে আমাদের কৃষির অবনতি, আমাদের গৃহ-শিল্পের বিনাশ, আমাদের পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্য ও জনশূন্যতা সেই সকল কারণই আমাদের সমাজ-জীবনে এক শোষক ও কদাচারী নগরের সৃষ্টি বিধান করিয়াছে।

বৈষয়িক জীবনের উন্নতির এমন এক প্রণালী-নির্দ্ধারণ করিতে

হইবে যাহাতে শুধু পল্লীর রক্ষা নয়, এক সর্ব্বাঙ্গীন স্বাভাবিক ও কর্ম্মঠ নাগরিক জীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে।

শ্রমজীবিগণের বসবাস নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত বিষয়ে মালিকেরা বেশী কিছু দায়িত্ব লয়েন না। বস্তিতে বসবাসের অসুবিধায় এবং স্ত্রীলোক-শ্রমজীবির কাজের অভাবে শ্রমজীবিগণ গ্রাম হইতে নগরে বা কারখানার সহরে যখন আসে তখন তাহাদের স্ত্রী ও কন্যাগণ বাড়ীতেই থাকে। কৃষি ও গৃহ-শিল্পের সংস্কার একদিকে যেমন গ্রাম হইতে নগরে ব্যাপকভাবে জন-প্রবাহ-প্রতিরোধ করিতে পারে, অপর দিকে নগরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নূতন নূতন বৃত্তির সৃষ্টি করিয়া সমাজের গড্ডালিকা-প্রবাহ, কঠিন সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন এবং নগরে স্ত্রীলোক-শ্রমজীবির কাজের ও বৃত্তির সুবিধা-বিধান করিয়া স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমান করিতে পারে।

নগরের কারখানায় এবং জনবহুল বস্তিতে শ্রমজীবিগণ যেভাবে তাহাদের জীবন অতিবাহিত করে তাহা অনুধাবন করিলে এ বিষয় সম্বন্ধে শিল্প-প্রণালীর একটা আমূল সংস্কার-বিধানের নিতান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের শ্রমজীবি পুরুষগণ ১২ ঘণ্টা, স্ত্রী-শ্রমজীবিগণ ১১ ঘণ্টা এবং বালকগণ ৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করে। বিলাতের শ্রমজীবিগণ ৮ ঘণ্টা কাজ করিতেছে। এবং ৬ ঘণ্টা ও ৭ ঘণ্টার অধিক কাজ করিবে না বলিয়া দল বাঁধিয়াছে, আট নয় ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম প্রায় একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে।

আমি অনেক কারখানায় দেখিয়াছি অন্তঃসত্তা স্ত্রী-শ্রমজীবি ১২ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতেছে। ফলে তাহার এবং তাহার সন্তানের জীবনীশক্তি যে হ্রাস পাইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। মজুরার বস্তিতে আমি এইরূপ একজন স্ত্রীলোককে তাহার কাজের পর এক প্রকার অবশ ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। সব বস্তিতেই শিশুদিগের কোনই তত্ত্বাবধান করা হয় না। এবং অধিকাংশ স্থলেই শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা ১০ জনের মধ্যে পাঁচেরও অধিক।

যখন কারখানার সরকারী ইনস্পেক্টর তত্ত্বাবধান করিতে আসেন তখন অনেক সময় দেখা যায়, অল্প বয়স্ক বালককে ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রথমতঃ ফ্যাক্টরী আইন (Factory-Act) শ্রমজীবিদিগের বসবাস, তাহাদের পরিশ্রমের নির্দ্ধারিত সময় প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদিগকে অবিচার হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ; দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বাবধায়কগণ অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনও উপায়ই বিধান করেন না। অতিরিক্ত ও দীর্ঘকালের পরিশ্রম, কম মজুরী, এবং দারিদ্র্যের নির্য্যাতনে তাহাদের মানসিক তেজ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কারখানার মজুরগণ সকলেই গ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং এখনও মাঠের পরিশ্রম, খোলা আকাশ বাতাসের ও পরিবারবদ্ধ জীবনের প্রভাব এড়াইতে পারে না। মানসিক ক্ষেত্রে যে প্রবল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে তাহাদের শারীরিক সুবিধা অসুবিধার একটা বোঝাপড়া হয় নাই। মদের দোকান নিকটেই

রহিয়াছে এবং আয় লাভের প্রত্যাশায় তাহাদের সংখ্যাও কার-খানার আশেপাশে বাড়িয়াই চলিতেছে। উপরন্তু যে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের মধ্যে তাহারা এতকাল জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল তাহা আর বস্তিতে সম্ভব নয়। অধিকাংশ বস্তিতেই পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীদের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী।

নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে এবং যে কদাচার ও ব্যাভিচার গ্রামে এতকাল জন-মণ্ডলের শাসনে শাস্তি পাইত তাহা এখন সহরের বুকে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে।

বস্তির ভিতরকার অবস্থাও এরূপ যাহাতে শ্রমজীবিগণের জীবন অসুন্দর ও পঙ্কিল না হইয়া থাকিতে পারে না। নানা সহরে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা কিম্বা বোম্বাই, কানপুর অথবা বাঙ্গালোর, পুনা অথবা আমেদাবাদের কল অথবা বস্তির ভিতর ভারতের মনুষ্যত্ব আবেষ্টনের প্রভাবে যে পশুত্বে পরিণত হইতেছে তাহা আমার স্থির ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়া আমি মাদ্রাজের বিভিন্ন সহরে Industrialism অথবা আর্ট ও নীতি বিগর্হিত আধুনিক কারখানা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলাম। প্রত্যেক আধুনিক সহরেই আমি শ্রমজীবিগণের বাসস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া—তাহাদের নিম্নলিখিত সর্ব্বজনীন অভাব ও অভিযোগের সহিত পরিচিত হইয়াছি—

(ক) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বস্তির ঘর-ভাড়া এত অধিক যে, তাহাতে শ্রমজীবিগণের মজুরীর এক চতুর্থ অংশের অধিক ব্যয়িত হয়।

(খ) ঘরগুলি এত ছোট, অন্ধকারময় এবং কম পরিসর যে, অস্বাস্থ্য ত দূরের কথা দুর্নীতিও উৎসাহিত হইয়া থাকে। চার ফিট চওড়া, ৭ ফিট লম্বা এবং ৬ ফিট উঁচু ঘরের মধ্যে যদি মাতা পিতা, স্ত্রী ও পুত্রবধূ, দুই তিনটি বয়ঃপ্রাপ্তা ভগিনী এবং কয়েকটি অপোগণ্ড রোগগ্রস্থ শিশুকে জীবন অতিবাহিত করিতে হয় তাহা হইলে সেখানে যথাযথ স্থান সঙ্কুলান ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা দায় হইয়া পড়ে। সেখানে স্বাস্থ্যই বা কোথায়—নীতিই বা কোথায় ?

মাদ্রাজ, মদুরা এবং কোচিনে বস্তির ভিতর গিয়া আমি সত্যসত্যই নরকের দূষিত আবর্জ্জনা ও কঠিন রোগের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছি। মানুষের দুঃখ ও বেদনা যে কতটা গভীর হইতে পারে, মানুষের আবেষ্টন মানুষের মনেক যে কতটা আবিল ও পঙ্কিল করিতে পারে তাহা ভাবিতে গেলে মানুষের কর্ম্মশক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

(গ) প্রত্যেক বস্তিতে জলের এবং মলত্যাগের অসুবিধা ; কলিকাতার অনেক বস্তিতে দেখিয়াছি ৫০ কি ১০০ জনের জন্য একটি পাইখানা। মহীশূরের অন্তর্গত কোলারের সোনার খনিতে ৩০০ জনের জন্য গড়পড়তা একটি মাত্র পাইখানা।

এই কারণে সকল কারখানার সন্নিকটে কলেরা রোগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়। একবার কলেরা আরম্ভ হইলে বস্তির পর বস্তি উজাড় হইয়া যায়। সমস্ত নিয়ম-কানুন ব্যর্থ হয়।

১৯১৯ সালে জানুয়ারী মাসে যখন বোম্বাইতে কলেরার সূত্র-

পাত হয় তখন শ্রমজীবিগণের মধ্যে একটি বিষম ধর্ম্মঘট চলিতেছিল। সমস্ত দিন, শ্রমজীবিগণ বস্তির ভিতর এবং নিকটে থাকাতে পাইখানার বে-বন্দোবস্তে ধর্ম্মঘটের সপ্তাহে কলেরায় ১২ হইতে ৩৬০ পর্য্যন্ত মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তখন বোম্বাইয়ের সরকারী স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধায়ক জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, ধর্ম্মঘট না থামিলে, শ্রমজীবিগণ বস্তির বাহির হইয়া কারখানায় না গেলে, বস্তির আশে পাশে মলত্যাগের কুফল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা অসম্ভব। ভারতবর্ষে ধর্ম্মঘট অর্থে শুধু অনশনে মৃত্যু নহে, সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যু।

দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও ব্যাভিচার অলক্ষ্মীর এই তিনটি মূর্ত্তি আমাদের বস্তিসমুদয়ে প্রকাশিত। অলক্ষ্মী কখনও প্রকাশিত হন দারিদ্র্যে, তাহার পর অস্বাস্থ্যকর ও অসৎ জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গী হইয়া পড়ে। অপর দিকে অস্বাস্থ্যকর ও অসৎ জীবনও দারিদ্র্যকে আনিয়া বংশপরম্পরায় পরস্পর কার্য্যকারণসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দারিদ্র্যকে কঠোরতর করিতে থাকে। অলক্ষ্মীর চক্র এইরূপে ঘুরিতে থাকে এবং ঐ চক্রের মধ্যে একবার পড়িলে মানুষের বংশ পরম্পরায় দেহ মন, আত্মা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে-সকল শিশু বস্তিতে জন্মগ্রহণ করে তাহাদের অর্দ্ধেকের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বস্তির বালকগণের ভার ও উচ্চতা সাধারণ বালকগণের অপেক্ষা অধিক কম হইয়া যায়। রোগের প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও মজুরদিগের পরিশ্রম,শক্তি হিসাবে এই সকলের ফলও বিষম।

বস্তির উন্নতিবিধান কি উপায়ে সম্ভব? একটা সহজ উত্তর —বস্তির উন্নতি বস্তির লোপে। Calcutta Improvement Trust এই উত্তর দিয়াছেন। বস্তি ভাঙ্গার একটা রোখ চাপিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রবজীবিগণ এক বস্তি হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্য বস্তিতে যাইতেছে। যে বস্তিতে অপেক্ষাকৃত কম লোক ছিল তাহা ভরাট হইয়া আরও অস্বাস্থ্যকর হইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক সহরেই বস্তিসমুদয়ের উন্নতি বিধান এইরূপ অস্বাভাবিক ও হঠকারী ডাক্তারী-অস্ত্র ব্যবহারের মত চলিতেছে। রোগের উপশম হওয়া দূরে থাক, ইহাতে শুধু শ্রমজীবিদিগের যন্ত্রণা বাড়িয়াই চলিতেছে।

সহরের অনতিদূরে উপনিবেশের মত মজুরদিগের জন্য যদি গ্রাম তৈয়ারী করিতে পারা যায়, লাইট রেলওয়ে, মোটর বিশ্বম্বহ্ (Omni Bus) গাড়ী প্রভৃতি যদি শ্রমজীবিদিগকে অনায়াসে ও অল্প সময়ে গ্রাম হইতে কারখানায় আনিতে পারে এবং তাহাদের প্রত্যেকের কুটীরে শাকসবজীর বাগান, পশুপালন, গৃহ-শিল্প ইত্যাদিতে স্ত্রীলোকদিগের জীবিকার্জ্জনের উপায় হয়, তবেই শ্রমজীবিগণের রক্ষা। শ্রমজীবিগণের সহিত তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার আসিতে পারিলে এবং তাহাদেরই মত স্বাধীনভাবে আপনাদের কার্য্যকুশলতা অনুযায়ী জীবিকানির্ব্বাহের উপায় লাভ করিতে পারিলে শ্রমজীবিগণের গার্হস্থ্য জীবন আবার তাহার পবিত্রতা ও শান্তি ফিরিয়া পাইবে। বিশুদ্ধ খাদ্য, বিশুদ্ধ-জীবনের সঙ্গে বিশ্রামও পবিত্র ও আনন্দের হইবে। পারিবারিক

জীবন ফিরিয়া আসিলে গ্রাম্যসমাজে পঞ্চায়েতের প্রভাব ফিরিয়া আসিবে—যে সমূহ-তন্ত্র গ্রাম্যসমাজে ভারতীয় সভ্যতার জীবন-ধারার সাক্ষ্য হইয়া আজও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহার আবার নূতন আবেষ্টনে নূতন জন্মলাভ হইবে। সমূহ-তন্ত্র এতকাল ভারতবর্ষের গ্রাম্যজীবনে আবদ্ধ থাকিয়া পরিসর লাভ করিবার অবসর পায় নাই,—শক্তি-সর্ব্বস্বতা-মূলক শিল্প-সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আমাদের রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমূহ-তন্ত্রের সহজ ও স্বাধীন অভিব্যক্তির গতিরোধ করিয়াছে। একবার সুযোগ ও উৎসাহ পাইলে সমূহ-তন্ত্র আধুনিক নাগরিক জীবনেও একটা যুগান্তর আনিতে পারে।

কারখানা যে ভবিষ্যতে সমূহের ভাব ও আদর্শের দ্বারা পরি-চালিত হইবে ইহা নিশ্চিত এবং এই কারণেই ভারতবর্ষের কৃষি-জীবনে যে সমূহ-তন্ত্র গ্রাম্যসমাজে সমুদয় মজুর, শ্রমজীবি, নাপিত, ধোবা, পুরোহিত প্রভৃতিতে সমূহের কল্যাণের জন্য সমবেত ভাবে মন্দির, চাবড়ি, পঞ্চায়েত ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে, কৃষি-সমবায়ের বিচিত্র উপায়-নিয়োগ ও নির্দ্ধারণ করিয়াছে, সেই সমূহ-তন্ত্র কারখানার পরিচালনে, শিল্পের আয়োজনে সমূহের দায়িত্বকে বরণ করিয়া এক নূতন ভাবে শিল্পের আকার ও ধরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। পাশ্চাত্য জগতের সোসিয়ালিজম শিল্প-জগতে যে বিপ্লববাণী প্রচার করিয়াছে,—সে বিপ্লব নিবারণ করিবার জন্য সহজ ও সরল উপায় প্রাচ্য জগতের সামাজিক অনুষ্ঠানে বীজের আকারে লুক্কায়িত রহিয়াছে। শিল্প-পরিবর্ত্তন-যুগে ভারত-

বর্ষের ও চীনদেশের সমবায়-পদ্ধতি যে পাশ্চাত্যের সমবায় অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত, সহজ ও পুরাতন তাহা অনুধাবন করিয়াই পাশ্চাত্যবিষ-জর্জ্জরিত ব্যক্তিসর্ব্বস্ব শিল্প-কারখানা অনুষ্ঠানের সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

তখন বস্তির পঙ্কিল পশুজীবন অসম্ভব হইবে, শ্রমজীবিগণ পশুর মতন নহে, শুধু হাতলের মত নিষ্ক্রিয় মানুষের মতন নহে, তাহারা কর্ম্মঠ ও স্বাধীন মানুষের উচিত ব্যবহার পাইবে।

কয়েকটি ধনী ও মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর স্বার্থের জন্য নহে, সমূহের কল্যাণের জন্য শিল্পানুষ্ঠান পরিচালিত হইবে। শিল্প তখন বাস্তবিক সমাজের কল্যাণে লাগিবে, এবং শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য তখন হইবে মানুষকে উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ দিয়া তাহাকে উচ্চতর সামাজিক ও অধ্যাত্ম-জীবনের, অতীত ও ভবিষ্যতের সকল সভ্যতার দানের অধিকারী করা।

কিন্তু ভারতীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, জাতিভেদ ও একান্ন-বর্ত্তী পরিবার প্রভৃতি ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ-শরীরে সমানভাবে অর্থপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দিতেছে, পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব ও সহানুভূতি জাগাইয়া দিতেছে এবং সমাজে একটা অবি-চলিত শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতেছে।

পাশ্চাত্য সমাজ-জীবন ব্যক্তির মর্য্যাদার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বিকাশ এক্ষণে সমগ্র সমাজের অনিষ্টপ্রদ ও সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যক্তির স্বাধীনতা এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খলতাতে পরিণত হইয়া সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের সমাজ যে পাশ্চাত্য জীবনযাপন প্রণালীকে প্রতিরোধ করিতেছে তাহা বিচিত্র নহে। আজকাল এমন কি ইউরোপেরই ধনবিজ্ঞানবিৎ ও সমাজবিজ্ঞানবিৎ মনস্বী পণ্ডিতগণ ইহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই তাঁহাদের নিজ সমাজের অনুষ্ঠানসমূহের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন তখন ভারতের কি সেই অনুষ্ঠান-গুলির পুনরাবৃত্তি করা কর্ত্তব্য? পাশ্চাত্য সমাজের বিষবৃক্ষগুলি ভারতের সমাজে রোপণ করা কি উচিত? ভারত কি পাশ্চাত্য দেশের অর্থোৎপাদন-প্রণালী অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার সমাজে ধর্ম্মঘট, শ্রমজীবি-দলন প্রভৃতি সামাজিক সঙ্কটগুলি আনয়ন করিবে? ভারতের বৈষয়িক জীবনে এখনও সাম্যনীতির প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, ভারত কি তাহার সমাজের সনাতন ঐক্য, প্রেম এবং সহানুভূতি ধ্বংস করিবার জন্য পাশ্চাত্য অনুষ্ঠান-গুলিকে অন্ধ এবং মূঢ়ভাবে অনুকরণ করিবে? ভারত কি তাহার বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের পরিণামভূত আর্থিক ও বৈষয়িক জীবনের নিজস্ব প্রণালী ও পদ্ধতিগুলি আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে না? সামাজিক সদ্ভাব ও সহানু-ভূতি ভারতের প্রাণ। নানা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, সমাজ, সমিতি, পঞ্চায়েৎ দল ও শ্রেণীর সমবায় ভারতের সমাজ-শাসনের আধার ও আশ্রয়। নূতন শিল্পপ্রণালীতে এই গুলি রক্ষা করিতে হইবে,

নচেৎ আমরা, এদেশে পাশ্চাত্যের ধনী ও শ্রমজীবিদের তুমুল সংঘর্ষ, গত শতাব্দীর শিল্প ও রাষ্ট্র বিপ্লবের নিদারুণ ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করিব। নব্য ব্যবসায় এক স্থানে কেন্দ্রীভূত না করিয়া তাড়িৎশক্তির সাহায্যে বিভিন্ন গ্রাম ও শ্রেণীর মধ্যে তাহার প্রসারের সুবিধা বিধান করিয়া যদি আমরা শ্রমজীবিকে নূতন দায়িত্ব এবং আংশিক স্বামিত্ব দিতে পারি, তাহা হইলে দেশের পুরাতন সামাজিকতার সহিত নব্য শিল্প-প্রণালীর একটা সামঞ্জস্য ক্রমশঃ হইতে পারে। ভারতের শিল্পরীতি তখন পুরাতন সমাজ-বন্ধনকে ভাঙ্গিয়া না দিয়া তাহাকে ব্যাপকতর জীবনের উপযোগী করিবে, এবং দেশকে ধনী ও মজুরের সমবেত স্বামিত্ব ও স্বায়ত্ত-শাসনের সুযোগ বিধান করিয়া একদিকে ধনীর অপরদিকে ধর্ম্মঘটীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। কি উপায়ে তাহা সম্ভব তাহার বিশদ বিবরণ আমার নব-প্রকাশিত ইংরেজী পুস্তকে দিয়াছি।

বৈষয়িক জীবনস্রোত যাহাতে প্রবল হয় এখন ভারতের ইহাই সমস্যা। আমাদের অর্থোৎপাদনের প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির কিরূপে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে, এ প্রশ্নের শীঘ্রই মীমাংসা করা উচিত। দেশের পল্লীগ্রামগুলি আজ পরিত্যক্ত ও বিগতশ্রী,—গ্রাম্যকৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর শোভা ও সৌন্দর্য্য হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের জাতীয় শিল্পগুলি বিনষ্ট হইয়াছে। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য আমরা পরনির্ভর হইয়াছি। বিদেশীয় দ্রব্যসম্ভার প্রচুর পরিমাণে আমাদের হাটবাজারে

আমদানী হইতেছে। বৈষয়িক জীবনে আমরা কতদূর পরমুখা-পেক্ষী হইয়াছি তাহা আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যসমূহের তালিকা ও মূল্যাঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বৈষয়িক জীবনে "সংরক্ষণনীতি" অবলম্বন

যদি প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্যের তালিকার প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি—দেখিতে পাইব, এগুলির আমদানী আধুনিককালে অত্যাবশ্যক হইলেও একেবারে যে ইহার প্রতিরোধ করা যায় না তাহা নহে। এই দ্রব্যগুলির মূল উপাদান আমাদের দেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উপাদানগুলি বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। আবার কারখানায় সুন্দর সুন্দর জিনিষে পরিণত হইয়া এ দেশেই ফিরিয়া আসে। এই প্রণালীতে দ্বিবিধ উপায়ে দেশের ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বিদেশীয় মহাজন ও শ্রমজীবিগণ ব্যবসায়ের লাভ ও পারিশ্রমিক পায়; এদেশের কলকারখানায় ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইলে দেশের শ্রমজীবিগণের অন্নকষ্ট দূর হইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় জাহাজে আমদানী হয় বলিয়া আমাদিগকে মাশুল দিতে হয়। এদেশে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত হইলে মাশুল লাগিত না, দ্রব্যের মূল্য কম হইত। আমাদের প্রকৃতি-দেবী আমাদিগকে খুব কৃপাচক্ষে দেখেন। অথচ আমরা বৈষয়িক জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উপযুক্ত

ব্যবহার করি না। আমাদের সাধারণ কারিগর ও শিল্পীরা কুটীরে বসিয়া সামান্য মূলধন ও অল্পসংখ্যক যন্ত্রাদি লইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ব্যবসায়িগণ প্রভূত মূলধন লইয়া সুবিশাল যন্ত্রাদি ও বাষ্পীয় বা তাড়িৎশক্তির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইরূপে বিদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি আমাদের বিপণীসমূহ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের মত আমাদেরও যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে ইহা আমাদের দেশে সর্ব্ববাদীসম্মত। বিদেশ হইতে আমদানী না হইয়া যাহাতে ভারতীয় কল-কারখানায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং উপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে এবং এইজন্য যাহাতে প্রচুর মূলধন সংগৃহীত হইতে পারে তাহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ নাই। কেবলমাত্র মূলধন সংগ্রহ নহে, দেশবাসীর ব্যবসায়-বুদ্ধি-বিকাশের আবশ্যকতাও আমরা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, দেশের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, এবং উপযুক্ত যুবকদিগকে নানা প্রকার ব্যবহারিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিবার জন্য বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিল্পশালায় বা কল-কারখানায় শিক্ষানবীশ রূপে প্রেরণ করা হইতেছে। এই সমস্ত ছাত্র যাহাতে প্রত্যাগমন করিয়া শীঘ্রই কারখানা চালাইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে মূলধন প্রদান করা হইতেছে এবং তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কলকারখানা-

গুলি যাহাতে পাশ্চাত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তজ্জন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় "সংরক্ষণ-নীতির" পক্ষপাতী।

এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্য মোটামুটি এই—আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্য আপাততঃ অপরিণত ও অপরিপক্ক ব্যবসায়-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট "সংরক্ষণ নীতি" অবলম্বন করিয়া যদি বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি না করেন অথবা জনসাধারণ স্বদেশী উৎপন্ন দ্রব্য মন্দ হইলেও অধিক মূল্যে ক্রয় না করে, তাহা হইলে দেশীয় শিল্পোন্নতি একেবারেই অসম্ভব। সংরক্ষণ এবং স্বদেশী, দুই অস্ত্রকেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি অথবা উভয়ে মিলিয়া আমাদের কার্য্য সাধন করিবে।

ভারতের সনাতন কুটীর-শিল্প

ভারতে শিল্পপ্রচারের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন্ শিল্প এ দেশে প্রবর্ত্তিত ও সংরক্ষিত হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কেহই স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত করেন নাই। যে সমস্ত ইউরোপীয় শিল্প ও কল-কারখানা এতদিন আমাদের বাজার দখল করিয়াছে, দেশে সেরূপ দুই একটা কল প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ শিল্পগুলি আমাদের দেশের উপযোগী কি না, এদেশে তাহারা

বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে কি না, কুটীর-শিল্পের সহিত ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিরূপ হইবে, এ সম্বন্ধে আমরা কোন বিবেচনা করি না। আমরা অনেক সময়ে মনে করি, আমাদের কুটীর-শিল্প মধ্যযুগেরই ব্যবস্থা বিশেষ, আধুনিক যুগে তাহার প্রচলন অসম্ভব এবং ভবিষ্যতেও ইহার কোন স্থান নাই। আজ হউক অথবা কালই হউক, কল-কারখানাই ইহার স্থানগুলি অধিকার করিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; অতএব কুটীর-শিল্পের বিলোপ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন ইউরোপীয় শিল্পের পরিবর্ত্তে ভারতের কল-কারখানা ও শিল্প যাহাতে সেই স্থান অধিকার করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা কি শ্রেয়স্কর নহে ?

এখন এই কথাটা আমাদিগকে গভীর ভাবে ভাবিতে হইবে। ভারতে ভবিষ্যৎ যুগে কুটীর-শিল্প কোন্ স্থান অধিকার করিবে, আধুনিক কল-কারখানা ইহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে কি না, এবং যদি অধিকার করে উহা বাঞ্ছনীয় হইবে কি না, এই সমস্ত প্রশ্নের শীঘ্রই মীমাংসা করিতে হইবে। আমাদের শিল্প-জীবনে এমন কি অবস্থা বা চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম যাহাতে মনে করিতে পারি যে, ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য কল-কারখানা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য ? দেশের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে এখন যে সমস্ত কুটীর-শিল্প বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় কি প্রত্যেক কল-কারখানাই আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে ? দেশীয় কুটীর-শিল্পগুলির কি কোন প্রকার উন্নতি সাধনের উপায় নাই ?

আধুনিক ব্যবসায়ে কল-কারখানা ও শিল্প

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এমন অনেক অবস্থা আছে যেখানে কেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবসায়ের হিসাবে এই কেন্দ্রীকরণের সুবিধা এত বেশী যে, অনেকস্থলেই হস্ত-চালিত গৃহশিল্প কল-কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় কিছুতেই বাঁচিতে পারে না। যেখানে সুবিশাল যন্ত্রাদি এবং বহু লোকের পরিশ্রম ভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতকরণ অসবম্ভব, সেখানে কেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। খনি সম্বন্ধীয়, লৌহ ইস্পাত সম্বন্ধীয় এবং জাহাজ ও নৌ-শিল্পবিষয়ক কারখানাগুলি এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় কখনই টিকিয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু অবস্থাবিশেষে ক্ষুদ্র শিল্পও অপরিহার্য্য, বিপুল কল-কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় অনায়াসেই তাহাকে হারাইয়া দেয়। একই প্রকারের বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে কল-কারখানার প্রচলন অপরিহার্য্য। একই আকার ও আয়তন এবং একই বর্ণের কোন দ্রব্য বহু পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে যন্ত্রের শক্তি যে হস্তচালিত শক্তিকে পরাভূত করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত প্রভৃতি স্বাভাবিক দৈহিক অভাবগুলি সকলেরই সমান। এই সমস্ত অভাব মোচনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের গুণগত পার্থক্য নিতান্ত অল্প। এই প্রকার দ্রব্যোৎপাদনে কল-কারখানার শিল্পীকে হার মানিতে

হয়। একজনের নিত্য প্রয়োজনীয় দৈহিক অভাবগুলির সহিত আর একজনের অভাবের বিশেষ পার্থক্য নাই; কিন্তু বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-রসাত্মক, মানসিক অভাব সৃষ্ট হইতে থাকে। এই শ্রেণীর অভাব বৃদ্ধির জন্য একের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট-রূপে অপর হইতে পৃথক হইয়া যায়। এইরূপে মানুষের অভাব-সমূহ যখন নীচ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর হয়, মানুষের মানসিক অভাব যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখনই মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে, তখনই ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ বিশেষ অভাবগুলি মোচন করিবার জন্য হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। একমাত্র শিল্পকলাই এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে সক্ষম। খুব উন্নত সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার সাধারণ দৈহিক অভাবগুলি প্রায়ই এক রকমের, বিশেষ প্রভেদ কিছুই নাই, সুতরাং কল-কারখানাজাত দ্রব্যের দ্বারা এই অভাব পূরণ হইতে পারে। কিন্তু মানসিক অভাব পূরণ বিষয়ে শিল্প-কলার চিরকালই প্রাধান্য থাকিবে।

আমাদের কয়েকটি শিল্প ও ব্যবসায়

ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির উন্নতির বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে তুলা ও পাট, কয়লা ও স্বর্ণখনি এবং কেরোসিন তৈলের কলকারখানায় ভারতে বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে। ১৯০১ সালে ১৯৭-টি তুলার কল ছিল এবং তাহাতে ১৭ কোটি টাকা মূলধন খাটিত। ১৯১৮

সালে ২৬৪ কারখানা এবং ২৮ কোটি মূলধন হইয়াছে। পাটের কলের সংখ্যাও ১৯০১ হইতে ১৯১৮ সালের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩৬ হইতে ৭৬-টিতে পরিণত হইয়াছে এবং মূলধনও ৮ কোটি হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৪·৮ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। কয়লার ব্যবসায় অসাধারণরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে, সমস্ত ভারতে ১৯০১ সালে খনি হইতে উত্তোলিত দ্রব্যসমষ্টি ৬৬ লক্ষ ছিল কিন্তু ১৯১৮ সালে তৎস্থলে ২০৭ লক্ষ হইয়াছে। কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়ও দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছে, ১৯০১ সালে খনি হইতে নিষ্কাষিত ৫ কোটি গ্যালন স্থলে ১৯১৮ সালে ২৮·৬ কোটি গ্যালন হইয়াছে।

আমাদের আরও কয়েকটি কারখানা আছে ; তন্মধ্যে কতকগুলি এক রকম চলিতেছে—আর কতকগুলি মৃতপ্রায়। আমরা চিনি, তৈল, কাগজ, পশম ও রেশমের কারখানায় খুব অল্পই অগ্রসর হইতে পারিয়াছি ; কাচ, চর্ম্ম, ছত্র, কলম ইত্যাদি এবং ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের কলকারনায় কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ভারতে খনিজ ব্যবসায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে সংবদ্ধ ছিল। আজ তাহা ইউরোপীয় বৃহদাকারে প্রতিষ্ঠিত এবং সুবিধাজনক রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে পরিচালিত কলকারখানার সংঘর্ষে বিলুপ্ত। আমাদের খনিজ ও ধাতব পদার্থসমূহের কারখানায় ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। তাতার লৌহ কারখানা ধাতু নির্ম্মাণ ও খনিজ ব্যবসায়ে ভারতে

এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সমগ্র এসিয়ায় এক যুগান্তর আনিতে পারে, আশা করা যায়। ঐ কারখানায় ইস্পাতের পাত প্রস্তুত হইতে থাকিলেই বাণিজ্য-পোত নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে এবং এই ভারতেই যে কালে প্রাচ্য ভূখণ্ডের জাহাজ, লৌহ ইস্পাত কল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? বৃহদাকার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, ও তাহার সঙ্গে প্রচুর মূলধনের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে এবং প্রভূত শ্রম-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে এই সমস্তই সম্ভব।

এ সকল ব্যবসায়ে পারিবারিক শিল্পের কোন স্থানই নাই

বৃহদাকার খনিজ ও ধাতব পদার্থের কারখানার কথা ছাড়িয়া তুলা ও পাট ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, ইহারা উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহার সহিত দেশীয় পারিবারিক-শিল্পের কিছুমাত্র প্রতিযোগিতা নাই বরং পারিবারিক শিল্পের সাহায্যে ইহা নানা প্রকারে পুষ্টি লাভ করিতেছে। কারখানায় যে সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা দেশীয় তাঁতে অতি সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশীয় তাঁতে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় এরূপ বলা যাইতে পারে। যদিও বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানী হইতেছে তথাপি আশা করা

যায়, স্বদেশী তাঁতের উন্নতি হইলেও এই আমদানী বন্ধ হইবার অনেকটা সম্ভাবনা থাকিবে। পাটের কলের সহিতও গৃহ-শিল্পের কোন প্রতিযোগিতা নাই। গৃহ-শিল্পে অধিকাংশই মোটা কম্বল, গালিচা, শতরঞ্চ, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পাটের ব্যবসায়ের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, পাট আমাদের এক-চেটিয়া ব্যবসায় এবং ইউরোপীয় ব্যবসা-বুদ্ধি ও মূলধন দ্বারাই সর্ব্বত্র পরিচালিত হইতেছে।

ভারতে কয়েকটি মাত্র চিনির কারখানা আছে; কোনটিরই অবস্থা সুবিধাজনক নহে। ভারতে আধুনিক রকমের চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নানা প্রকার বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। উপযুক্ত মূল্যে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু সংগ্রহ করা দুষ্কর। সমগ্র দেশে উৎপন্ন ইক্ষুর অর্দ্ধেকাংশ যুক্ত-প্রদেশে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য প্রদেশে ইক্ষুর চাষ অপেক্ষাকৃত কম, বৃহদাকার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা এ জন্য যুক্তিসঙ্গত নহে।

অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার অনেক সুবিধা ও স্বাধীনতাও রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্য, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে, গুড়ের আমদানী অপেক্ষা কাট্তি অনেক বেশী; সুতরাং সেখান-কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলিই উন্নতি লাভ করিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের পরেই বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে; কতকগুলি চিনির কারখানাও এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সকলগুলির অবস্থাই শোচনীয়। বৃহৎ কারখানা উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষু সরবরাহের অভাবে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা

সহ্য করিতে পারিতেছে না। সুতরাং চিনি তৈয়ার করিবার জন্য বৃহৎ কারখানার সৃষ্টি করিলে চলিবে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে এবং এই জন্য সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। বাস্তবিক বড় বড় চিনির কারখানা স্থাপনের ভরসায় না থাকিয়া আখমাড়া ও দলো চিনি গুড় তৈয়ারী করিবার জন্য ছোট ছোট কল আবিষ্কার করা প্রয়োজন। ভারতে ময়লা চিনি ও গুড়েরই চলন বেশী। ১৯১৩-১৪, ১৯১৯-২০, এবং ১৯২০-২১, এই তিন বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে যে চিনি আমদানী হইয়াছিল, যথাক্রমে তাহা ৮ লক্ষ, ৪ লক্ষ এবং ২ লক্ষ। ইহার অর্থ বিদেশ হইতে আমদানী চিনির পরিমাণ দেশী চিনির ষষ্ঠাংশ।

চর্ম্মের ব্যবসায়ে গৃহশিল্প অপেক্ষা কারখানায় নানা প্রকার সুবিধা আছে। চামড়া উপযুক্ত মূল্যে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে এবং চর্ম্ম সংস্কারের পক্ষেও বিদ্যুৎশক্তি বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। এ জন্য বৃহদায়তন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি জীর্ণ চর্ম্মদ্রব্য সংস্কার, জুতা মেরামত, সৌখীন জুতা ও অন্যান্য চর্ম্ম দ্রব্য প্রস্তুত করণ, পুস্তক বাঁধাই প্রভৃতি কার্য্যেই আবদ্ধ থাকিবে।

চর্ম্মের কারখানার মত, তৈলের কল, ময়দার কল, পশমী বস্ত্রের কল, কাগজের কল প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ব্যবসায়ে সফলতার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই সমস্ত ব্যবসায়ে আমরা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কাঁচ প্রস্তুত করিবার জন্য দেশে

কোন কারখানাই স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইউরোপে বেল-জিয়াম ও বোহিমিয়া এই দুইটি প্রদেশে এবং জাপানে কাঁচের দ্রব্য সামগ্রী গৃহ-শিল্পের দ্বারাই প্রস্তুত হইতেছে এবং গৃহ-শিল্পগুলিই সর্ব্বত্র কাঁচের দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেছে। আমাদের দেশের কাঁচের দ্রব্য তৈয়ারী করিবার জন্য বড় কারখানা স্থাপন না করিয়া গৃহ-শিল্পই প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য।

ব্যবসায় ধুরন্ধরের আবশ্যকতা

বৃহদাকারে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার স্থবিধা এবং অস্থবিধার বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমাদের দেশে ঐরূপ কারখানা যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিবেন এরূপ উদ্যোক্তা ও ধুরন্ধরগণের বিশেষ অভাব। যুবকদিগকে শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি মাত্র বিদ্যালয় আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যেরই আদর, শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা নাই। এই কারণে আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক সাধারণতঃ শিক্ষকতা, ওকালতি এবং গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া জীবিকার্জ্জন করে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়ে ও যন্ত্রবিদ্যায় ক্বচিৎ পারদর্শী হইয়া থাকে। বৈষয়িক অভাবসমূহ দূর করিবার জন্য আমাদের দেশে এরূপ বিজ্ঞানশিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহার ফলে যুবকগণ ব্যবসায়ের কূট সমস্যাসমূহ মীমাংসা করিবে, বিচিত্র শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের প্রাকৃতিক দ্রব্যসম্ভারের

সদ্ব্যবহার করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির সহায় হইবে। দেশে এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। কাজেই বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য আমাদের ছাত্রদিগকে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাইতে হইবে, ছাত্রদিগকে ব্যবসায় ও শিল্পের দিকে বিশেষ আগ্রহান্বিত করিতে হইবে, ছাত্রগণ যাহাতে বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বড় বড় কারখানা অথবা গৃহ-শিল্পগুলি নিজে পরিদর্শন করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া কার্য্যক্ষম হইতে শিখে। এইরূপে যখন তাহারা ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া আসিবে তাহাদিগকে কার্য্য অনুসন্ধানের জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতে হইবে না। কাজই মানুষ খুঁজিয়া লইবে, মানুষ কাজের অন্বেষণে ব্যগ্র হইবে না। বাস্তবিক বিদেশের কল-কারখানায় শিক্ষানবিশরূপে কার্য্য করিয়া ছাত্রগণের যাহাতে ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্মে সে বিষয়েই প্রধান লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে কাজের লোক হইতে হইলে, ব্যবসায়-পরিচালনে ধুরন্ধর হইতে হইলে, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিলে চলিবে না, পরন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক জ্ঞান ও কার্য্যকুশলতার অভাবের জন্যই ভারতে সমস্ত ব্যবসায়েরই দুরবস্থা। যদি আমাদের ধুরন্ধরগণ বিদেশে অবস্থানকালে বৈজ্ঞানিক কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক কার্য্যক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা করিতেন

তবে বিগত দশ বৎসরের মধ্যে দেশে প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা-গুলির এই দুর্দ্দশা হইত না।

বাণিজ্য-শিক্ষা

কৃষি ও শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যশিক্ষাপ্রণালীও প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাহাতে মহাজন, দালাল প্রভৃতিও শিক্ষিত হইয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কার্য্য বহুপরিমাণ নানাস্থানে বিস্তার করিবেন। তাঁহারা নানাস্থানের বাজার-দরের সংবাদ রাখিবেন এবং কোথায় কোন্ জিনিষের আবশ্যকতা বেশী এবং কোন্ জিনিষের কোথায় কাটতি কম ইত্যাদি সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করিবেন। এই বিষয়ে আজকাল ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে ইউ-রোপীয় বণিকদের কথার উপরেই সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হয় এবং ইহারাও যে নিজেদের স্বার্থের জন্য অনেক সময়ই প্রতারণা অব-লম্বন করিয়া থাকে তাহা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ভারতের যুবকদিগকে এই সমস্ত অভাব দূর করিবার জন্য পুরুষ পরম্পরাগত কুসংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শারীরিক পরি-শ্রমকেও সম্মানের চক্ষে দেখিতে হইবে এবং ইউরোপীয় বণিক-গণের স্থান অধিকার করিবার জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইতে হইবে। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যাহাদের এখনও বাধা আছে তাহাদেরও এ বিষয়ে নৈরাশ্যের কিছুই নাই, ভারতেই ঐরূপ শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে শিল্প ও

বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ ব্যবসায়ে উদ্যোগী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা দালাল, বণিক ও মহাজন হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। বর্ত্তমানে জগতে কারিগর অপেক্ষা বণিকদিগের আদর কোন অংশেই কম নহে। কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মার্কিন ও জর্ম্মাণীর ব্যবসায় জগতে উন্নতির কারণ যে তাহাদের শ্রমশক্তি অধিক নিপুণ, তাহাদের ধুরন্ধরগণ অধিক উদ্যোগী তাহা নহে; বিদেশসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতর সংযোগ, সকল দেশের বাজারসমূহে দ্রব্যবিশেষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান, বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ-বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বোপরি বাণিজ্য সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান ও বাণিজ্য পরিচালনের ক্ষমতাই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার মূল উপাদান। ভারতে এইরূপে বাণিজ্য শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে কিন্তু আমরা এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই এবং সমাদর করিতেও শিক্ষা করি নাই। দূরবর্ত্তী স্থানের বাজার-দর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কতকগুলি নিরক্ষর বণিকই দেশের বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্যের পরিচালনা করিতেছে। তাহারা আধুনিক বিজ্ঞাপন-প্রথা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোকদিগের সহিত ব্যবসায় চালাইতেও অনুপযুক্ত। পক্ষান্তরে বহির্বাণিজ্য সমস্তই বিদেশীয় বণিকদিগের হস্তে ন্যস্ত; তাহারাই লাভের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া থাকে। এখন আমরা চাই—

আমাদের শিক্ষিত এবং উপযুক্ত যুবকগণই তাহাদের স্থান অধিকার করুক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হউক, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বাজার-দর ও বিবিধ তথ্য অবগত হউক এবং দেশে ও বিদেশে কোথায় কোন্ জিনিষের অভাব বা আধিক্য তৎসম্বন্ধে আমাদের কারিগর ও শিল্পীদিগকে উপদেশ দান করুক। তাহাদিগকে বাণিজ্যাদির বিস্তৃত বিবরণী, কৃষিবিভাগের খতিয়ান এবং কল-কারখানা ও ব্যবসায় সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ পাঠ করিতে হইবে ও অভিজ্ঞতাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে অল্পমূল্যে দ্রব্য সরবরাহ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের প্রয়োজনাধিক্য প্রভৃতি অনুসন্ধান করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, প্রত্যেক জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় ও হাটে হাটে কার্য্যোপযোগী দ্রব্যসমূহের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সমস্ত দ্রব্য চালান করিবার সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে, যৌথকারবার ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, বাজারের মূল্যের পরিবর্ত্তনসমূহ লক্ষ্য করিতে হইবে, আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে দেশে কি পরিমাণ শস্য ও কল-কারখানাজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। এইরূপে ভারতে ব্যবসায়ী এবং বণিক জাতির সৃষ্টি হইবে। তাহারাই বিদেশীয় বণিকজাতির কবল হইতে ভারতকে রক্ষা করিবে।

অবস্থা ও ব্যবস্থা

এ সমস্ত ভবিষ্যতের আশা। আমাদের সম্মুখে এখন কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই মীমাংসা করা প্রয়োজন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নিতান্ত অল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য শিক্ষা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈজ্ঞানিক কৌশল ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে কার্য্যক্ষমতা এবং মূল-ধনের অভাবেই কল-কারখানা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিতেছে না। বহু অর্থ অনেক সময় বিলাসে ব্যয়িত হয় অথবা সিন্ধুকের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে মাত্র। ভারতের অধিকাংশ কার-খানাই সামান্য মূলধনে আরব্ধ হইয়াছে এবং ইহার পরিণাম যে বিষময় তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; অল্পমূল্যে পুরাতন কল ও যন্ত্রাদি ক্রীত হইয়া থাকে এবং এইরূপে মিতব্যয়ী হইতে যাইয়া আমরা অব্যবহার্য্য যন্ত্র ক্রয় করিয়া থাকি। উপরন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই অধিক পরিমাণ লভ্যাংশের জন্য লালায়িত না হইয়া ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে ক্ষতির জন্য সংস্থান এবং দূরদর্শিতাই যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার মূলসূত্র তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাদের সামান্য রকমের শিল্পনৈপুণ্য ও কার্য্যক্ষমতা আছে তাহাদের সামান্য মূলধনই যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং এরূপ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হইবে যাহাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা

না থাকে ; কারণ ব্যবসায় ও শিল্পের প্রারম্ভে একবার ক্ষতি হইলে তাহা সমস্ত দেশব্যাপী একটা নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতে শিল্প ও কারখানার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়। সুতরাং বৃহদাকারের কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে আমাদের বর্ত্তমান মূলধন পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতা প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়গুলি পরিচালিত করিতে পারিলেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারি। লোহার কারখানা, কাঁচের কারবার, বস্ত্রবয়ন এবং রঞ্জন, কাগজের কল প্রভৃতি অনুষ্ঠান আরম্ভ করা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নহে ; বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে ছুরি, কাঁচি, পেরেক, ছাঁচে ঢালাইকরণ এবং কপাটের কব্জা প্রভৃতি লৌহ কারখানার সামান্য সামান্য কাজগুলি আরম্ভ করা যাইতে পারে। বোতল, বলয়, এবং ভগ্ন কাঁচের জিনিষ হইতে নানাপ্রকার সাধারণ ব্যবহৃত দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, সূত্র প্রস্তুত ও হস্তচালিত বস্ত্র-সমূহের উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে ; আলকাতরা, ভাতে রং (aniline), নীল ও অন্যান্য দেশী রং দ্বারা ছিটের কাপড়, রঞ্জিত বস্ত্র, সূত্র ও রেশম প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; পীস্‌বোর্ড (Paste Board) ও কার্ড বোর্ড (Card board) প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; সোডা, সোরা প্রভৃতিও সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এখন বেশী চাকৃচিক্যের দিকে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই বরং যাহাতে অল্পমূল্যে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য সর-

বরাহ করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অল্পমূল্যতা এবং প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ—ভারতে এই দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কারখানায় দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান মূলধন, উদ্যোগ, এবং কর্ম্মকুশলতা অল্প বুঝিয়া উল্লিখিত কার্য্যসমূহে নিয়োগ করিতে পারিলেই ভবিষ্যতে উন্নতি সম্ভব।

বিবসন-সমস্যা

ইহা এখনকার সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। পৃথিবীর মধ্যে এই দেশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত এবং এই কার্পাস হইতে তৈয়ারী চরকায় কাটা সূতায় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মবস্ত্রও এই সেদিন পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইয়াছিল। বিলাতী সূতা ও কাপড়ের আমদানীতে আজকাল কার্পাস আবাদ উঠিয়া গিয়াছে, এবং যে চরকার দৌলতে দুয়ারে হাতি বাঁধিতে পারার কল্পনা হইয়াছিল —সে চরকা আজ বাঙ্গালীর ঘরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কার্পাসাবাদ পুনরায় প্রচলিত করিতে হইবে। আবার চরকায় সূতা কাটিতে হইবে। উন্নত প্রণালীর চরকাও উদ্ভাবিত হইয়াছে নূতন চরকার মধ্যে সরলা, কমলা, চট্টলা ও রাণী চরকা ভাল। কিন্তু অনেকে মনে করিতেছেন সমান ও মজবুত সূতা কাটা, চরকা মেরামত ও তৈয়ারী এবং আর সব বিচার করিতে গেলে আমাদের পুরাতন চরকাই ফলপ্রদ। পঞ্জাবে গ্রাম্যসমাজ

সম্বন্ধে তত্ত্বাবধানের সময় আমি যে সব পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম সেখানে প্রত্যেক কৃষক-গৃহস্থের জমিতে অন্ততঃ দুই এক কাঠায় কার্পাসের আবাদ দেখিয়াছি। সেখানকার মেয়েরা চরকায় ঐ কার্পাস হইতে সূতা তৈয়ারী করিয়া গ্রামের তাঁতীদিগকে দিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে নিজেরাও মোটা কাপড় বুনিয়া থাকে। তাই পঞ্জাব আপনার লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ হয় নাই। স্বাবলম্বন না শিখিলে বিবসন-সমস্যার পূরণ হইবে না। শুধু সূতা কাটা নহে, ঘরে ঘরে কাপড় বুনারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আসামে ভদ্রঘরের মেয়েরা আজও যে কাপড় বুনিতেছে তাহাতে কোট ও মোটা কাপড় সম্বন্ধে উহারা পরনির্ভর নহে। অবসরের সময় মধ্যবিত্ত গৃহে কাপড় বুনা, খেলনা তৈয়ারী, বেতের কাজ, লেশের কাজ, রেশমের কাজ প্রচলিত হইলে অবস্থা কিছু সচ্ছল হয়। দেশের তাঁতীদের সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতার ভয় নাই, কারণ যে কাপড় তৈয়ারী হইবে তাহাতে দেশের সম্পূর্ণ অভাব সঙ্কুলন হইবে না। অবশ্য দেশের লোকের মোটা কাপড় সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকিলে চলিবে না। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ বুড়ি-কাপাসের বীজ কৃষিবিভাগ হইতে আনাইয়া লইয়া কৃষক-গণকে বিতরণ করুন, গ্রামে গ্রামে যাইয়া কার্পাসের আবাদ ও প্রচলন করুন। তাঁতীদিগকে লইয়া সমবায় সমিতি গঠন করুন এবং সমবায় সমিতিদ্বারা কার্পাস, চরকা সূতা ও কাপড় সরবরাহ করাইয়া লউন। তাঁহাদের উপর নানাদিক হইতে নানা কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে, কিন্তু এই আহ্বান বড় মর্ম্মস্পর্শী বড় নিদারুণ।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার পর তাঁহারা কৃষি ও শিল্পের পুনরুত্থানের আয়োজন করিবেন।

বৈষয়িক জীবন পুনর্গঠনের ভার দেশের শিক্ষিত উৎসাহী কর্ম্মীদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামে একটি ভাণ্ডার শিল্পজাত দ্রব্য, শস্য ও নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে; নৈশবিদ্যালয়ে কথক অথবা শিক্ষক, যাহাতে প্রত্যেক গ্রামবাসী দৈনিক হিসাব লিখিতে, সংবাদপত্র ও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে, এবং সুনিপুণ শিল্পী ও যন্ত্রীর সাহায্যে যাহাতে তাহার পারিবারিক হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার সুবিধা বিধান করিবে; উৎকৃষ্ট সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহারে কৃষির উন্নতির জন্য একটি ক্ষেত্র এবং তাহার সংলগ্ন গোজাতির রক্ষা ও উন্নতিকল্পে গোশালা,—এই তিনটি অনুষ্ঠান—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির একমাত্র ভিত্তি। এই তিনটির সবগুলি চাই, একটি না হইলে সব যাইবে। এইগুলিকে সুচারুরূপে প্রবর্ত্তন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে শাখা-প্রশাখা বিচিত্র ফুল ফল, সময় ও সুযোগ মত আপনি জন্মাইবে এবং ক্রমশঃ গ্রাম্য-সমাজ ও নানা গ্রাম্য-সমাজের মিলনে সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিরাট সমবায়-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অতি যত্নে অতি নিপুণভাবে গাছ রোপণ করিতে হইবে, দেশের সে ভাবুকতা চাই যাহাতে ধেনু-চরা মাঠে, ছায়ায় ঢাকা পল্লীর পথেঘাটে আবার সেই রাখাল-রাজের আহ্বান শুনিব, যে

আহ্বানে শুষ্ক তরু অবিলম্বে মুকুলিত হইবে, নানা শাখা-প্রশাখা পাখীর কাকলীতে মুঞ্জরিয়া উঠিবে, নব আশার অনুরাগে গ্রামের পর গ্রাম মাঠের পর মাঠ ফাল্গুনের আগুনে জ্বলিয়া উঠিবে। যিনি আমাদের ভগ্ন দেবালয় হইতে বিবাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, পরিত্যক্ত গোষ্ঠে যে রাখালের ডাক চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল, বিবসনা ব্রজবালার লজ্জাসরমে যিনি এতকাল মুখ লুকাইয়াছিলেন তিনি বুঝি আজ আবার আসিতেছেন, তাই স্বপ্ন-মগ্ন গ্রামবাসী আজ পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে। ধান-ভানানি গানে, চরকার গুনগুনানিতে তিনি দিকে দিকে বসন্ত উষার স্তিমিত আলোকে প্রকাশিত হইতেছেন, গোপ-বধূর গো-দোহনের চারুনিতম্বের তালে তালে তিনি আসিতেছেন—তাঁহার মাথায় ললিত কলার অশোক কর্ণিকা, অঙ্গে চারুশিল্পের চন্দন বিলেপন। তিনি আসিতেছেন ঘাটে ঘাটে তরণী নঙ্গর করিয়া—শুষ্ক নদীর দুই পার্শ্বে সমৃদ্ধির সুন্দর বন্দর সজ্জিত করিয়া। বাংলার কুটীরের গোয়াল কুড়ুনি ব্যাকুলভাবে আজ প্রবাসী প্রিয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহার নয়নপাতে বাংলার জাতীয় জীবনের নিকট সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—:০:—

পল্লীচর্য্যা বিধান

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামবাসীরা রোগে ও অন্নকষ্টে ক্রমশঃ শীর্ণ এবং হীনবল হইয়া পড়িতেছে। কৃষির অবনতি হইয়াছে, শিল্পসমুদয়ও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসীদের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবনতি দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের এইরূপ অবনতির জন্যই আমরা ক্রমশঃ দীনহীন হইয়া পড়িতেছি ; কারণ (ক) সকল দেশেই পল্লীবাসিগণ সমাজের প্রধান বল ও অবলম্বনস্বরূপ (খ) আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া অধিকাংশ লোকই পল্লীবাসী ; সুতরাং নগর অপেক্ষা গ্রামগুলিরই লোকসংখ্যা এবং সমাজ-শক্তি অধিক। (গ) অতীতকালে পল্লীগ্রামগুলিতেই আমাদের সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছিল ; ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার মত নগরগুলিকে অবলম্বন না করিয়া পল্লীগ্রামসমূহেই পুষ্ট হইবে, তাহা না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

বাস্তবিক পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন আমাদের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়।

আমাদের দেশের পল্লীবাসিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব নাই। সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়। যাহাতে কার্য্য করিবার এই প্রণালী পল্লী-সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সম্যক্‌ ও সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। দরিদ্র এবং দুর্ব্বল কৃষক শিল্পী ও শ্রমজীবী একক হইয়া কাজ না করিলে কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। এই মূল সূত্র মনে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

(ক) কৃষিবিষয়ক

একে একে স্বতন্ত্রভাবে মহাজনের নিকট অধিক সুদে কর্জ্জ না লইয়া গ্রামের সকল কৃষক মিলিত হইবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্জ্জের দায়িত্ব লইয়া যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী গঠন করিবে, এই উপায়ে তাহারা অল্প সুদেই মহাজনের নিকট কর্জ্জ পাইবে; সকল কৃষকের অর্থসাহায্যে পাইকারী দরে শস্যের বীজ, সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা, এবং গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন, চিকিৎসা ও সুস্থ সবলকায় বৎস্য উৎপাদনের উপায়বিধান করিতে হইবে; সাধারণ গোশালা স্থাপন করিয়া গোপগণকে সমবেতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধের বিশুদ্ধি রক্ষা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) শিল্পবিষয়ক

শিল্পিগণ, ব্যক্তিগত ভাবে পাইকারদিগের নিকট দাদন না লইয়া মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করিবে, এবং পরস্পরের কর্জ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অল্প সুদে মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা করিবে; পরস্পরের অর্থ সহায়তায় তাহারা অধিক মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও দ্রব্যপ্রস্তুতকরণের উপকরণসামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) বাণিজ্যবিষয়ক

কৃষকগণ ব্যক্তিগত ভাবে দালাল ও পাইকারগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিয়া আপনাদের ন্যায্য লাভ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়, ইহার প্রতিকারস্বরূপ সকলে মিলিয়া পাইকারী দরে সমবেত প্রণালীতে শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; শস্যের অবাধ রপ্তানী সংযত করিতে হইবে; খাদ্য শস্যের বিনিময়ে বাণিজ্যো-পযোগী শস্যের আবাদ হ্রাস করিতে হইবে; সাধারণ শস্য-গোলা স্থাপন করিয়া শস্যসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া পল্লীবাসিগণের নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে সুবিধা দরে ক্রয় করিয়া আনিয়া লাভ না করিয়া পাইকারী দরেই পল্লীগ্রামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামজাত শিল্পদ্রব্যাদি ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কগণ কর্তৃক বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাবৎকাল বিক্রয় না হয় তাবৎকাল

শিল্পীকে আহার্য্য ও বস্ত্রাদি কর্জ্জ দিতে হইবে; মেলা ও হাটে গ্রাম্য কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) শিক্ষাবিষয়ক

গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবহারিক বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে আপনার দৈনিক হিসাব লিখিতে এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিকার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে; কারখানায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্য্যপ্রণালী প্রচার করিতে হইবে; ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিযন্ত্র সার ইত্যাদি অথবা শিল্পকার্য্যের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ দ্রব্যসামগ্রী সমবেতভাবে ক্রয় করিবার সুযোগ বিধান করিতে হইবে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি লোকশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থগুলির চিত্রশোভিত, সুখপাঠ্য আধুনিক সংস্করণসমুদয় বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে; স্থানে স্থানে পাঠাগার স্থাপন করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ পুস্তক রাখিয়া জনসমাজে ঐগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে; পল্লীগ্রামে ফকির, ভিক্ষুক এবং বৈরাগীর গান ও ছড়াগুলি যাহাতে নূতন সমাজ

এবং জাতীয় চরিত্র-গঠনের উপযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) স্বাস্থ্যবিষয়ক

পল্লীবাসিগণের সমবেত উদ্‌যোগ ও উদ্যমে গ্রামের বন-জঙ্গল পরিষ্কার, নদী, খাল, পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার সাধন, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী, কূপাদি খনন ও সেইগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারি-ভয়ের সময়ে রোগীচর্য্যা এবং রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; দেশের গাছ-গাছড়া ইত্যাদির গুণাভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সহজ এবং সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামবাসিগণের শ্রমময় জীবনকে কথঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য পল্লীক্রীড়া, আমোদ-ব্যায়াম প্রভৃতির উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। এই সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুল বিস্তৃত হইয়া আমাদের জাতীয় অবনতির প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় একনিষ্ঠ কল্যাণকর্ম্মী পল্লীসেবকের প্রয়োজন। পল্লীসেবকগণের ভাবুকতা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই পল্লীসেবকগণের কল্যাণ-কর্ম্মে সুবিধা ও সুযোগবিধানের জন্য দেশের শিক্ষিত ধনী এবং জমিদারবর্গকে মুক্তহস্ত ও সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্যে বণিকের আধিপত্য ও প্রতিকার

আসন্ন দুর্ভিক্ষ

সেদিন এক ভীষণ জলপ্লাবন বাংলা দেশের অনেকগুলি জেলাকে বিধ্বস্ত করিয়া গেল। অসংখ্য গো-মহিষাদি পশু বিনষ্ট হইল। অসংখ্য লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল। অসংখ্য লোক এখনও অন্নাভাবে প্রপীড়িত রহিয়াছে, এক মুঠা অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। অতিবৃষ্টির পর কয়েক জেলায় অনাবৃষ্টি হইল। সকলেই বলিতেছেন, এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ তাহার করাল মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, অতি-বিস্তার-বদনা, অসংখ্য-নরকঙ্কাল-শোভিতা সে দানবী সমগ্র বাঙলা দেশকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। সকলেই এ জন্য ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষ এদেশে যে নূতন তাহা নহে। দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, অনেক লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাণে এমন কি সম্বৎসর ধরিয়াই দেখা

যায়। বাস্তবিক যদি দুর্ভিক্ষ অর্থে আমরা ভিক্ষা-সংগ্রহের দুঃসাধ্যতা বুঝি, তাহা হইলে অনেক জেলাই আধুনিক কালে দুর্ভিক্ষপীড়িত। আমাদের দেশে এখন কালের নিয়মে দুর্ভিক্ষ অর্থে অন্নাভাবে মৃত্যু বুঝায়, কেবল অন্নদাতার অভাব বুঝায় না। কাজেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলেই সকলে শিহরিয়া উঠে।

দুর্ভিক্ষের কারণ

দুর্ভিক্ষের কারণ কি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অনেকেই বলেন, দুর্ভিক্ষের কারণ দ্রব্যের দুর্মূল্যতা। পূর্ব্বে এক টাকায় এমন কি এক মণ চাউল ক্রয় করিতে পারা যাইত, এক্ষণে এক টাকায় অনেক সময়ে চারি পাঁচ সের চাউল ক্রয় করিতে হয়। কাজেই অর্থাভাববশতঃ দরিদ্রেরা চাউল ক্রয় করিতে পারে না বলিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে, দ্রব্যসমূহের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক দ্রব্যের মূল্য নয়-দশগুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের দ্রব্যের দুর্মূল্যতার সহিত দুর্ভিক্ষও জড়িত, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে তাহা নহে। বাস্তবিক আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে কেবলমাত্র দ্রব্যের দুর্মূল্যতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না।

আমাদের দেশে দ্রব্যের দুর্মূল্যতা শুধু নহে, দুর্মূল্যতার সহিত দ্রব্যাভাব দেখা দিয়াছে। দ্রব্যাভাবই দ্রব্যের দুর্মূল্যতার প্রধান

কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে অন্য দ্রব্যের সহিত চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেশে চাউলের অভাব।

(ক) কৃষিকার্য্যের অবনতি

এই চাউলের অভাবের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিব, এবং তাহা বুঝিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। দেশে নানা কারণে কৃষির অবনতি হইতেছে—(ক) কৃষকগণ দারিদ্র্য হেতু উপযুক্ত সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অক্ষম, (খ) উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহারা সার এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার জানে না, (গ) গো-জাতির ক্রমশঃ অবনতি দেখা যাইতেছে, (ঘ) রেল-লাইন স্থাপন প্রভৃতি কারণে জল সরবরাহ হইতেছে না, (চ) মধ্যবিত্তশ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসাতে কৃষকদিগের উৎসাহ নাই। এই সমস্ত কারণে দেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

(খ) বিশেষতঃ খাদ্য-শস্য চাষের অবনতি— পাটের আবাদ

দেশে যে কেবল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কমিতেছে তাহা নহে ; যে সকল ফসল বিদেশে রপ্তানী হইয়া বিদেশীয় বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় সেই সকল ফসলই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন

হইতেছে। দেশবাসিগণের অন্নসংস্থানের সহায় না হইয়া আমাদের কৃষককুল বিদেশীয় কারখানায় উপকরণ-সামগ্রী জোগাইতেছে। বাঙলা দেশে পর পর নীল তুঁত এবং পাটের চাষ ধান্যচাষের মতনই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে নীল এবং তাহার পর তুঁতের চাষ করিয়া কৃষকগণ মনে ভাবিয়াছিল, তাহারা হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে। তাহারা কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল সত্য ; কিন্তু নীলকর এবং কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার-কাহিনী নীল এবং তুঁতের আবাদের বিষময় ফল সম্বন্ধে আজও পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতেছে—বাঙলা দেশের কৃষক-সমাজ কখনও সে অত্যাচার-কাহিনী ভুলিতে পারিবে না। নীল এবং তুঁত চাষের পর পাটের চাষ খুব প্রচলিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাট প্রথম বিলাতে রপ্তানী হয় ; ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতার কাষ্টম্ হাউস পাট রপ্তানীর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। সে বৎসর ৪০৯৬ মণ পাট রপ্তানী হইয়াছিল। তাহার পর হইতে পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িয়াছে।

পাটের আবাদের পরিমাণ

	১৯১২	১৯১৩	
বঙ্গদেশ	২৫,৭৬,৫০৩	২৭,৫৫,১৬৩ +	১,৭৮,৬৬৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২,৯৮,৩৩৪	৩,১৮,৩৫৮ +	২০,০১৪
আসাম	৯৫,৬৪৭	৯৬,০৯০ +	৪৪৩
মোট	২৯,৭০,৪৯৩	৩১,৬৯,৬১৪ +	১,৯৯,১২০

	১৯১৮-১৯
বঙ্গদেশ	২২,১৯,২০০
বিহার ও উড়িষ্যা	১,৫১,৩০০
আসাম	১,০২,১৩৪
	২৪,৭২,৬৩৪

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বত্রই অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

বিহারেও পাটের আবাদ ক্রমশঃ বাড়িয়াছে, কয়েক বৎসরের আবাদী জমির পরিমাণ দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়,—

১৯০৯	...	২,৪১,৪০০ একর
১৯১০	...	২,৪৮,২০০ ”
১৯১১	...	২,৫৮,১০০ ”
১৯১২	...	১,৯৮,৩০০ ”
১৯১৩	...	৩,৩৮,৪০০ ”

এখনকার পাটের সুবিধা আছে। কুঠিয়ালগণ নিজেরাই মুখ্য ভাবে পাটের চাষ পরিচালন করিতেছে। পাটের চাষ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এবং এক্ষণে উহা বিস্তৃত হইতেছে; এবং এই বিস্তৃতির জন্য কুঠিয়ালগণ অপেক্ষা দালাল পাইকারগণই অধিক দায়ী হইয়াছে, কাজেই নীলকরদিগের অত্যাচার আবার দেখা দেয় নাই। কিন্তু নীল এবং তুঁতের আবাদের মত পাটের আবাদের একটা প্রধান দোষ আছে। পাট খাদ্য-শস্য নহে। কাজেই পাট অধিক পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ

অবশ্য হ্রাস পাইবে। কোন দেশের শ্রমজীবীর শক্তি এবং মূলধনের পরিমাণ অসীম নহে, তাহা নির্দ্দিষ্ট। অতএব বিদেশে রপ্তানীর জন্য যদি পাট উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা হইলে অচিরেই চাউলের চাষ কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে জমিতে চাউল হয় সেই জমিতে পাটও হয়, পাটের বাজার-দর অধিক হওয়াতে কৃষকগণ অধিক খাজনা দিয়া জমিদারের নিকট হইতে চাউল আবাদ ছাড়িয়া পাটের আবাদের জন্য জোত লইয়া থাক। এরূপে দেশে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। বাস্তবিক পাট তিসি প্রভৃতি উপকরণ-শস্যের চাষ বাড়িয়া যাওয়া দেশের পক্ষে প্রভূত অনিষ্টকর। দেশে যে দুর্মূল্যতা দেখা গিয়াছে তাহার একটা প্রধান কারণ—খাদ্য শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কমিতেছে। পরপৃষ্ঠার তালিকাটি পাঠ করিলে আমরা হ্রাসের পরিমাণ বেশ বুঝিতে পারিব—

১। চাউলের চাষের পরিমাণ (মিলিয়ন একর পরিমাপক হিসাবে)	১৯০১ ৭০	১৯০৬ ৭৩'৫	১৯১০ ৭৮'৫	১৯১৩ ৭৬'৯	১৯২৮ ৭৭'৫	১৯১৯ ৭৮'৭
২। গম চাষের পরিমাণ (মিলিয়ন একর পরিমাপক হিসাবে)	১৮'৬	২৫'১	২৬'৪	২২'৬	১৯'১	২৩'৫

এই কয় বৎসরে পাট এবং তুলার চাষ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাও নির্দ্দেশিত হইল

১। পাটের চাষ (মিলিয়ন একর)	২'১	৩'৫	২'৯৩	৩'১	২'৪	২'৭
২। তুলার চাষ (মিলিয়ন একর)	১০'৩	৬'৭	১৪'৪	১৫'৩	১৪'৪	১৫'৩

১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কেবল ৭'১৭ বৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু তুলা ও পাট চাষের পরিমাণ ৭ ঐ দশ বৎসরেই শতকরা ৫০'০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাট ইত্যাদি উপকরণ-শস্য চাষের কুফল

মুর্শিদাবাদ জেলায় একজন খুব ধনী এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার তাঁহার বাটীতে একবার তাঁহার জমিদারীর সমস্ত প্রজাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজনের জন্য সকলেই উপবিষ্ট হইলে জমিদার মহাশয় তাহাদিগের সম্মুখে আসিলেন এবং তাঁহার পাচকগণের দ্বারা তাহাদিগকে পাটের কুচি পরিবেষণ করাইলেন। প্রজাগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জমিদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আমাদের জন্য এ কি খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন?" জমিদার মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, "দেখ তোমরা আমার জমিদারীতে যাহা উৎপন্ন করিবে তাহা ভিন্ন অপর খাদ্য আমি কোথায় পাইব? তোমরা ধান্য চাষ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সর্ব্বত্রই পাটের চাষ আরম্ভ করিয়াছ, অতএব পাট ব্যতীত তোমাদিগের অপর কোন খাদ্য আশা করা অনুচিত।" প্রজাবৃন্দ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া জমিদার মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যখন তাহারা স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন সকলেই জমিদার মহাশয়ের উপাদেয় এবং কৌতুকপ্রদ শিক্ষাপ্রণালীর প্রশংসাবাদ করিতেছিল। সেই অবধি মুর্শিদাবাদের ঐ অঞ্চলে পাটচাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। জমিদার মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক সত্য এবং স্পষ্টভাবে বলা। জেলায় জেলায় যদি খাদ্য-শস্যের চাষ কমিয়া যায় তাহা হইলে সে দেশে

অন্নাভাব না হওয়াই আশ্চর্য্য। কৃষকগণ পাট প্রভৃতির চাষে যদিও কিছু নগদ টাকা লাভ করিতে পারে, কিন্তু চাউলের মূল্য ততোধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহারা অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। *বিদেশী বণিকদিগের প্রভাবে দেশীয় কৃষি বিদেশের* প্রভূত ধনোৎপাদনের সহায় হইয়া যদি দেশবাসিগণের দারিদ্র্য আনয়ন করে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মূঢ় কৃষি-ব্যবস্থা স্বপ্নের অগোচর। আমরা কিন্তু এই মূঢ় ব্যবস্থা অন্ধভাবে পুরুষানুক্রম ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছি।

(গ) খাদ্যশস্য রপ্তানি

শুধু খাদ্য-শস্যের চাষ যে কমিতেছে তাহা নহে, আমরা নিজেদের অভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বহুল পরিমাণে খাদ্য-শস্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছি। এস্থলেও বিদেশী বণিক-দিগের প্রভাব হইতে আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ রহিয়াছেই। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই খাদ্য-শস্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে।

চাউল রপ্তানি	১৯০১	১৯০৬	১৯১০	১৯১২	১৯১৮	১৯১৯
(মিলিয়ন cwt. পরিমাপক হিসাবে)	৩৪	৩৮.৭	৪৮	৫৫.২	৪১.০	৪৮.৬
গম রপ্তানি						
(মিলিয়ন cwt. পরিমাপক হিসাবে)	৭.৩	১৬	২৫.৩	৩৩.২	৯.৫	১৫.০

এক মিলিয়ন cwt. = প্রায় ১৩.৫ লক্ষ মণ।

১৮৯৫ সনে রুশিয়াতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু দেশে অন্নাভাব সত্ত্বেও অসংখ্য রেলগাড়ী শস্য বোঝাই করিয়া রুশিয়া হইতে বিদেশে যাইতেছিল। সেখানকার রাজস্বসচিব হিল্‌কফ্‌ ঐ রেলগাড়ীসমূহের বিদেশ যাত্রা নিষেধ করিয়া রুশিয়ায় উৎপন্ন সমস্ত শস্যের দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আদেশ প্রচার করিলেন। দুর্ভিক্ষ থামিয়া গেল। আমাদের দেশে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অনায়াসেই সমস্ত প্রদেশের অন্নাভাব দূরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও আমরা বিদেশে বৎসর বৎসর শস্য রপ্তানি করিতেছি।* কবি স্বদেশকে আহ্বান করিয়া গাহিয়াছেন "চির কল্যাণময়ি তুমি ধন্য—দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন।" ধনবিজ্ঞানবিৎ এই প্রকার ব্যবস্থাকে

---

* শস্য রপ্তানি যে শস্যের দুর্মূল্যতার একটি প্রধান কারণ তাহা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টেও নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

"Rice of which the exports have greatly increased during the last two years 1901—03 remains extremely dear. * * * Wheat in India proper, like rice in Burma, is being grown more extensively for export and the recent revival of the foreign demand has produced exports bearing a far larger proportion to the consumption than in the case of rice."

Imp. Gazetteer of India, Vol. III. chap IX. p. 460.

"Of rice it may be said that present prices are as high as the famine prices of former years."

"The demand for export has undoubtedly influenced the price of rice and wheat directly, and through them the prices of the commoner food grains."

Imp. Gazeteer of India, Vol III. chap. IX. p. 461.

দেশের পক্ষে ঘোর অকল্যাণপ্রদ বলিয়া মনে করেন,—নিজের ধন পরকে দিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়া অবশেষে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করা দুর্ব্বলতার লক্ষণ। ইহা স্তুতিবাদের বিষয় নহে। আর একজন কবির আক্ষেপে বাস্তবজীবনের প্রকৃত দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে,—

নিজ অন্ন পরে, পরপণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গসুখে,
তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে।

ইউরোপের যুদ্ধ এবং ভারতীয় কৃষককুলের সুমতি

গত যুদ্ধের সময় যে সকল কৃষক পাটের চাষ করিত, তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। ইউরোপের ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয় না করাতে ক্ষেতের পাট ক্ষেতে পচিয়াছিল। তদুপরি আহার্য্য এবং অন্যান্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে কৃষককুলের যারপর-নাই ক্ষতি হইয়াছিল। ফলে, কৃষকগণ চিরজীবনের মত শিক্ষা লাভ করিয়াছে। তাহারা যে ইউরোপের ব্যবসায়ের উপকরণ যোগাইতে গিয়া নিজে অন্নহারা হইতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে পাটের চাষ ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকাদৃষ্টে তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

	১৯১৩	১৯১৮	হ্রাস বৃদ্ধি
বঙ্গদেশ	২৭,৫৫,১৬৬	২৪,৫৮,৯০০	–২,৯৬,২৬৬
বিহার ও উড়িষ্যা	৩,১৮,৩৫৮	২,০৩,৭০০	–১,১৪,৬৫৮
আসাম	৯৬,০৯০	১৩৭,৩৩৭	+ ৪১,২৪৭
	৩১,৬৯,৬১৪	২৭,৯৯,৯৩৭	–৩,৬৯,৬৭৭

যুদ্ধের সময় খাদ্য-শস্য রপ্তানি গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। ইহার তিনটি কারণ ছিল (ক) শত্রুপক্ষকে লুক্কায়িত ভাবে রপ্তানি প্রতিরোধ করা (খ) দেশে খাদ্য-শস্য মজুত রাখা (গ) কৃষক এবং সাধারণ লোকের পক্ষে শস্যের মুল্য ন্যায়ানুমোদিত কমিতে এবং বাড়িতে না দেওয়া। যুদ্ধের পর দুর্ভিক্ষ অথবা অন্নকষ্ট হেতু এখনও রপ্তানি সম্বন্ধে নিয়মের (খ) ও (গ) কারণ বিদ্যমান। তাই গবর্ণমেণ্ট এখনও খাদ্য-শস্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

নিম্নলিখিত তালিকাতে চাউল ও গমের উৎপন্ন পরিমাণ ও রপ্তানি দেখান হইয়াছে।

		রপ্তানি	
	উৎপন্ন শস্য	চাউল	ধান
চাউল	টন (১০০০)	টন (১০০০)	টন (১০০০)
১৯১৩-১৪	২৮,৮১৯	২,৪২০	৩০
১৯১৮-১৯	২৪,৩৪২	২,০১৮	৩৫
১৯২০-২১	২৮,০৩৩	১,০৬০	৩৫

গম	উৎপন্ন শস্য	রপ্তানি
	টন (১০০০)	টন (১০০০)
১৯১৩-১৪	৮,৩৬৭	১,২০২
১৯১৮-১৯	৭,৫০৭	৪৭৬
১৯২০-২১	৬,৭০৯	২৩৮

দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়

(ক) কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন

অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে হইলে কেবলমাত্র যে কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিতে হইবে তাহা নহে, খাদ্য-শস্যের চাষ যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং উৎপন্ন শস্য যাহাতে বিদেশে রপ্তানি না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যের উন্নতির উপায়,—কৃষিশিক্ষার বিস্তার এবং যৌথ-ঋণদানমণ্ডলী এবং যৌথ-ক্রয়মণ্ডলী স্থাপন করিয়া কৃষকদিগকে কৃষি-রসায়নসম্মত সার এবং উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করিতে সাহায্য করা। যৌথমণ্ডলী স্থাপন করিলে গো-মহিষাদির উন্নতি এবং জীবনবীমা সহজসাধ্য হয়। ঋণদানমণ্ডলীর লাভাংশ হইতে ষণ্ড ক্রয় করা যাইতে পারে, এবং গবাদির জীবন-বীমার জন্য মাসিক চাঁদা লওয়া যাইতে পারে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ হইলে, ঋণদানমণ্ডলী হইতে কৃষকগণ অল্প সুদে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া, আহার্য্যাদি, শস্য-বীজ এবং হাল বলদ ক্রয় করিতে পারে। কৃষিশিক্ষা বিস্তৃত হইলে ব্যয় ও সময়-সংক্ষেপকারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন হইবে, উপযুক্ত সার ব্যবহৃত হইবে, এবং পোকা ও অন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষিত হইবে। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে গ্রামে গ্রামে কৃষিকার্য্যের সমবায়-প্রণালী সহজেই অবলম্বিত হইবে।

বাস্তবিক আমাদের পল্লীগ্রামসমূহে দৈন্য দারিদ্র্য এরূপ গভীর

এবং বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, যে সমস্ত বিষয়েই এক্ষণে সমবেত কার্য্য করা আবশ্যক। গ্রাম্য কৃষিশিক্ষা পরিচালনার জন্য, নদ-নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য, শস্য-সঞ্চয়ের ব্যবস্থার জন্য, নিয়মমত জলসরবরাহের জন্য সমবেতভাবে কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। সব বিষয়েই সমবেত কার্য্য-প্রণালী কল্যাণপ্রদ হইবে। তাহার পর স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে কৃষিকার্য্যের স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। এই জন্য পল্লীগ্রামসমূহে স্বাস্থ্য-রক্ষা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত গ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য জল সরবরাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রেললাইন যেখানে খোলা হইয়াছে, সেখানে বাঁধের নীচ দিয়া যাহাতে জল সহজে যাতায়াত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ছোট রেলগাড়ী (Light Railway) অধিক উপযোগী। তাহাতে যাতায়াত এবং দ্রব্য আমদানি রপ্তানির সুবিধা হয়, অথচ রেল-গাড়ীর ভার অধিক না হওয়াতে বাঁধ নির্ম্মাণ আবশ্যক হয় না। তাহার জন্য রেললাইন জল সরবরাহের ব্যাঘাত করে না। ইউ-রোপের কৃষিপ্রধান দেশসমূহে ছোট রেললাইনগুলি বৈষয়িক উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছে; অথচ জল-সরবরাহের ব্যাঘাত না হওয়াতে নদনদীগুলি ও তাহাদিগের শাখা-প্রশাখাগুলির অবনতি হয় নাই এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি এখনও দেখা যায় নাই। আমাদিগের দেশে কিন্তু পল্লীগ্রামে ছোট রেলগাড়ীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই চিন্তা করেন নাই।

রেলগাড়ী সম্বন্ধে এইস্থলে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, রেললাইনের বিস্তার আমাদের উন্নতির একটি প্রধান লক্ষণ। রেলগাড়ী মনুষ্যের যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি করে সত্য, এবং রেলগাড়ী ভিন্ন বাণিজ্যক্ষেত্রে উন্নতি হওয়া অসম্ভব তাহাও সত্য; কিন্তু রেলগাড়ী যে সকল সুবিধা প্রদান করিয়াছে তাহাদিগের বিনিময়ে আমরা কি হারাইতেছি তাহাও কি একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে? রেলগাড়ী কৃষিক্ষেত্রে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না, উৎপন্ন শস্য লইয়া রেলগাড়ী তাহা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করে মাত্র। গ্রামোৎপন্ন শস্য স্বদেশ অথবা বিদেশের সহরবাসীর আহার্য্য হয়, এই মাত্র। রেলগাড়ী শস্য উৎপন্ন করে না, কৃষকই সমাজের অন্নসংস্থানের ভার লইয়াছে, রেলগাড়ী তাহার বাহন মাত্র। বাহনের কাজ প্রভুকে সেবা করা। কিন্তু বাহন যদি আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত প্রভুর ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে পিষিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সিন্ধুবাদের ভাগ্য এবং চতুরতা না পাইলে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন ঠিক সিন্ধুবাদ নাবিকের দশা হইয়াছে। ইউরোপ আমেরিকার রেললাইন স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে রেলকোম্পানীর নিকট হইতে দেশবাসীরা অনেকগুলি সত্ব আদায় করিয়া লয়। ঐ প্রদেশের শস্যাদি অথবা শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রী অন্য প্রদেশে রপ্তানি করিয়া যাহাতে দেশবাসীরা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য কোম্পানী মাশুল খুব কমাইয়া দেয়। সুতরাং রেলকোম্পানী ঐ প্রদেশের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির

প্রধান সহায় হয়। আমাদের দেশে রেলকোম্পানীগুলি তাহাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত, কোন শিল্পবিশেষকে সুবিধা প্রদান করিবার জন্য মাশুল কমাইয়া দেওয়া তাহাদিগের আলোচনার মধ্যেই আসে না। তাহার পর ইউরোপ আমেরিকার পল্লীগ্রামসমূহে কৃষি এবং শিল্পশিক্ষার বিস্তার হওয়াতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য রপ্তানি হয় না, গ্রামে গ্রামে শস্য-সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও উপযোগী অনুষ্ঠান আছে এবং উপকরণ-শস্য উৎপন্ন হইলেও গ্রামবাসিগণ নিজেরাই কলকারখানা স্থাপন করিয়া তাহা হইতে আপনাদিগের শিল্পশিক্ষার বলে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং রেলগাড়ী সেখানে কৃষককুলের ধনবৃদ্ধির কারণ। আমাদের দেশের কৃষকগণ সেরূপ শিক্ষিত নহে। কাজেই তাহারা রেলগাড়ীর মন্দটুকু লইয়াছে, ভালটুকু লইতে পারে নাই। রেলগাড়ী সে জন্য সভ্যতা নহে দৈন্যের লক্ষণ হইয়াছে। রেললাইনসমুদয় যে দেশের অন্তঃপ্রদেশমুখী না হইয়া বোম্বাই, করাচী, কলিকাতা প্রভৃতি বন্দরের দিকে ছুটিয়াছে, তাহাতেই বোঝা যায়, দেশের রেলগাড়ী শিল্পী ও কৃষকগণের দৈন্য ও বণিকদিগের অর্থলাভের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জর্ম্মাণী, আমেরিকায় রেললাইনগুলা অন্তঃপ্রদেশ-মুখী হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পকর্ম্ম ও অন্তর্বাণিজ্যের উৎসাহ দিয়া থাকে। বাস্তবিক সমগ্র কৃষকসমাজ এক্ষণে বণিকদিগের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আপনার অন্ন পরের হাতে অকুণ্ঠিতচিত্তে তুলিয়া দিতেছে এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া

পরের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইয়া গৌরব বোধ করিতেছে। তাই যখন রেলে যাই তখনই সন্দেহ হয়, আমরা রেলের সঙ্গে শুধুই কি শিক্ষার উন্নতি, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা জাতীয়তা গঠন, এক কথায় কেবল কি সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাইতেছি ; একটা বেদনার সুর,—দৈন্য দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকসমাজের একটা করুণ কাহিনী, তখন কি মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে না ? যখনই এই করুণ সুরটির উদয় হয়, তখন মনে হয়, এই যে রেললাইন ইহা পাথরের উপর নহে, দেশের ত্রিশ কোটি কৃষকের বক্ষের উপর পাতা আছে, আর ঐ যে গুরু গুরু শব্দ তাহা উহাদের

'বুক ফাটা দুখে
গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা।'

তাহা ছাড়া রেললাইন উচ্চ বাঁধের উপর স্থাপিত বলিয়া যত বিস্তৃত হইতেছে, ততই বর্ষার ও বন্যার জলে দেশের স্বাভাবিক প্লাবনের বাধা হইতেছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন মাটির উৎপাদিকাশক্তি কমিতেছে অপর দিকে মশকের বংশবৃদ্ধিও ঘটিতেছে। ডাঃ বেণ্ট্‌লী সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, যদিও সিক্ত নিম্নভূমির সঙ্গে ম্যালেরিয়ার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তথাপি যেখানে জলের অবাধ সরবরাহ সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। তাই সেখানে গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, ও পঞ্জাবের নদ নদীর জল সমগ্র দেশ বন্যায় ভাসাইয়া স্বাভাবিক উপায়ে ভূমির উৎপাদিকা

শক্তি বৃদ্ধি করিত, সেখানে রেললাইন আসিয়া স্বাভাবিক প্লাবন প্রতিরোধ করাতে ম্যালেরিয়া আনিয়াছে ও কৃষির অবস্থা দিন দিন হীন করিয়াছে। বাস্তবিক পশ্চিম ও মধ্য বাংলা ও পূর্ব্ব পশ্চিম পঞ্জাবের ক্রমাবনতির দিকে লক্ষ্য করিলে রেলপথের বিস্তার কি অপ্রত্যাশিত বিপদ আনিয়াছে তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। রেললাইন যতই বিস্তৃত হইতেছে ততই দেশের নদনদীগুলির প্রতি দৃষ্টি আমরা ঘুচাইতেছি। কৃষিপ্রধান দেশে নদনদীগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া কৃষিকার্য্যের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। আমাদের দেশে নদনদীগুলির যেরূপ ক্রমাবনতি লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের শস্যশ্যামল দেশ যদি কোন কালে মরুভূমিতে পরিণত হয় তবে তাহাও আশ্চর্য্য নহে। কৃষি ও সেচের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই রেললাইন বিস্তার করা উচিত। সেচ ও বাণিজ্যের সুবিধা হেতু নদনদী-গুলির উন্নতি সাধন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ড্রেজার বসাইয়া নদীর মোহনার চর কাটিয়া দেওয়া এবং স্থানে স্থানে নদীতীর পাথর দিয়া বাঁধিয়া নদীর গতি নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। দেশের অরণ্যসমূহ ধীরে ধীরে সমূলে বিনষ্ট হইতেছে, ইহা অনাবৃষ্টির একটি প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। অরণ্যসমূহকে রক্ষা করাও কর্ত্তব্য। অরণ্যসমূহ রক্ষিত হইলে দেশে অনাবৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা অধিক হয় না। সুবৃষ্টি হইলে এবং নদনদীগুলি সংস্কৃত হইলে উহারা ম্রিয়মান হইবে না। নদী হইতে খাল কাটিয়া

জল আনা তখন সহজসাধ্য হইবে এবং বৈজ্ঞানিক জলসেচন এবং জল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকগণ অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতে পারিবে। কৃষিকার্য্যের স্থায়ী উন্নতি তখন সম্ভবপর হইবে।

(খ) পাট ইত্যাদি চাষের পরিমাণ হ্রাস

আমাদিগের কৃষকগণ যাহাতে বিদেশীর কারখানার জন্য উপকরণ-শস্য উৎপন্ন করিয়া দেশীয় খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ কমাইয়া না দেয় তাহার জন্য কৃষকদিগের মধ্যে উপকরণ-শস্য চাষের বিষময় ফল সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান আবশ্যক। কৃষকগণ স্বভাবতই নিজেদের ব্যক্তিগত লাভকে কখনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে না; যেখানে ব্যক্তিগত লাভ সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনের পরিপন্থী হয় সেখানে তাহারা নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। উপকরণ-শস্য চাষে তাহাদিগের কিছু নগদ টাকা আসিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাতে সমস্ত দেশবাসীর যে অমঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরন্তু, মানুষ কেবল অর্থ দিয়া বাঁচিতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে যদি অন্নসংস্থান না হয় তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জন বিফল হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, গ্রামবাসিগণের অর্থ আছে অথচ বাজারে চাউল নাই যে, তাহারা অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে পারে।

অতএব পাট ইত্যাদি চাষ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের নিজেদের যে স্বার্থসিদ্ধি হইবেই তাহাও নহে,—পাট বিক্রয় করিয়া একশত টাকা মজুত রাখা অপেক্ষা এক মরাই ধান গৃহস্থের অধিক উপকারী। এই সমস্ত কথা কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক। তবেই উপকরণ-শস্যের চাষ দেশে আর দেখা যাইবে না।

(গ) অবাধ শস্য-রপ্তানির প্রতিরোধ

তাহার পর খাদ্য-শস্য রপ্তানি বন্ধ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দেশে শস্যের ব্যবসায় যাহাতে বণিকদিগের হস্তগত না হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন এ গুরুতর কার্য্যে সফলতা লাভ করা সুকঠিন, এবং শিক্ষিতদিগের ব্যক্তিগত ব্যবসায় দ্বারাও এ কার্য্য সাধিত হইবে না। গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি যৌথভাবে চাউল গম ইত্যাদির ব্যবসায়ে আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া আশা করিতে পারেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে গ্রামে গ্রামে শস্যের আড়ৎ স্থাপন করিতে হইবে। বিভিন্ন গ্রামের শস্য-আড়ৎগুলি পরস্পরকে শস্য আদান-প্রদান-ব্যাপারে সাহায্য করিবে, এবং জেলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে

একটি কেন্দ্র-শস্য-আড়ৎ থাকিবে। জেলার বিচক্ষণ ব্যবসায়িগণ ঐ কেন্দ্র-আড়ৎ পরিচালনের ভার লইবেন, এবং ঐ জেলার কোন গ্রামে খাদ্য শস্যের মূল্য সাধারণ অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ গ্রামে শস্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক জেলাতেই কেন্দ্র-শস্য-আড়ৎ থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে জেলায় জেলায় শস্যের আদান প্রদান চলিবে, কিন্তু কখনও বিদেশে রপ্তানির জন্য শস্যের ক্রয় বিক্রয় হইবে না।

ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যের অনুপযোগিতা

অনেকে বলেন, বাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, অথবা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিলে কুফল অবশ্যম্ভাবী; বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং প্রশস্ত পন্থা স্বভাবতঃই অনুসরণ করে এবং ঐ পথ যদি রুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে উহা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। জর্ম্মাণী এবং আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের বৈষয়িক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি কেবলমাত্র তাহাদিগের স্বাভাবিক গতির উপর নির্ভর করে না। জর্ম্মাণী এবং আমেরিকায় রাষ্ট্র, ব্যবসায় বাণিজ্যকে আপনার নিজের শক্তির দ্বারা রক্ষা ও পালন করিয়াছিল, এই কারণে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সেখানে এত উন্নতি। বাস্তবিক ব্যবসা ও বাণিজ্যকে অবাধে

আপনাদের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে অনেক সময়েই শ্রেয় নহে। ভারতবর্ষে ব্যবসার ক্ষেত্রে রক্ষণ ও পালননীতি অবলম্বনের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহুকাল হইতে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে; কিন্তু বাণিজ্য-ক্ষেত্রে রক্ষণনীতি অবলম্বন সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা হয় নাই। খাদ্য-শস্যের অবাধ রপ্তানি কোন দেশেরই পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিজাত সামগ্রীর বিনিময়ে ভারতবর্ষ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার আমদানি করিয়া থাকে। যদি দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় তাহা হইলে তাহার বিনিময়ে স্বদেশের শস্য রপ্তানি করিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু ভারত-বর্ষের বহির্বাণিজ্যের আমদানি-দ্রব্যসমূহের তালিকা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ভারতবর্ষ বাণিজ্য অথবা দ্রব্য বিনিময়ে লাভ করা দূরে থাক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যে সমস্ত দ্রব্যের অভাবে কোন দেশ অত্যাবশ্যক আহার্য্য পরিচ্ছদাদি হইতে বঞ্চিত হয়, সে সকল দ্রব্যের রপ্তানি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাই আহারের বিনিময়ে আমদানি হউক না কেন, বিদেশ হইতে ত জীবন ফিরিয়া আসিবে না! আবশ্যকীয় আহার্য্যাদি রপ্তানি করিয়া যদি সমাজ অন্নকষ্টে জর্জ্জরিত এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে তাহা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত ধনবৃদ্ধি হইলেও সে ধন কে ভোগ করিবে?

বাণিজ্যের ডাকিনী মূর্ত্তি

এজন্য এক্ষেত্রে বাণিজ্য ধনবৃদ্ধির কারণ হইলেও ডাকিনীর মত প্রলোভন দেখাইয়া একদিকে যেমন সমাজকে একবারে মোহান্ধ করিয়া ফেলে অপর দিকে পলে পলে তাহার রক্ত শোষণ করিয়া লয় ; অথচ সমাজ তাহা অনুভব করিতে পারে না। বাণিজ্যের রূপ মাতৃমূর্ত্তি, দানবীর রূপ নহে। বাণিজ্য সমাজ-শিশুকে তাহার স্তন্যপিযূষ পান করাইয়া আপনার বক্ষে সতত ধারণ করিয়া সস্নেহে পোষণ করে। বাণিজ্য রক্ত দান করিয়া পুষ্ট করে, শোষণ করিয়া হত্যা করে না। আমরা বাণিজ্যের মাতৃমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ডাকিনীর রূপকে সমাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এবং পলে পলে ঐ ডাকিনীর কুহকে পড়িয়া আপনাদিগের জীবন বলিপ্রদান করিতেছি।

বাণিজ্যক্ষেত্রে অপরিণামদর্শিতা

যতদিন না আমাদের এই মোহ দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে বহির্বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু অতীত ইতিহাসে ভারতীয় বাণিজ্য-সামগ্রী নিত্যপ্রয়োজনীয় শস্যাদি ছিল না। কার্পাস, রেশম কাপড়, মসলা, মস্‌লিন, হীরক প্রভৃতি তখন বিদেশে রপ্তানি হইত। অতীতকালে নিজ অন্ন পরকে বিলাইয়া দিয়া ভারত

ক্ষুধার তীব্র যাতনা অনুভব করিত না ; ভারতবাসিগণ নিজেদের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া উদ্বৃত্ত ভোগ-বিলাসের সামগ্রী বিদেশে প্রেরণ করিত এবং তাহার বিনিময়ে প্রত্যেক বৎসর অজস্র পরিমাণে স্বর্ণ আমদানি করিত।

সর্ব্বপ্রথমে কৃষিশিল্প-ব্যবসায় দ্বারা আভ্যন্তরিক অভাব মোচন, তাহার পর বিলাসভোগ এবং অবশেষে বাণিজ্যের দ্বারা উদ্বৃত্ত বিলাসসামগ্রীর বিনিময়ে স্বর্ণাদি ধাতুর আমদানি করিয়া ধন-সঞ্চয়ের উপায় করা—ইহাই পূর্ব্বের ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে ভারতীয় বাণিজ্য বিপরীত পন্থা অনুসন্ধান করিতেছে। স্বদেশের নিত্য অভাব মোচিত না হইয়া ভারতীয় শস্যাদি বিদেশে প্রেরিত হইতেছে এবং তাহার বিনিময়ে বিলাসসামগ্রী অত্যধিক পরিমাণে আমদানি হইতেছে। বিলাসসামগ্রীর আমদানি এবং খাদ্যশস্যের রপ্তানি একদিকে অন্নকষ্ট অপরদিকে শ্রমজীবিগণের জীবিকার্জ্জনের জন্য বিদেশ গমনের কারণ হইয়াছে। অসংখ্য ভারতবাসী বৎসর বৎসর আফ্রিকা আমেরিকা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জীবিকার সন্ধানে যাত্রা করিতেছে। অন্নাভাবে রোগাধিক্য হেতু সমাজের একদিকে শক্তিহ্রাস এবং বিদেশ যাত্রা হেতু অপরদিকে শক্তিনাশ হইতে চলিয়াছে। এরূপে সমাজ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা যে বিশেষ মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার ফল যে ভারতবর্ষ এক্ষণে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিতেছে তাহা বলিতে হইবে না।

প্রতিকার

ব্যবসায় ও বাণিজ্যক্ষেত্রে এক্ষণে গভীর চিন্তা, ধীর এবং সংযত ভাবে অভাব বিশ্লেষণ এবং পরিণামদর্শিতার সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আর প্রয়োজন হইয়াছে,—কেবল অভাববোধ নহে, অভাব-মোচনের জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, সমবেত উদ্যোগ, অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষি ও শিল্পকর্ম্মে সমবায়

আমাদিগের কৃষক এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে সমবায়-অনুষ্ঠান ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। সমবেত দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ করিলে অনেক সুবিধা আছে। প্রত্যেক ঋণের দায়িত্ব যদি কয়েকজন বন্ধু মিলিত ভাবে ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে ঋণ-দাতা মহাজনগণের অর্থনাশের কোন আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং সুদের হার কমিয়া যায়। এই উপায় অবলম্বন করিলে প্রত্যেক ১০০৲ ঋণের সুদ গড়ে অন্যূন ১০৲ কমিতে দেখা গিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে সমবায়-সমিতিগুলি ৭৫০ লাখ টাকা ধার দিয়াছে। সমবায়-প্রথায় ঋণ গ্রহণ করায় কৃষক এবং শ্রমজীবিগণের আনু-মানিক ৩০ লাখ টাকা সুদ ভার কমিয়াছে।

বাঙ্গালাদেশের সমবায়-সমিতির সংখ্যা ৫৪০৮ এবং সভ্য-গণের সংখ্যা ২,১৭,১৭৫। সমগ্র ভারতবর্ষে সমবায়-সমিতির সংখ্যা ৪০,৭৭২, ভারতীয় সমিতিসমূহের সভ্যগণের সংখ্যা এখন ১৫,২১,১৬৮ এবং মূলধন ২১.৫ কোটী টাকা হইয়াছে।

সমবেত-ঋণদান-সমিতি গঠনের অনেক আনুসঙ্গিক উপকার আছে। সমবায়-সমিতির সভ্যেরা তাহাদিগের গৃহীত অর্থ অসৎ

পথে ব্যয় করিতে পারে না। তাহার জন্য তাহাদিগের কার্য্যের প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকে। অনেক স্থলে কৃষিকার্য্য অথবা শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্য ব্যতীত ঋণ দেওয়াই হয় না। যে স্থলে শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ঋণ দেওয়া হয়, সে স্থলে ঐ সমস্ত কার্য্যে কত অর্থ ব্যয় করা উচিত সভ্যেরা তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এরূপে সামাজিক বিষয়েও সমবায়-সমিতির বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। সমিতির কোন সভ্য সমিতির পরামর্শ না লইয়া মোকদ্দমা করে না, এরূপে অনেক মোকদ্দমা সভ্যেরা নিজেরাই নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। এক বৎসর কেবলমাত্র একটি জেলায় ১১০০ দেওয়ানী মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছিল। জলাশয় খনন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, স্বাস্থ্যোন্নতি, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতিতে ও সমবায়-সমিতি বিশেষ সহায়তা করে। বাস্তবিক পক্ষে সমবায়-সমিতিগুলি পল্লীজীবনে একটি নূতন স্রোত আনিয়া দিতেছে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দবর্দ্ধন এবং দশের উন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টার সূচনা দেখা গিয়াছে,—বোধ হয় আমাদিগের গ্রামগুলি এই উপায়ে নূতন জীবন লাভ করিবে।

যে সকল জেলায় অনেকগুলি সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে কেন্দ্র-সমবায়-সভারও সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্র-সভাগুলি সমিতিসমূহের তত্ত্বাবধান এবং তাহাদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহের ভার লয়। বাঙ্গালা দেশে এইরূপে অনেকগুলি কেন্দ্র-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—(ক) পূর্ব্ববঙ্গ কেন্দ্র-সভা, (খ) বেলবেড়া কেন্দ্রসভা, মেদিনীপুর (গ) রাকুলী কেন্দ্রসভা, খুলনা (ঘ) কালিম-

পঙ্গ কেন্দ্রসভা (ঙ) রামপুরহাট কেন্দ্রসভা, বীরভূম (চ) টাকি কেন্দ্রসভা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত পাবনা এবং সদরপুরে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বাবধায়ক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে—(ক) গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে (খ) কেন্দ্রসভা এবং সহরের সমবায়-সমিতি হইতে (গ) সভ্যেরা নিজেরা সমিতিতে স্বকীয় সঞ্চিত অর্থ প্রদান করে। বাঙ্গালাদেশে গ্রাম্য সমিতিগুলির মোট মূলধন ১,১১,১২,৩৬৬ টাকা।

নবম অধ্যায়

সমবায়-সমাজ

সমাজ-সেবাপ্রণালী

বাংলা দেশে এক্ষণে পল্লীগ্রাম-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীগ্রামের দুঃখ দারিদ্র্য এবং অসংখ্য অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে আমাদের সমাজ বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বহুসংখ্যক যুবক নানা স্থানে বিভিন্ন উপায়ে পল্লীবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের নীরব সাধনা আমাদের জাতীয় জীবনকে কি পরিমাণে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে, তাহা আমাদের দেশের খুব কম লোকই ভাবিয়া দেখেন। দেশে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কার্য্যপ্রণালীর বিভিন্নতাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, সমাজের সমস্ত শক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত না হইলে এখন দেশে কোন কার্য্যই সফল হইবে না। দেশের শক্তি অল্প, এমন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেশের মঙ্গলবিধান করিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত

নহে, একটি মাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ণয় করিয়া সেই পন্থাতেই সমাজের সমস্ত শক্তিকে চালনা করিতে হইবে, তবেই গন্তব্য স্থানে শীঘ্রই পৌছান যাইবে।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" বলিয়া একটি মাত্র পথ অনুসরণের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের কথা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। কিন্তু আমাদের সমাজ এখনও এরূপ একটি ভাবে বিভোর হয় নাই, উহার গঠনশক্তি এরূপ বৃদ্ধি পায় নাই, যাহাতে আমাদের সমগ্র চিন্তা ভাবনা কেবলমাত্র একটি সুমহান্ আদর্শ স্ফুরণের ইন্ধন যোগাইতে পারে, এবং সমস্ত কার্য্যপ্রণালী একই পবিত্র হোমানল-শিখা প্রদীপ্ত রাখিবার জন্য উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। এখন আকাঙ্ক্ষার প্রথম জাগরণ, এখন কর্ম্মপ্রণালী ও কর্ম্মশক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের অধিক প্রয়োজন নাই। কর্ম্মপ্রণালী যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে, কর্ম্মশক্তিও অতি ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে লজ্জা জন্মিবার কোন কারণ নাই। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সমগ্র সমাজব্যাপী কর্ম্মশক্তির যাহাতে উদ্রেক হয়, বিচিত্র অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহাতে সমাজের আকাঙ্ক্ষা বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহাই এখন দেখিবার বিষয়। সমস্ত কর্ম্মপ্রণালী যে একমুখী বা পরস্পর সুসম্বদ্ধ হয় নাই, তাহাতে আমাদের নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই।

কিন্তু এখন হইতেই আমাদিগকে ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে হইবে। বিভিন্ন স্থানের কর্ম্মপ্রণালী যাহাতে এক বিপুল অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে এবং এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত

হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে শক্তি-সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত না হইলে আমরা শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখি না, ফলেরও বিশিষ্ট পরিচয় পাই না। কোন স্থান-বিশেষে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, একটি মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিভিন্ন শক্তিকে সেই আদর্শ অনুসারে চালনা করিতে হইবে; এইরূপে সমস্ত শক্তি এক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে, আমরা শীঘ্রই শক্তির পরিচয় পাইব। আমাদের দেশে নানা স্থানে ক্ষুধিত এবং আতুরদিগের সেবা, দীন দুঃখীর প্রতিপালন, অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, শ্রমজীবিদিগকে শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সকল কার্য্য নিত্য নিয়মিত নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার ফলে আমরা আমাদিগের স্বকীয় শক্তি ধীরে ধীরে অনুভব করিতেছি, আমাদের আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস এবং সমাজ-সেবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ইহাতে যে সমাজের বিশেষ পরিমাণে স্থায়ী উন্নতি সাধিত হয় নাই তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইজন্য আমাদের কর্ম্মীগণ যাহাতে সমাজ-শক্তির প্রয়োগের সুফল শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে সেই উপায়ই উদ্ভাবন করিতে হইবে।

পল্লী-জীবনের অবনতি

আমাদের সমাজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে হইলে পল্লী-গ্রামে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, কারণ আমাদের জীবন পল্লীগ্রাম লইয়াই। দেশের শতকরা নব্বুই জন এখনও পল্লীগ্রামে বাস করিতেছে, দুঃখের বিষয় তবুও আমাদের শিক্ষা বা সামাজিক যাহা কিছু আন্দোলন হইয়াছে তাহা কয়েকটি সহরে আবদ্ধ রহিয়াছে। দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আপনাদের ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়াছেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন তাঁহারা স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় হারাইয়া ক্রমশঃ হীনতেজ হইয়া পড়িতেছেন, অপরদিকে পল্লীবাসীরাও তাঁহাদের সাহচর্য্য এবং সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছে। কয়েকটি সহর খুব স্ফীত হইয়া উঠিতেছে,—সহরের স্ফীতদেহ স্বাস্থ্য নহে,—ব্যাধিরই চিহ্ন। সহরগুলি স্বাধীন ব্যবসায়ের বা জীবিকানির্ব্বাহের কর্ম্মভূমি না হইয়া চাকরীস্থান হইয়াছে। চাকরীর সংখ্যা বা মাহিয়ানা বৃদ্ধি পাইতেছে না, অথচ দেশময় মূল্যাধিক্য, বিশেষতঃ সহরের আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য বিভিন্ন কারণে এত অধিক হইয়াছে যে, সংসারের ব্যয়-সঙ্কুলন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্তদিগের আয় কমিয়া গিয়াছে অথচ মাহিয়ানা বৃদ্ধির বিশেষ আশা নাই। উপরন্তু তাঁহাদিগের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয় এবং অন্যান্য

আনুষঙ্গিক ব্যয়ও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সুতরাং তাঁহাদিগের অবস্থা ক্রমশঃ বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের উচ্চজাতিসমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে তাহার কারণ মধ্যবিত্তেরা দারিদ্র্য হেতু আধুনিক চালচলন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। অথচ তাঁহাদিগকে গ্রামের স্বাধীন জীবিকা এবং নির্দ্দিষ্ট আয় ত্যাগ করিয়া সহরেই যাইতে হইবে। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান এবং সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন ;সুতরাং পল্লীজীবনে বিদ্যাচর্চ্চা, কথকতা, যাত্রা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির আদর কমিয়া গিয়েছে ; গ্রামে দলাদলির ভাব প্রবল হইতেছে, গ্রামের মণ্ডল মোকদ্দমা মিটাইয়া দিতে পারিতেছে না। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সহকারিতার অভাব দেখা গিয়াছে। গ্রামে জল সরবরাহ বন্ধ হইতেছে কিন্তু ইহার প্রতিকার হইতেছে না। গ্রামের পথঘাট অমার্জ্জিত এবং অপরিস্কৃত, পুষ্করিণীসমূহ অসংস্কৃত। গ্রামবাসীগণ স্বাবলম্বন হারাইতেছে। গ্রাম বনজঙ্গলময় হইতেছে, বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে না। ম্যালেরিয়া, বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে, গ্রাম্য শিল্পসমূহ ইউরোপের কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগিতায় অপারগ হইয়া বিধ্বস্ত হইতেছে। গ্রামের যাহা কিছু মূলধন তাহার দ্বারা বিদেশে শস্যরপ্তানির সুবিধা হইয়াছে। শস্য ব্যবসায় ক্রমশঃ বিদেশী বণিকদিগের হস্তগত হওয়ায় গ্রামে অন্নাভাব থাকিলেও শস্য রপ্তানি হইতেছে।

পল্লীগ্রামের বৈষয়িক জীবন এখন কেবলমাত্র বিদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতেছে, পল্লীগ্রামের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক জীবন আর নাই। কোন্ দূর শতাব্দী হইতে পল্লীগ্রামের উপর দিয়া যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল তাহা এখন অবরুদ্ধ হইয়াছে, যুগযুগান্তকালের সমস্ত চিন্তা এবং সাধনা এখন লুপ্তপ্রায়, জাতীয় জীবন এখন কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে, অতীতকালের সাধনা হইতে বিচ্যুত হইয়া বিদেশী সভ্যতার জন্মস্থানে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রাণ যেখানে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা এখন পরিত্যক্ত। পল্লীগ্রামের দেউল এখন ভগ্ন, অসংস্কৃত এবং দেবতাশূন্য। পল্লী-দেবতার আরাধনার সহিত আমাদের পল্লীগতপ্রাণ জাতীয় সাধনারও লোপ হইতেছে।

পল্লী-সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা

সমাজের এখন পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভগ্ন দেউল সংস্কৃত করিয়া পুনরায় সেখানে দেবতা বসাইতে হইবে। জাতীয় সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্রসমূহের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এ তীর্থের রক্ষক এবং পূজারী কাঁহারা হইবেন?—যাঁহারা দেবতার কবচ পরিধান করিয়া মস্তকে দারিদ্র্য-কিরীট ধারণ করিয়া জাতীয় সাধনা জাগ্রত করিবার জন্য নির্জ্জনে লোক-চক্ষুর অন্তরালে পল্লীবাসী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের

মধ্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিবেন ; আপনাদিগকে বিশ্ব-নিয়ন্তার যন্ত্রী অনুভব করিয়া যাঁহাদের শক্তি অদম্য এবং অসীম হইবে এবং যাঁহাদের প্রত্যেক সেবাকার্য্য ও অনুষ্ঠান দীনবন্ধুর চরণপূজারূপে উপলব্ধি হইবে ; অনন্ত কর্ম্ম-স্রোতের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিবেন অথচ কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে যাঁহাদের অনন্তের নিবিড় উপলব্ধির কোন ব্যাঘাত হইবে না ; একদিকে যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ এবং অপর দিকে কর্ম্মনিষ্ঠ, একদিকে জ্ঞানী অপরদিকে বিষয়াভিজ্ঞ অক্লান্ত কর্ম্মী,—তাঁহারাই আমাদের পল্লীগ্রামের জাতির অন্তরতম প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন।

উদ্দেশ্য

সমাজের শ্রমজীবি-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইঁহারা কোন্ কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিবেন তাহাই এখন আলোচ্য। কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি হয়। পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীগণকে স্বাবলম্বন শিখাইতে হইবে। নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীগণ পরস্পরের খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব পূরণ করিবে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কৃষি-ব্যবসায়ের এবং বাণিজ্যের ধুরন্ধর এবং শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। বাণিজ্য-ব্যবসায় যাহাতে পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনের

জন্যই প্রবর্ত্তিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন, এবং শিক্ষা যাহাতে পল্লীবাসীগণের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হয়, তাহারও উপায় বিধান করিবেন। গ্রাম্য শিল্পকলা, সাহিত্য, আচারব্যবহার, আমোদপ্রমোদ এবং ক্রিয়াকর্ম্ম যাহাতে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের চিন্তা-জীবন এইরূপে স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারিবে। পল্লীগ্রামের সমস্ত অভাব পল্লীগ্রামবাসীদের দ্বারাই পূরণ করিতে হইবে। একদিকে ইহাতে যেমন পল্লীবাসীদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইবে অপরদিকে তাহারা নিজ নিজ অভাব মোচন করিয়া আনন্দ এবং সুখলাভ করিতে পারিবে। বিশ্বজগতের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান উহাদের উপঢৌকন লইয়া পল্লীবাসীর নিকট উপস্থিত হইবে। দেশের যে সমস্ত ধনসম্পদ এবং বিদ্যাগৌরব এখন কেবল মাত্র সহরেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে, তাহা এক্ষণে সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত হইবে। ইহার ফলে সমগ্র সমাজের বিদ্যোন্নতি এবং আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে।

কর্ম্মকেন্দ্র—পল্লী-ভাণ্ডার

এ কার্য্য সফল করিবার জন্য ধীর আয়োজন চাই। ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতে ধীরে ধীরে বৃহৎ অনুষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। কি উপায়ে গ্রামে গ্রামে এরূপ কার্য্যের সূচনা হইবে তাহা এক্ষণে

সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই প্রকার কার্য্যারম্ভ কিয়ৎ পরিমাণে দেখা গিয়াছে।

প্রথমে পল্লীবাসিগণের দৈনন্দিন অভাব মোচন করিবার জন্য গ্রামে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। সমস্ত গ্রামবাসী অথবা গ্রামের কোন হিতৈষী ব্যক্তি কিছু টাকা তুলিয়া গ্রামে পঞ্চায়ৎগণের হস্তে উহা অর্পণ করিবে। পঞ্চায়ৎগণ ঐ অর্থ লইয়া বস্ত্র, চিনি, লবণ, ঘৃত প্রভৃতি নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিবে। যেখানে যে দ্রব্য অতি সুবিধা দরে পাওয়া যাইবে সেই স্থান হইতে উহা ক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে। দ্রব্যসমূহ পাইকারীদরে বিক্রয় করা হইবে। গ্রামবাসীদিগের নিজেদেরই দোকান বলিয়া তাহারা সকলেই সময়ে সময়ে উহার তত্ত্বাবধান করিবে। দোকান-দারেরা সচরাচর খুচরা দরে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে লাভ করিয়া থাকে সেই লাভ দোকানের মুলধনে পরিণত হইবে, শেষে গ্রাম-বাসী খরিদদারগণের মধ্যে উহা বিতরিত হইবে।

ভাণ্ডার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিল্প-কৃষি-কার্য্য

এই ভাণ্ডারে বিক্রয় খুব অধিক হইলে পঞ্চায়ৎগণ শিল্পী নিযুক্ত করিয়া দ্রব্য প্রস্তুতকরণের ভারও গ্রহণ করিবে। তখন অন্য কোন সহর বা বাজার হইতে দ্রব্য আমদানি করিতে হইবে না, অথচ গ্রাম্য শিল্পসমূহেরও উৎসাহ দেওয়া হইবে। গ্রামের তাঁতি ও কামার গ্রামের ভাণ্ডারেই তাহাদিগের নির্ম্মিত দ্রব্য

পাঠাইয়া দিবে এবং ভাণ্ডার হইতে উহাদিগের আহার্য্য ও বস্ত্রাদি পাইবে। গ্রামের কৃষকগণ ভাণ্ডার হইতে মূলধন কর্জ্জ লইবে। ঐ মূলধনে তাহাদের কৃষিকার্য্য চলিতে থাকিবে। কৃষকগণ সমবেত হইয়া কর্জ্জ লইবে, প্রত্যেক কৃষক অন্য কৃষকের কর্জ্জের জন্য ভাণ্ডারের নিকট দায়ী থাকিবে। ইহার ফলে সকলেই সকলের কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবে, ভাণ্ডার হইতে কৃষক যে মূলধন লইবে তাহার যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় উহা প্রত্যেককেই দেখিতে হইবে। একজন কৃষকের জন্য অপর সমস্ত কৃষক দায়ী থাকে বলিয়া মূলধন নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না, ইহার ফলে কর্জ্জের সুদ খুব অল্প হইবে।

ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে কর্জ্জ দিবার জন্য এই প্রকার অনেকগুলি ঋণ-দান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০৪ সনে এ দেশে ঋণ-দান-সমিতির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত তালিকা পড়িলে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি আমরা বুঝিতে পারিব,—

বৎসর	সমবায় সমিতির সংখ্যা	সভ্য
১৯০৬	৮৪৬	৯১,৩৯৩
১৯১৪	১২,৩২৪	৫,৭৩,৫৩৬
১৯২০	৪০,৭৭২	১৫,২১,১৪৮

অধিকাংশ সমবায়-সমিতিগুলিই ঋণদান-সমিতি। জর্ম্মাণীতে স্বদেশবাসী দরিদ্র কৃষকগণের দারিদ্র মোচনের উদ্দেশ্যে রাইফেজেন যে যৌথ-ঋণ-দান-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন উহাই

এ দেশে সমবায়-আন্দোলনের সূচনাকালে গবর্ণমেণ্ট অনুকরণ করিয়াছিলেন। রাইফেজেনের পদ্ধতি গবর্ণমেণ্ট এখন অন্ধভাবে অনুকরণ করিতেছেন। এই কারণে ঋণদান-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষকগণ ঋণ গ্রহণে সুবিধা পাইলেই যে উন্নতি লাভ করিবে তাহা নহে। তাহাদের কৃষিকার্য্যের যদি উন্নতি না হয় এবং তাহারা যদি উৎপন্ন শস্য যথোচিত মূল্যে বিক্রয় না করিতে পারে তাহা হইলে কৃষকগণের স্থায়ী উন্নতি হওয়া অসম্ভব। এ কারণে জর্ম্মাণীতে রাইফেজেন কৃষকদিগকে কর্জ্জগ্রহণের সুবিধা দান করিয়া দিয়াই সন্তুষ্ট না থাকিয়া উৎকৃষ্ট শস্যের বীজ এবং শস্যোৎপাদনের জন্য সার এবং যন্ত্রাদি সংগ্রহ এবং শস্যবিক্রয়েরও সুবিধা দান করিয়াছেন। রাইফেজেনের পর ডাক্তার হাস নানা প্রকার যৌথ-ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। শুধু জর্ম্মাণীতে নহে, ইউরোপের অন্য প্রদেশেও যৌথ-ঋণদানের সহিত যৌথ-ক্রয়েরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইবে :—

	যৌথ-ঋণদান	যৌথ-ক্রয়	অন্যপ্রকার যৌথ-দ্রব্যোৎপাদন
১। জর্ম্মণী	১৮৫০	১৮৬০	
২। ডেনমার্ক	—	১৮৬৬	
৩। আয়ারল্যাণ্ড	১৮৯৫	১৮৯০	
৪। ইংলণ্ড	—	১৯০০	
৫। সুইট্জারল্যাণ্ড	১৮৯০	১৮৮৬	

	যৌথ-ঋণদান	যৌথ-ক্রয়	অন্যপ্রকার যৌথ-দ্রব্যোৎপাদন
৬। ফ্রান্স	১৮৮৫	১৮৮৪	
৭। বেলজিয়াম	১৮৯২	১৮৯৪	
৮। ইতালী	১৮৬৫	১৮৮৪	

ইউরোপের সমস্ত প্রদেশেই সমবায়-সমিতি কৃষকগণকে যেরূপ ঋণ গ্রহণের সুবিধা প্রদান করিয়াছে, সেইরূপ তাহাদের জন্য পাইকারী দরে বীজ, সার এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়া কৃষিকার্য্যের বিপুল উন্নতির সহায় হইয়াছে। যে সমস্ত যন্ত্রের মুল্য খুব অধিক সেগুলি কৃষকেরা ক্রয় করিতে পারে না; কিন্তু কোন এক গ্রামের সমস্ত কৃষক সমবেত হইয়া ঐগুলি ক্রয় করিতে পারে এবং পরে সময়মত কৃষকেরাই আবশ্যক মত ব্যবহার করিতে পারে। আমাদের দেশে ঋণদান-সমিতি-গুলির দ্বারা যে কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হইতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু কৃষকগণ কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করিয়া কি ফল লাভ করিবে? মহাজনদিগের নির্য্যাতন এবং অত্যাচার হইতে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিবে সত্য, কিন্তু তাহারা এখনও ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। উপরন্তু শস্যোৎপাদন কার্য্যে কোন উন্নতি না হওয়াতে এবং অধিকাংশ স্থলে ব্যাপারী এবং পাইকারগণের নিকট অতি সুলভ দরে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়াতে তাহাদের দারিদ্র্যের অবসান হইবে না। আমাদের দেশে শস্যোৎপাদনের জন্য বীজ,

সার প্রভৃতি কৃষকেরা প্রায়ই ক্রয় করে না; উপযুক্ত বীজ এবং সার ব্যবহারের উপকারিতা কৃষকেরা এখনও বুঝে নাই। তাহারা এই সমস্ত দ্রব্য অজ্ঞ অথবা প্রবঞ্চক দোকানদারদের নিকট হইতে ক্রয় করাতে তাহাদের পরিশ্রম সফল হয় না। অধিকন্তু শস্যোৎপাদন করিয়া তাহারা যে মূল্যে শস্য বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে শস্যের বাজার-মুল্য এবং যে মূল্যে পাইকারগণ শস্য বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়া থাকে উহা বুঝা যাইবে। অধিকাংশ স্থলেই কৃষকেরা দাদন পাইয়া থাকে, এ জন্য উহাদের ক্ষতি আরো বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

শস্য	দাদন	বাজার-মূল্য
একমণ		
পাট	৫॥০	৯৲
বুট	৫৲	৭৲
তিসি	১॥০	২॥০

সুতরাং সমবেত প্রণালীতে কেবলমাত্র কর্জ্জ গ্রহণ করিলেই যে কৃষকদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে তাহা নহে, শস্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত না থাকাতে কৃষকদিগের অবস্থা কখনই উন্নত হইবে না। গভর্ণমেণ্ট এ কথা না বুঝিলে সমবায়-আন্দোলনের দ্বারা আমাদের কৃষকগণের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র ঋণদানের সুযোগ প্রদান করিলে

নির্ধনতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দেশে এখন ধনবৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, শুধু কর্জ্জগ্রহণের সুবিধা সৃষ্টি করিলেই কৃষকদিগের অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হইবে না, সমবেত প্রণালীতে শস্য বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা দেশে শস্য-বিক্রয়-সমিতির সংখ্যা মাত্র ১১-টি। ইহাদিগের মধ্যে খেপুপাড়ার গোলাটি খুব সুন্দর কাজ করিতেছে, এবং হাটের মূল্যের উপর ইহার প্রভাবও লক্ষিত হইতেছে। ইহার সভ্য সংখ্যা এখন ৩০০০; ১৮ হাজার টাকা দিয়া একটি গোলা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে চাউল ধরিয়া রাখার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নৌগাঁর সমিতি দালালদিগের লুট বন্ধ করিয়া গাঁজা বিক্রয়ে তিন লক্ষ টাকা ১৯১৮-১৯ সালে লাভ করিয়াছিল। ঐ সমিতির সভ্যের সংখ্যা এখন ২,৯৭৫। বাস্তবিক বাজারের উচ্চ মূল্যের সুবিধা লইয়া ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা সমবেত প্রণালীতে করিলে অনেক সুবিধা।

যৌথ-ক্রয়-বিক্রয়

আমরা যে প্রকার সমবায় প্রতিষ্ঠার এক্ষণে আলোচনা করিতেছি উহাতে সমবায়-ভাণ্ডার কেবলমাত্র কৃষকগণকে কর্জ্জ দান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না। ভাণ্ডার কৃষকগণকে বীজ, যন্ত্র, সারাদি দান করিবে এবং উৎপন্ন শস্য বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিবে।

পল্লীগ্রামের শিক্ষা ও জীবিকা

গ্রামের সমবায়-পরিষৎ পল্লীবাসীদের শিক্ষার ভারও লইবেন। নৈশবিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীদের অধুনিক ব্যবসায়-বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারের সহিত পরিচিত করাইবেন। বিশেষতঃ যে কৃষি এবং ব্যবসায়-বিজ্ঞানের দ্বারা পল্লীগ্রামে অর্থাগমের উপায় হইবে, উহাদের আলোচনা হইবে। পল্লী-পরিষৎ কৃষি-উদ্যানে নানাবিধ শস্য লইয়া বিবিধ সার এবং যন্ত্রাদির প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিবে। প্রদর্শনী খুলিয়া নূতন সার অথবা নূতন যন্ত্রের প্রচলনের জন্য উৎসাহ প্রদান করিবে। এরূপে নূতন নূতন শস্য, সার এবং যন্ত্র কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। সমবায়-ভাণ্ডারের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, কর্জ্জদান অথবা শস্য-ব্যবসায়ে যাহা লাভ হইবে, তাহা হইতেই উক্ত অনুষ্ঠানগুলির ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। অধিকন্তু বৈষয়িক অনুষ্ঠান ব্যতীত নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিও পল্লী-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

বিজ্ঞান-প্রচার ও নূতন ব্যবসায় প্রবর্ত্তন

এরূপে গ্রামবাসীরাই গ্রামের শিক্ষা, দীক্ষা, বৈষয়িক এবং নৈতিক উন্নতির ভার গ্রহণ করিলে এক একটি গ্রাম স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিবে। গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কত প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যে আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে

অসমর্থ হইয়াছেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া জগতের সম্মুখে তাঁহাদের প্রতিভা জ্ঞাপন করিবেন। গ্রামের কৃষি-বিদ্যালয়ে বীজ ও সার লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে একজন কৃষক হয় ত কোন নূতন আবিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য্য সহজ করিয়া দিবে। কোন শিল্পী আপনার সামান্য কুটীরে বসিয়া অভিনব যন্ত্র অথবা কর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কার করিবে। ভদ্রসমাজের মধ্যে যাঁহারা এক্ষণে চাকুরীর আশায় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিতেছেন তাঁহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিবার আর কোন কারণ পাইবেন না। গ্রামেই তখন বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে, নূতন নূতন ব্যবসায়ও প্রবর্ত্তিত হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কলিকাতায় বসিয়াই বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতেছেন, দেশের মাটী হইতে তাঁহাদিগের গবেষণা দেশের বিশেষ উপকারে লাগিতেছে না, অপরদিকে দেশবাসীরাও তাঁহাদিগকে আপনাদের করিয়া লইতে পারিতেছে না, তাঁহারা ইহাদের নিকট অপরিচিতই থাকিয়া যাইতেছেন। বিজ্ঞান যখন পল্লীতে পল্লীতে, কুটীরে কুটীরে আলোচিত হইবে, যখন প্রত্যেক গ্রামই তাহার বিজ্ঞানাগারের জন্য গৌরব অনুভব করিবে যখন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কৃষক এবং শ্রমজীবিগণের নিকট অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়রূপে পরিণত হইবে, তখন উহা মস্তিষ্কের একটা নীরস ধারণামাত্র না থাকিয়া জীবন্ত সত্যরূপে গৃহীত হইবে, দৈনন্দিন জীবনের সহিত উহার নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিজ্ঞানকে আপনার করিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিকগণকে তখন প্রকৃত সম্মান করিতে শিখিবে।

মধ্যবিত্তদিগের অন্ন-সংস্থান

বৈজ্ঞানিকগণ হাতে কলমে কাজ করিয়া দেশের প্রাকৃতিক শক্তি এবং দ্রব্যাদির যথোচিত ব্যবহার করিতে শিখিবেন। এরূপে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দেশের গাছ-গাছড়া ফুল ফল, বীজ অথবা জন্তুর রোম, চামড়া প্রভৃতি হইতে বিবিধ দ্রব্যের উপাদান প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে বনজঙ্গলে কত প্রকার উপাদান-সামগ্রী যে নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈজ্ঞানিকগণ পল্লীতে পল্লীতে তাঁহাদের বিজ্ঞানাগারে এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিবেন। তাঁহাদের পরীক্ষাই নূতন ব্যবসায় প্রবর্ত্তনের সহায় হইবে। কেবলমাত্র নূতন শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা নহে, বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কৃষি এবং শিল্পসমূহেরও উন্নতি সাধিত হইবে। অভিনব যন্ত্রাদি এবং সহজ কর্ম্মপ্রণালীর প্রচলন হইবে, ইহাতে কৃষক এবং শিল্পীদের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইবে। বিজ্ঞান এরূপে গ্রামে গ্রামে কৃষক এবং শিল্পীদের প্রয়োজনে লাগিয়া উহাদের অর্থাগমের সহায় হইবে, এবং মধ্যবিত্তদিগের জন্য নূতন নূতন শিল্প-ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথ খুলিয়া দিয়া চাকরী অপেক্ষা শ্রেয়স্কর উপায়ে অন্ন-সংস্থানের সহায় হইবে। গ্রামে পল্লী-পরিষদের অধীনে এবং বৈজ্ঞানিকগণের তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা সমবায়-প্রণালীতে পরিচালিত হইবে। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের উপাদান

প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি না হইয়া কারখানায় দ্রব্য প্রস্তুত করণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে একদিকে যেরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে, অপরদিকে গ্রামে বিদেশ হইতে নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইবে। দেশে নূতন নূতন ধনবৃদ্ধির উপায় সৃষ্টি হইবে, সকলেই কৃষিকার্য্য অথবা চাকুরীর জন্য নির্ভর করিয়া থাকিবে না।

পল্লী-পরিষদের কর্ম্ম

ধন-বৃদ্ধির সহিত অর্থোৎপাদন-প্রণালীরও উন্নতি হইবে। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমবায়-প্রণালী অনুসৃত হইবে। ইহার ফলে সমাজের মূলধন এবং শ্রমজীবি-শক্তির শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে। কৃষক, শিল্পী এবং শ্রমজীবীরা সমবায়-পরিষদের অধীনে ও নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিবে এবং সহকারিতার উপকার বুঝিবে। এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁতি, কর্ম্মকার প্রভৃতি সমগ্র গ্রামবাসীদের অভাব মোচন করিবার জন্য তাহাদিগের জাতিগত ব্যবসায় অধ্যবসায়ের সহিত অনুসরণ করিতেছে, এবং পল্লীগোষ্ঠীর নিকট হইতে পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট জমি হইতে শস্য গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অনুগৃহীত বোধ করিতেছে; এখনও পল্লীগোষ্ঠীতে কৃষকগণ শস্যোৎপাদন কার্য্যে বিভিন্ন প্রকার সমবেত কার্য্যকরণ-প্রণালীর অনুসরণ করিতেছে; বিবিধ

ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজা, সংকীর্ত্তনাদি গ্রামবাসীদিগের সমবেত পরিশ্রম, ব্যয় এবং উৎসাহের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের মণ্ডলদের বিচার কার্য্য শান্তিরক্ষা সমবেত-কার্য্যকরণে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি পল্লীবাসীদের আত্মনির্ভরতা এবং আত্মশক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক গোষ্ঠী-প্রভাবের আধিপত্য এবং গোষ্ঠীর উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একতা ও সমবেত কার্য্যানুষ্ঠান আমাদের সমাজের একটি প্রধান বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য সমাজ আধুনিক কালে যে সমাজতন্ত্রবাদ এবং সমবায়-বিজ্ঞান প্রচার করিতেছে তাহা আমাদের সমাজের নিকট নূতন হইবে না। কিন্তু আদর্শের দিক হইতে নূতন না হইলেও পাশ্চাত্য জগতে পল্লীগ্রামগুলি সমবায় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়াছে তাহা আমাদের অনুকরণীয়। বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, আয়র্লণ্ডে সমবায় কৃষককে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহার জন্য সস্তায় বীজ ও কলের লাঙল সরবরাহ করিয়া গ্রামে গ্রামে পুস্তিকা বিতরণ করিয়া শস্যোৎপাদন সহজ করিয়াছে, এবং শিক্ষক পাঠাইয়া কৃষির সহজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। তারপর গোজাতির উন্নতি বিধানেরও ব্যবস্থা করিয়াছে। সমবায় পশুপালন, পশু-বীমার ভার লইয়াছে; দুগ্ধ সরবরাহ, গৃহনির্ম্মাণ, জলসেচন করিয়াছে। সমবায় ব্যাঙ্ক করিয়াছে, কারখানা স্থাপন করিয়াছে, কারবার করিয়াছে, সব দিক হইতে একটা বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। সে বিপ্লব ও গঠনের ইতিহাস ভারতবাসীর প্রণিধান

করা উচিত, এবং প্রণিধান করিয়া অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক নিয়মে দেশের জীবন ও বাণিজ্য গড়িয়া তুলা উচিত। তবে জাতি বাঁচিবে ও আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবে। বাস্তবিক ইউরোপের সমবায়ের ইতিহাস আমাদের পল্লী-সমাজের নিকট বিশেষ আশা এবং উৎসাহের কথা। পল্লীবাসিগণ পল্লী-পরিষৎ স্থাপন করিয়া গ্রামের সমস্ত অভাব সমবেত ভাবে মোচন করিতে অগ্রসর হইবে। মণ্ডল অথবা পঞ্চায়েৎগণের প্রভাব কেবলমাত্র বিচার এবং শান্তিরক্ষা-কার্য্যে আবদ্ধ না থাকিয়া পল্লীবাসীদের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনে লক্ষিত হইবে। পল্লী-পরিষৎ সমস্ত পল্লীবাসীদের প্রতিনিধি-স্বরূপ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিবে।

(ক) গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি জীবন-নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করণ;

(খ) স্বাস্থ্যরক্ষা;

(গ) শিক্ষা (কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়);

(ঘ) ধর্ম্ম; যাত্রা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন, পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি;

(ঙ) বিচার, গ্রাম্যবিবাদসমূহের নিষ্পত্তি;

(চ) বনজঙ্গল পরিষ্কার এবং জল সরবরাহ;

(ছ) মনুষ্য এবং গোমহিষাদির জীবন-বিমা;

(জ) জলসেচন, বাঁধ রক্ষা ও নির্ম্মাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদ নদী সংস্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ;

(ঝ) ক্রয়বিক্রয়, বাণিজ্য; শস্য-গোলা রক্ষা, মূলধন সংগ্রহ;

(ঞ) আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়া, ব্যায়াম;

প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই গ্রামের পল্লী-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

দেশব্যাপী সমবায়-সমাজ গ্রামে গ্রামে যখন এইরূপ পল্লী-প্রতিষ্ঠিত করিবে, তখন প্রত্যেকেরই পক্ষে আপনার উদ্দেশ্য সাধন আরো সহজ হইবে। বিভিন্ন স্থানের পল্লী-পরিষৎগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা, নদ-নদী সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিবে, এবং ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া সকলে একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ সমগ্র দেশব্যাপী এক বিপুল সমবায়-সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইবে। ইহার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিয়া শ্রমজীবিগণ এক নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাদের কর্ম্মশক্তি বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া তাহারা স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবে। এই প্রকারে পল্লীসমাজ প্রত্যেক বিষয়েই আত্মনির্ভর হইয়া এক নবযুগের উপাদান হইবে।

নবযুগের নূতন কর্ম্মী

দেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের হাতেই এই বিপুল কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের ভাবুকতা

আছে, তাঁহারা এই কার্য্যকে স্বপ্নের অগোচর না ভাবিয়া বাস্তব জীবনে নিজ নিজ কর্ম্ম-শক্তির দ্বারা সফল করিবার জন্য প্রয়াসী হইবেন; তাঁহাদের অধ্যবসায় আছে, তাঁহারা ক্ষুদ্র আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের বিপুল উন্নতির বীজ লক্ষ্য করিবেন, অন্যান্য বাধাবিঘ্ন এবং সফলতার অসম্পূর্ণতার মধ্যেও তাঁহারা নিরাশ হইয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন। এখন চাই তাঁহাদের মধ্যে ব্যাকুলতা, পরদুঃখকাতরতা অনশনক্লিষ্ট অসংখ্য দেশবাসিগণের ক্ষুধায় ক্ষুধায় তীব্র তাড়না অনুভব করা, কর্দ্দমময় দূষিত জল যাহারা পান করিতেছে তাহাদের দারুণ পিপাসায় তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া; আর চাই কর্ম্মনিষ্ঠা, অসংখ্য নর-নারীর অসংখ্য অভাব অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য ধীর আয়োজন, উন্মাদনার পরিবর্ত্তে কঠিন সংযম, স্থির এবং সংযতভাবে জীবনের সমস্ত কর্ম্মকে এক মহান্ কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত করা। যে সমাজ আধুনিক কালের বিদ্যাসাগরের ন্যায় দীনদুঃখীর জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন ও নিষ্কাম অধ্যবসায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরহিতব্রত ও কর্ম্মনিষ্ঠা, বিবেকানন্দের অদম্য তেজ ও উৎসাহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এখনও তাঁহাদের জন্য জীবনের সাধনাকে জীবন্ত রাখিয়াছে, সেখানে নবযুগের নূতন কর্ত্তব্যপালনক্ষম সাধক কর্ম্মীদের কখনই অভাব হইবে না।

দশম অধ্যায়

পল্লীসেবক

ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র—পল্লীগ্রাম; ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র—শহর

বাঙ্গালাদেশে কয়েকবৎসর হইতে শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন চলিতেছে। দেশের আধুনিক শিক্ষা যে দেশবাসীর উপযোগী নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন। নূতন প্রকারের অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন কি নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। কিন্তু এই বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা দেশবাসীর প্রকৃত অভাব মোচন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। দেশবাসী কাহারা এবং দেশবাসীদের প্রকৃত অভাব কি—এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের ভুল ধারণা আছে। কেবল মাত্র ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লইয়া দেশ, নহে, কয়েকটি শহর মিলিয়া দেশ গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশকে বুঝিতে হইলে শহরের বড় রাস্তা, অফিস-আদালত ছাড়িয়া

শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছায়া-সুনিবিড় পল্লীগ্রামে আসিতে হইবে। দেশবাসীর হৃদয় বুঝিতে হইলে স্বদেশহিতৈষীর বক্তৃতা এবং উকিল হাকিমের জারিজুরীর প্রতি মনোযোগ না দিয়া, যে কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে রামপ্রসাদী গান ধরিয়াছে তাহার গানের সহিত আমাদের অন্তরের সুর মিলাইতে হইবে। বাস্তবিক বাঙ্গালাদেশে শহরের সংখ্যাই বা কত? খুব জোর ১৯০, কিন্তু গ্রামের সংখ্যা ২,০৩,৬৫৪। দেশবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৫জন পল্লীগ্রামে এবং কেবল মাত্র ৫ জন শহরে বাস করে। সুতরাং বাঙ্গালীর কোন অভাব-মোচনের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন আয়োজন করিবার সময় যদি পল্লীবাসীদের কথা ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

বাস্তবিকপক্ষে "দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরই জাতির বাসস্থান"—এ কথা আমাদের দেশের প্রতি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। ইহার কারণও আছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর শহরের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক উন্নতি বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ জন্য সেখানে শহরগুলিই সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ। কয়লা এবং শিল্পদ্রব্যের উপাদান যেখানে সহজে পাওয়া যায়, দ্রব্য প্রস্তুত-করণ ও দ্রব্য বিক্রয়ের যেখানে সুবিধা আছে, সেখানে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, অসংখ্য শ্রমজীবী এবং ব্যবসায়ী আসিয়া সেখানে শহর সৃষ্টি করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতিমূলক সভ্যতা শহরেই পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়। ভারতবর্ষ

কৃষিপ্রধান দেশ। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতির উপর ভারতবর্ষের জাতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রাকৃতিক 'জন্ম-নিকেতনের' প্রভাব হেতু আমাদের দেশ কৃষিকার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়া অতি প্রাচীন কালেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য-জগতে শহরগুলি যেরূপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, আমাদের দেশের গ্রামগুলি সেরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতির দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এ জন্য ভারতবর্ষের সভ্যতা পল্লীগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছে—শহরে, রাজধানীতে নহে। আধুনিক ইউরোপের সমস্ত বড় বড় সামাজিক, বৈষয়িক এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আন্দোলনগুলি শহরে উদ্ভূত হইয়া সেখানকার চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের দ্বারা পুষ্ট হইয়া অবশেষে পল্লীগ্রামে পৌছিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত। আমাদের অতীত ইতিহাসের সমস্ত আন্দোলনগুলি পল্লীগ্রামের চিন্তা দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। আমাদিগের যাবতীয় দর্শন এবং বিজ্ঞানের সত্যসমূহ তপোবনেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ, কপিল, বিশ্বামিত্র, শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নানক, গুরুগোবিন্দ, রামদাস, তুকারাম, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত, যাঁহারা ভারতবর্ষের শিক্ষা-গুরু, যাঁহাদিগের মধ্যে ভারত-বর্ষের অন্তরতম প্রাণ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাদিগের সাধনায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্য পল্লীজীবনের চিন্তা এবং কর্ম্ম-প্রণালীর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে পল্লী ও নগরের ভাব-বিনিময়

কিন্তু পল্লীগ্রামে যে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে শহরগুলিও অনতিবিলম্বে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। ভারতবর্ষের প্রধান নগরগুলি অধিকাংশই দেবতার আবাস-ভূমি, পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র। বৎসর বৎসর তীর্থযাত্রিগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পল্লীসমূহ হইতে যখন সেই সকল নগরীতে উপস্থিত হইত, তখন নানাধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইত, নূতন বিজ্ঞান এবং দর্শনবাদের মীমাংসা হইত, যাহা সত্য তাহা গৃহীত এবং তাহারই প্রচার হইত। এইরূপে মহানগরী এবং তীর্থক্ষেত্রসমূহেই ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মের আন্দোলনগুলির শৃঙ্খলা ও সমন্বয় সাধিত হইত। ভারতবর্ষের সমস্ত মহাপুরুষগণ সাধু এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট তাঁহাদিগের সত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এই সকল স্থানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান মনে করিতেন। অসংখ্য নর-নারীর চিন্তা এবং কর্ম্ম-জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদিগের সত্যগুলি এইরূপে একটা বিচিত্র এবং অসীম শক্তি লাভ করিত, তখন প্রচার-কার্য্যের আর কোন বিঘ্ন থাকিত না। মহর্ষি বশিষ্ঠের ধর্ম্মজীবনের সহিত অযোধ্যানগরী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মিথিলানগরী বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সূচনা বারাণসীতেই হইয়াছিল এবং পরে পাটলিপুত্রনগরীকে কেন্দ্র করিয়া বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম এবং সাধনা জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাবা নানক এবং গুরু-

গোবিন্দের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে অমৃতশহরনগরী, তুকারাম এবং রামদাসের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে পুণা ও সাতারানগরী এবং চৈতন্য-দেবের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে নবদ্বীপ এবং শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যনাম ঘনিষ্ঠ-ভাবে বিজড়িত। আধুনিক ইউরোপ যেরূপ পল্লীগ্রাম হইতে প্রকৃতিজাত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া কল-কারখানায় প্রয়োজনীয় বিলাসের সামগ্রী প্রস্তুত করতঃ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিতেছে, সেরূপ প্রাচীন ভারতে পল্লীগ্রামের সাধনালব্ধ মহনীয় ভাবগুলি নগর এবং তীর্থক্ষেত্রসমূহে মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক কেন্দ্রীকৃত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষময় প্রচারিত হইত। পল্লীগ্রাম এবং নগর-জীবনের মধ্যে এরূপ ভাবের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকায় আমাদিগের দেশে সত্য আবিষ্কার এবং সত্যপ্রচারের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

শহর এবং পল্লীগ্রামের সে সম্বন্ধ এখন লোপ হইবার মত হইয়াছে। ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে সম্পূর্ণ নূতন নূতন ভাব ও শক্তি প্রবেশ করিতেছে। দেশে অসংখ্য রেলের রাস্তা স্থাপিত হইতেছে, শহরের ছাপাখানায় অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ছাপা হইয়া প্রত্যহ গ্রামে গ্রামে বিক্রীত হইতেছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আর পুরাতন নিয়মে চলিতেছে না। পোষ্টমাষ্টার বাবু এবং পিয়নের সঙ্গে বিদেশী মহাজনের ব্যাপারী এবং পাইকার-গণও দেখা দিয়াছে। গুরুমহাশয়ের টোল উঠিয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে নিম্ন প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। মাঝে মাঝে নরমাল স্কুলে পাশ ইনস্পেক্টর

বাবুও দেখা দিতেছেন। হাট-বাজারে কেবলমাত্র স্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য যে বিক্রয় হয় তাহা নহে, শহর হইতে চিনি, বিলাতী কাপড় এবং কেরোসিন তৈলেরও আমদানী হইতেছে। মণিহারী দোকান বেশ পসার জমাইয়াছে।

পল্লীগ্রামগুলি সমস্ত বিষয়ে শহরের অনুগামী হইবার জন্য ব্যস্ত। শহরে যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিপত্তি, সমস্ত গ্রামগুলি তাহাই অনুকরণ করিবার জন্য লালায়িত। পল্লীগ্রাম এবং নগরের পূর্ব্বেকার ভাববিনিময়ের সম্বন্ধ আর নাই। নগরগুলিই এখন দৃষ্টান্তস্থল এবং পল্লীগ্রাম তাহার অনুগামী মাত্র।

আধুনিক ভারতে পরানুকরণ

আমাদিগের একটা বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে, ইউরোপ তাহার কত শতাব্দীর বিপুল প্রয়াস, দুঃখ এবং সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের ফলে যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা নকল করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে ধন্য মনে করি। সে অবস্থায় উপস্থিত হইবার জন্য সমাজের কিরূপ বল এবং সামর্থ্য আবশ্যক তাহা ভাবিয়া দেখি না। সে অবস্থায় আমাদিগের সমাজ তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহা চিন্তা করিবার অবসর নাই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, ইউরোপের সেই অবস্থা ইউরোপীয় সমাজের পক্ষেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিদায়ক কি না এবং মানব সভ্যতার

কতদূর পরিপোষক, তাহা আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদিগের দেশে বৈষয়িক অবনতি হইয়াছে, অমনি আমরা ইউরোপের অর্থোৎপাদন-প্রণালীগুলি নকল করিয়া চারিদিকে কল-কারখানা খুলিতেছি। ইউরোপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা ধনী হইয়াছে, অমনি আমরা কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শহরে আসিবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতা নগর-জীবন গঠনকেই তাহার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে এই জন্যই পল্লী-জীবনের প্রতি আমাদিগেরও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, নাগরিক জীবনকে আদর্শ মনে করিয়া আমরাও স্বকীয় সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিতেছি। ফলতঃ, ভারতবর্ষ আধুনিক ইউরোপকে অনুকরণ করিয়া তাহার পল্লী-জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে ; ইহাতে কেবলমাত্র যে তাহার সভ্যতা-বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে আমাদের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবারও সম্ভাবনা হইয়াছে। ইউরোপকে এ বিষয়ে অনুকরণ করিতে যাওয়া যে আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং ইতিহাস-বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

আমাদিগের দেশে আধুনিককালে কতকগুলি শহর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের এখনও হৃদয়ের কোন সংযোগ হইতে পারে নাই। ইউরোপ হইতে আমরা আমাদিগের শহরে সভা, সমিতি, ইউনিয়ন, ক্লাব, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী সমস্ত লইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এগুলির সেরূপ প্রাণ নাই। উহাদিগকে আমরা আত্মীয় করিয়া

লইতে পারি নাই। ভারবর্ষের সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতাকে এখনও আপনার নিগূঢ় প্রাণ-শক্তির দ্বারা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের নগর-জীবন ইউরোপীয় নগর-জীবনের অন্ধ এবং মূঢ় অনুকরণ হইয়াছে মাত্র।

অন্যদেশের মাটী হইতে শিকড় উৎপাটন করিয়া কোন গাছকে যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থানে আনা যায়, সে ঐ নূতন মাটীর রস আকর্ষণ করিতে না পারিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় বিবিধ অনুষ্ঠানগুলির আমাদিগের দেশে আসিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সনাতন ভূমির সঙ্গে উহাদিগের কোন পরিচয় নাই এবং কখনও হইবে কি না তাহাও বলা যায় না। অধিকন্তু, আমরা স্বকীয় মনুষ্যত্বটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য জড় অংশকে সহজে অনুকরণ করিবার ফলে আমাদিগের বিশেষত্ব—সামাজিক জীবনের নিষ্ঠা ও সংযম, এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্য—ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ভগবানে অবিশ্বাস, অর্থ-পৈশাচিকতা, গৃহবন্ধনের শৈথিল্য, চরিত্রহীনতা, বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি পাপ আমাদিগের নাগরিক জীবনকে ক্রমশঃ আক্রমণ করিতেছে।

পল্লী-জীবনের স্বাতন্ত্র্যলোপে আধুনিক ইউরোপের অবনতি

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় নগর-জীবন এবং পল্লী-জীবনের কি সম্বন্ধ তাহা এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য সমাজে পল্লী-জীবন এবং নগর-জীবনের যে সম্বন্ধ আছে তাহা আমাদের আদর্শ হইবার উপযুক্ত কি না এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগতে গ্রামগুলি সমস্ত বিষয়েই শহর এবং নগরীকে অনুকরণ করে। নগরগুলি এরূপে সমস্ত বিষয়ে গ্রামের চিন্তা এবং কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহার ফলে জাতীয় সভ্যতা বিভিন্নমুখী না হইয়া একমুখী হইতেছে, বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে প্রাণ-হীন অন্তঃসারশূন্য সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। পল্লীবাসীদিগের নিজস্ব রুচি আর নাই, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," এ কথা এখনকার পাশ্চাত্য সভ্যজগতে খাটে না। যাহা শহরের রুচি তাহাই গ্রামে আদৃত হইবে। এজন্য লণ্ডন, পারী, নিউ-ইয়র্কের হাট-বাজারে মাল যাচাই না করিয়া কোন ব্যবসায়ী সন্তুষ্ট হয় না, কারণ সেখানে যদি উহার আদর না হয় তাহা হইলে দেশের কেহই উহা লইবে না। যাহা কিছু নূতন— বিলাসের সামগ্রী হউক অথবা চিন্তাশীল ব্যক্তির গবেষণার ফল বা পাগলের পাগলামি হউক না কেন, উহার দ্বারা যদি শহর একবার মাতিয়া উঠে, তাহা হইলে সমগ্র দেশে উহার আদরের

সীমা থাকে না। রাজধানী হইতে সমস্ত দেশ জুড়িয়া শতধারায় যে বন্যার জল বহিতে থাকে, তাহাতে পল্লীগ্রাম ও শহরের সকল বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য একেবারেই ধুইয়া যায়। গ্রাম্য সাহিত্য, গ্রাম্য শিল্প-কলা, গ্রাম্য আচার-ব্যবহার এবং আমোদ-প্রমোদ ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। গ্রামের আপনার হৃদয় বা প্রাণ নাই, গ্রাম এখন শহর এবং রাজধানীর ছায়ামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার কেন্দ্র-স্বরূপ শহরগুলি তাহাদিগের নিজেদের মাপকাঠির দ্বারা দেশের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মকে বিচার করিতেছে। এই ঐক্য ও সমতা এখন সভ্যতার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পল্লী-জীবনের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব লুপ্ত হওয়াতে জাতীয় সভ্যতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে।

ইউরোপ তাহারই সভ্যতার জন্মস্থান পল্লীগ্রামকে এখন ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। মধ্যযুগে যখন পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন পল্লীগ্রামের শান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্য হইতে ভাবুক এবং কর্ম্মিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইউরোপের তাৎকালিক সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। আধুনিক ইউরোপ অশান্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল সন্তানের মত স্বীয় সভ্যতার জননী শান্তিময় পল্লী-জীবনকে অবজ্ঞা করিতেছে।

পল্লীগ্রামের সে দিন আর নাই। ইউরোপ এখন অসংখ্য রেল-রাস্তা স্থাপন করিয়াছে, অসংখ্য কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছে,

বৈষয়িক উন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর না করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অসংখ্য জাহাজ পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে এখন ইউরোপের কুঠি এবং বাণিজ্যাগারের উপকরণ যোগাইতেছে। অসংখ্য শ্রমজীবী পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া শহরের কল-কারখানায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে। পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইলেও, প্রকৃতিজাত দ্রব্যের অভাব নাই, কারণ বিদেশ হইতে দ্রব্যের আমদানী হইতেছে। যতই গ্রামগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি-কল্পে তাহার পল্লীগ্রামগুলি বিসর্জ্জন দিয়াছে—বিপুল অর্থ-লাভের জন্য তাহার সামাজিক জীবনের সুখ এবং শান্তি চিরকালের জন্য হারাইতে বসিয়াছে।

আদর্শ সভ্যতার লক্ষ্য

কিন্তু সমাজের এক স্থানের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভাবিয়া দেশের অন্যান্য স্থানের চিন্তা ও কর্ম্ম-জীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে বিচার ও নিয়ন্ত্রিত করিলে জাতির সভ্যতাকে দরিদ্র করা হয় এবং দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-জীবন ও চিন্তাজীবনের বিকাশের পথ রোধ করা হয়। পল্লী-জীবন এবং নগর-জীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পল্লী-জীবন এবং নগর-জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করে। পল্লীগ্রামে জাতির বৈষয়িক এবং সামাজিক

জীবনের সমস্ত উপাদান এবং উপকরণগুলি উৎপন্ন হয়। পল্লী-গ্রামে সমাজের নিত্য আহারের সংস্থান হয়। পল্লীগ্রামের প্রকৃতিজাত বস্তু শহরে আনীত হইলে শহর তাহার কল-কারখানার সাহায্যে উহা হইতে নানা প্রকার দ্রব্য এবং বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করে। এইরূপে নিত্যনৈমিত্তিক অভাব-মোচনোপযোগী দ্রব্যাদির উপকরণ যোগাইয়া পল্লীগ্রামগুলি যেরূপ বৈষয়িক জীবন যাপনের সহায় হয়, সেরূপ সামাজিক জীবনের উপাদানগুলিও পল্লীগ্রামের আব্‌হাওয়াতেই উৎপন্ন হয়। নগর এই সমস্ত উপকরণগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমাজের চিন্তা এবং কর্ম্মের গতি ও প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। নগরে শক্তির ব্যবহার এবং বিকাশ, কিন্তু শক্তির জন্ম পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামই ভাবুকতার জন্মভূমি, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রই বিরাট এবং মহনীয় ভাব আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠ স্থান। পল্লীগ্রামে চতুরতা প্রশ্রয় পায় না,—নিষ্ঠা, প্রেম, সংযম, মহত্ত্ব, পবিত্রতা এবং সত্যানুরাগ, মানব-হৃদয়েরসমস্ত দেবভাবগুলি পল্লী-গৃহেই অঙ্কুরিত হয়। গ্রামের চিন্তার মধ্যে স্বভাবতঃই একটা সরস মৌলিকতা এবং ভাবপ্রণতা লক্ষিত হয়, যাহার জন্য তাহারা অনেক সময়ে অসীম শক্তি লাভ করে। বাস্তবিক, যে সমস্ত বিপুল আন্দোলন অতীতকাল হইতে পৃথিবীর বক্ষ আলোড়িত করিয়া মানব-জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে, সে সমস্তই শহরের কর্ম্মময় ব্যস্ততা হইতে অনেক দূরে পল্লী-জননীর নিভৃত ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, কনফুশিয়াস, সাদী,

হাফিজ, সেণ্টফ্রান্সিস্, মার্ক্স্, পেষ্টালজি—সকলেই বিশ্বপ্রকৃতির নিকট তাঁহাদিগের শিক্ষা এবং দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অরণ্য, প্রান্তর, মরুভূমি অথবা গিরিগহ্বরেই তাঁহারা জ্ঞানের আলোক পাইয়াছিলেন। পল্লীগ্রামগুলি এই সমস্ত জগদ্গুরুকে লালনপালন করিয়া জগতকে সভ্য করিয়াছে। পল্লীগ্রামই সভ্যজগতের জন্মস্থান।

ভারতবর্ষে পল্লীগ্রামের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা

ভারতবর্ষের পল্লী-জীবন আজকালকার নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া কি ভাবে গঠিত হইবে তাহাই এখন বিবেচ্য। প্রতীচ্যের প্রভাব ভারতবর্ষের নগরেই প্রথম আসিয়াছে, এমন কি আজকালকার নগরগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই সৃষ্ট। কিন্তু এই পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতের জীবন-প্রবাহকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের জাতীয় প্রাণধারা পল্লীগ্রামে প্রবাহিত হইতেছে। পল্লীবাসীদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শগুলি এখনও বিদ্যমান। পল্লী-সমাজে এখনও পর-নির্ভরতা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা এবং স্বায়ত্ত-কর্ম্ম এখনও সেখানে বিকাশ লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা পল্লীগ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছে সত্য, কিন্তু তবুও সেখানে চরিত্রের মাহাত্ম্য, ত্যাগস্বীকার, কর্ত্তব্যবোধের যথেষ্ট নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবন এবং মহাপ্রাণতা

এখনও পল্লীগ্রামকে উন্নত রাখিয়াছে। এখন আমাদের স্বদেশসেবকগণকে পল্লী-জগতের চিন্তা ও কর্ম্মকে, পল্লীগ্রামের এই সনাতন জীবন-প্রবাহকে, নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের চরিত্রদোষে পল্লী-সমাজ এখন কঠোর দারিদ্র্যব্যাধি-গ্রস্ত। পল্লীবাসীর অন্নবস্ত্রাভাব এখন তাহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্যদোষে ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার আদর্শ মলিন হইয়া পড়িয়াছে। নানা উপায়ে এই দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে, দারিদ্র্য মোচন করিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সুমহান্ আদর্শকে জগতের সমক্ষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বৈরাগ্য তখন সম্মিলিত হইয়া একটা মহাজীবনের সূচনা করিয়া দিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই মহামিলনের সঙ্গমতীর্থ হইবে—ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম।

কয়েকটি পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানের আলোচনা

পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের দ্বারা সেখানকার দেশহিতৈষিগণ দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগের দেশে সেগুলি উপযোগী কি না প্রত্যেক সমাজ-সেবকের তাহা আলোচনার বিষয়। বিশেষতঃ যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা কৃষককুলের দারিদ্র্য-হ্রাস এবং

ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, সেগুলি আমাদের দেশে প্রযোজ্য কি না তাহা বিচার করিতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে বিপুল বাণিজ্য-ব্যবসায়ের আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার ফলে ইউরোপীয় সমস্ত জাতিই কলকারখানার বিরাট আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাবে ইউরোপীয় জগতে আর একটি আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, ইহার দ্বারা সেখানকার কৃষিকার্য্যের বিপুল উন্নতি সাধিত হইতেছে। ইহার নাম সমবায়-আন্দোলন বা কৃষিকার্য্যে যৌথ-কারবার প্রচলন। স্থল্‌শ রাইফেজেন, হাস, উলেমবার্গ, লুজাতী, ডুপোর্ট প্রভৃতি সমাজ-সেবকগণ আপন আপন সমাজের দারিদ্র্য-পীড়িত এবং ঋণভার-গ্রস্ত কৃষিজীবিগণের দুঃখ মোচন করিবার জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জর্ম্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কৃষক-সমাজ নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছে। কৃষিজীবিগণের ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

যৌথ-ঋণদানমণ্ডলী

কোন কৃষকের ঋণগ্রহণের সময় যদি তাহার ঋণভার অন্য কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে মহাজনের অর্থনাশের বিশেষ আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং সুদের হার সে কম

করিয়া দিতে পারে। কয়েকজন কৃষক এইরূপে একটি মণ্ডলী স্থাপন করিয়া মণ্ডলীর নিকট হইতে অল্প সুদে ধার লইতে পারে। মণ্ডলী কৃষকগণকে ঋণ দিবার জন্য যে দেনা করে তাহার জন্য কোন একজন কৃষক বা সমস্ত কৃষক মিলিয়া দায়ী থাকে। ইহাকে অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট-ঋণ-দান-মণ্ডলী বলা যায়। কৃষকগণও যাহাতে মণ্ডলীতে আমানত রাখে তাহার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হয়। পরিশেষে যখন মণ্ডলীর সভ্যগণের আমানত টাকা উহার বাহিরের দেনার সমান হয় তখন বাহিরের টাকা ফেরত দিয়া আমানত টাকাই সমিতির মূলধনরূপে পরিণত হয়।

প্রত্যেক কৃষকের ঋণের জন্য মণ্ডলীর অন্য সভ্যেরা দায়ী বলিয়া তাহার গৃহীত ঋণ যাহাতে যথাকার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং অতি অল্প ব্যয়ে যাহাতে সে তাহার অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে তাহার প্রতি সকলের লক্ষ্য আছে। সভ্যেরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্য-প্রণালী বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, উপরন্তু এ কারণে উহাদিগের কর্ম্মশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সমবেত কার্য্য-প্রণালী বিভিন্ন প্রকারে সমাজের মঙ্গলসাধন করে।

আমাদিগের দেশে এইরূপ ঋণদানমণ্ডলী স্থাপনের সূচনা হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষকগণ যে ঋণভার হইতে মুক্ত হইতেছে তাহা নহে। অনেক স্থলে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে কত অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত, তাহাও সমিতির দ্বারা

নির্দ্ধারিত হইয়া কৃষকদিগের ঋণভার লঘু হইতেছে। গ্রামে হিংসা বিদ্বেষ এবং দলাদলির ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, মামলা মোকদ্দামা অনেক সময় সমিতির দ্বারাই নিষ্পত্তি হইতেছে, দরিদ্র কৃষকগণ মিতব্যয়ী হইতে শিখিয়াছে, এরূপে তাহাদিগের সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থা বিভিন্ন প্রকারে উন্নতি লাভ করিতেছে।

যৌথ-বিক্রয়মণ্ডলী এবং যৌথ-শস্যভাণ্ডার

পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবলমাত্র ঋণদানমণ্ডলী স্থাপনের দ্বারা যে কৃষক-সমাজের উন্নতি বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা নহে। আরও অনেক প্রকার সমবায়-অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল। কৃষকগণ যাহাতে তাহাদিগের শস্য সুবিধামত বিক্রয় করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছিল। সমবায়সমিতি স্থাপন করিয়া সমিতির উপর শস্য বিক্রয়ের ভার প্রদান করিয়া ইউরোপীয় কৃষকগণ বিশেষ সুবিধালাভ করিয়াছে। কৃষিপ্রধান দেশে দালাল এবং পাইকারগণ কৃষিজাত দ্রব্যের লাভের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে। কৃষকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে শস্যোৎপাদনের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে শস্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, ফলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি লাভ করিয়াও কৃষকগণ লাভবান হইতে পারে না। এ স্থলে গ্রাম্যসমিতি কেবলমাত্র ঋণদানে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি কৃষকগণের পণ্যদ্রব্যের

বিক্রয়ের ভার লইতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমাদিগের দেশে কৃষকগণ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াও যে লাভবান হইতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ, তাহারা দালালগণের নিকট হইতে দাদন লইয়া উহাদিগকে অত্যল্প মূল্যে ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। দুই একটি উদাহরণ দিলে ইহা বুঝা যাইবে। পাট চাষের জন্য কৃষকেরা আষাঢ় মাসে ৫৲ অথবা ৫।০ দাদন লইয়া আশ্বিন মাসে দালালকে এক মণ পাট দিয়া থাকে। এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া দালালেরা ৯৲—১০৲ পাইয়া থাকে। সুতরাং কৃষকগণ অর্থাভাব এবং দাদন গ্রহণের জন্য লভ্যের অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত হয়। তিসি অথবা বুট চাষের জন্য দালালেরা কৃষককে ৫৲ অথবা ১॥০ ঐ দুইটি ফসল উৎপাদনের জন্য দাদন দিয়া থাকে। তিন চারি মাস পরে দালালেরা কৃষকের নিকট এক মণ তিসি অথবা বুট পাইয়া উহা ৭৲ অথবা ২॥০ দরে শহরের হাটে বিক্রয় করে। এ স্থলে যদি কৃষকগণ কোন গ্রাম্যসমিতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সমিতির দ্বারাই তাহাদিগের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগের কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। আধুনিক অবস্থায় কৃষকগণ 'নয়ালির' সময় (যে সময় নূতন শস্যের আমদানী হয়) শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, তখন শস্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। যৌথ-বিক্রয়সমিতি এবং যৌথ-ভাণ্ডার স্থাপন করিলে বাজার মন্দা হইলেও পণ্যদ্রব্য 'ধরিয়া রাখা' যাইতে পারে; এবং পরে

উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে ন্যায্য দরে তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইতে পারে। মধ্যবর্ত্তী সময়ে কৃষকগণের সংসার-খরচের জন্য সমিতি তাহাদিগকে ঋণ দিবে। বাস্তবিক পল্লী-গ্রামে যৌথ-ভাণ্ডার এবং যৌথ-বিক্রয়মণ্ডলী স্থাপন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ইহাদিগের দ্বারা কৃষক-সমাজ পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা লাভ করিয়া স্বকীয় পরিশ্রম সার্থক করিতে পারিবে। তাহাদিগের উৎসাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তখন ঋণগ্রহণের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

যৌথ-ক্রয়মণ্ডলী

কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানের জন্য যৌথ-ঋণদানসমিতি, শস্য-ভাণ্ডার এবং বিক্রয়সমিতি যেরূপ প্রয়োজনীয় যৌথ-ক্রয়সমিতিও সেরূপ আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পাদনের জন্য অভিনব যন্ত্র এবং কৃত্রিম সারাদি ব্যবহার আবশ্যক। ইহাদিগের মূল্য অধিক বলিয়া পরস্পরের সহায়তা ভিন্ন ঐগুলি ক্রয় করা অসাধ্য। যৌথ-ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিলে পরস্পরের সাহায্যে পাইকারী দরে উপযুক্ত কৃষি-যন্ত্র এবং সার ক্রয় এবং বীজ শস্য সংগ্রহ করা খুব সুবিধাজনক হইবে। হলাণ্ড, বেলজিয়াম জর্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, বোহিমিয়া, মোরেভিয়া প্রভৃতি প্রদেশে এই প্রকার যৌথ-ক্রয়সমিতির দ্বারা সেখানকার কৃষকেরা নানাপ্রকার

যন্ত্র এবং কৃত্রিম সার ব্যবহারের সুবিধা লাভ করিয়া তাহাদিগের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে।

কৃষিকার্য্যে সমবায়

বাস্তবিক পক্ষে সমবায়-প্রণালী প্রয়োগ না করিলে কৃষি-কার্য্যের উন্নতি অসম্ভব। ব্যবসায়ে যেমন কল-কারখানার আয়োজন না করিলে ফল লাভ করা সুকঠিন, সেরূপ কৃষিকার্য্যে পরস্পরের সহায়তা দ্বারা শস্যোৎপাদন এবং শস্য বিক্রয়ের সুবিধা না থাকিলে উহা বিশেষ লাভজনক হয় না। কৃষিকার্য্যে কলের উপর নির্ভর না করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। মানুষ তাহার বুদ্ধি এবং পরিশ্রম নিয়োগ করিয়াও শস্যোৎপাদনের সময় কমাইতে পারে না। কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে বা অধিক সংখ্যক কৃষক নিযুক্ত করিলেও ধান চাষে যে ছয় সাত মাস লাগে তাহা কমে না। এ জন্য বৃহৎ আয়োজন করিলে কারখানার কার্য্য যেমন শীঘ্র এবং অল্প খরচে সম্পন্ন হয়, কৃষিকার্য্যে তাহা হয় না। বস্তুতঃ কৃষি-কার্য্যে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানই লাভজনক। অথচ ঋণ গ্রহণ, শস্যোৎপাদন ও শস্যবিক্রয় সম্বন্ধে অল্প মূলধনবিশিষ্ট সামান্য কৃষকের অনেক অসুবিধা আছে। এই সকল অসুবিধা অনেকগুলি কৃষক মিলিত হইয়া কাজ করিলে দূরীভূত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল এইরূপ নানা ক্ষেত্রে সমবায় প্রথা

অবলম্বিত হইতেছে। আমাদিগের দেশে কৃষিজীবিগণের মধ্যে সমবায় প্রণালীর প্রচলন বিশেষ আবশ্যক। সমবায় অনুষ্ঠান যে আমাদিগের দেশে নিতান্তই নূতন তাহা নহে। বাস্তবিক, আমাদিগের পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্যে সমবায়-অনুষ্ঠান অনেকদিন হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদিগকে এ বিষয়ে ইউরোপের নিকট নূতন করিয়া বেশী কিছু শিখিতে হইবে না।

আত্মনির্ভরতা এবং সমবায়-প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মজ্জাগত

আমাদিগের দেশের কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে পরস্পরের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বেশ ভাল করিয়াই বুঝে। গ্রামে অনেকগুলি কৃষক প্রায়ই মিলিত হইয়া জমি চাষ করে। অন্যূন ১৫।২০ জন এরূপে প্রত্যহ একজন বন্ধুর জমি তৈয়ারী করে। যাহার জমি তৈয়ারী হয় সে তাহার সমস্ত বন্ধুদিগের জমি যতদিন না তৈয়ারী হয় ততদিন তাহাদিগের সঙ্গে পরিশ্রম করে। এরূপে অল্প সময়ে এবং অল্প আয়াসে সকলেরই জমিতে লাঙ্গল এবং সার দেওয়া হয়। ইহাকে প্রচলিত কথায় 'গাঁতা' বলে। ধান্য-রোপনের সময় এইরূপ সমবেত প্রণালীতে কৃষকগণ নিড়ানি কার্য্যও সম্পন্ন করে। গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে "ছাটা" বলে। গুড় তৈয়ারী করিবার সময় কৃষকদিগের সহকারিতার আর একটি বিশেষ

পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্ত কৃষক মিলিত হইয়া একটি ইক্ষু-পেষণ-যন্ত্র ক্রয় করে বা ভাড়া লয়। ইক্ষু চাষ শেষ হইলে কৃষকেরা সমবেত হইয়া ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রস বাহির করিয়া গুড় তৈয়ারী করে। রস বাহির করিবার সময় সকল কৃষকেরই হালের বলদ নিযুক্ত হয়। এই প্রকার পরস্পরের সহায়তার কার্য্যকরণপ্রণালীর উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। দুই তিনটি গ্রামের কৃষকেরা অনেক সময়ে সমবেত হইয়া কয়েকজন রাখাল বালক নিযুক্ত করে। কাহারও গো-মহিষাদি অপরের জমিতে আসিয়া শস্য নষ্ট না করে তাহা দেখিবার ভার রাখাল-বালকদিগের উপর ন্যস্ত হয়। যাহার গরু বা মহিষ অপরের জমিতে আসে, তাহাকে কিছু জরিমানা দিতে হয়। জরিমানার টাকায় বালকদিগের মাহিয়ানা দেওয়া হয়। এরূপে কয়েকটি গ্রাম সমবেত হইয়া খোঁয়াড়ের কার্য্য অল্প ব্যয়ে এবং সামান্য পরিশ্রমেই চালাইয়া থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে সমবেত কার্য্যকরণ এবং পরস্পর বিশ্বাসের উদাহরণ আমাদিগের পল্লীজীবনে এখনও ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্রামে মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে এখনও পল্লীসমাজ তাহার মণ্ডলকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। মণ্ডল এখনও গ্রাম্যবিবাদ, জাতিবিবাদ, গৃহবিবাদ, ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন। গ্রামবাসী অধিকাংশ স্থলেই মণ্ডলের পরামর্শ না লইয়া আদালতে যায় না। মণ্ডল কখন কোন ব্যক্তির অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরামর্শ দেন না। প্রত্যেক গ্রামবাসীর সুখ এবং

স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, তাই পল্লী-সমাজস্থ কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হয়। মণ্ডল শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। রাজদণ্ড অপেক্ষা মণ্ডলের নিকট অপমান এবং লাঞ্ছনা পল্লীবাসীরা অধিক ভয় করে। বাস্তবিক আমাদিগের দেশের জনসাধারণ চিরকালই রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিগণকে বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষার ভার সমর্পণ করতঃ গ্রামের মণ্ডলের অধীনে থাকিয়া গ্রাম্যজীবনে সুখ এবং শান্তিস্থাপনের জন্য আপনাদিগের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিত। জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় এবং উদ্যোগে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবিধান বিশেষ কঠিন হইত না। তাহার ফলে আমাদিগের পল্লীগ্রামগুলি স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়া বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পথে বিকাশলাভ করিতে পারিত। রাষ্ট্রীয় জীবন আমাদিগের দেশে সমাজের সমস্ত শক্তিকে কখনও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সমাজের জীবনীশক্তি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত থাকায় রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে আমাদিগের জাতীয় শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় নাই। পল্লীগ্রামসমূহ এরূপে স্বাধীন চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তির আধার হইয়া সমগ্র সমাজের আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরতা, পরস্পর সহানুভূতি এবং সমবায় প্রবৃত্তিকে আজও পর্য্যন্ত সজীব রাখিতে পারিয়াছে।

আমাদের কর্ত্তব্য

পল্লী-সমাজের এই সমবায় প্রবৃত্তি এবং আত্মনির্ভরতাকে এখন আধুনিক ধনবিজ্ঞানের শিক্ষার দ্বারা অধিকতর কার্য্যকরী এবং আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

এই জাতিগত সমবায় প্রবৃত্তিকে অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় নিয়োজিত করিয়া আমাদিগের দেশের দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে ঋণদানসমিতিতে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যৌথ-ক্রয়মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গো-মহিষাদি পশু, এবং উপযুক্ত কৃষি-যন্ত্র, সার এবং বীজ-শস্যের সংগ্রহ এবং ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যৌথ-বিক্রয়মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গ্রামের উৎপন্ন শস্যসমূহ ন্যায্য দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে শস্যগোলা স্থাপন করিয়া কৃষকগণকে সাময়িক ভরণ-পোষণের নিমিত্ত অল্প সুদে শস্য কর্জ্জ দিতে হইবে। বিদেশী মহাজনকে শস্য কর্জ্জদান, শস্যসঞ্চয় এবং শস্যরপ্তানি ইত্যাদি ব্যবসায়ে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না দিয়া গ্রাম্য সভার দ্বারাই গ্রাম্য শস্যের আদান-প্রদান কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইবে। অপরিমিত অপরিমাণে শস্যরপ্তানি বন্ধ করিয়া গ্রামের সঞ্চিত শস্য যাহাতে দুর্ব্বৎসরে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীভাণ্ডার স্থাপন করিয়া কৃষিজীবিগণের জন্য বস্ত্র, তৈল, লবণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী পাইকারী দরে বিক্রয় করিবার সুবিধা সৃষ্টি

করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করিয়া মড়ক ইত্যাদি সময়ে গো-মহিষাদির জীবন-বীমা করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বৃষ ক্রয় করিয়া আনিয়া গোবংশের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিল্প-জীবিগণের জন্য যৌথ-ঋণদানমণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পকর্ম্মের উপযুক্ত যন্ত্র ও উপকরণ পাইকারী দরে ক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিক্রয়মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পীদের প্রস্তুত দ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তন্তুবায়-গণের জন্য তন্তুবায়মণ্ডলী স্থাপন করিয়া সূতা রেশম, রং এবং শিল্পকার্য্যের অন্যবিধ সামগ্রী পাইকারী দরে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্ত্র-বয়নের পর তন্তুবায়গণের যাহাতে বস্ত্র-বিক্রয়ের কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য বিক্রয়সমিতি গঠন করিয়া উহার উপর স্থানান্তরে বস্ত্র-বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। সূত্রধরগণের মণ্ডলী স্থাপন করিয়া বড় বড় গাছ চিড়িবার জন্য উপযুক্ত টেবিল এবং করাত বিতরণ করিতে হইবে। গ্রামের ধীবরগণকে নিকারীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যৌথসমিতি স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ ঘৃত এবং মাখন প্রস্তুত করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ গরুর দুগ্ধ সমিতির কারখানায় আনিয়া কারখানার কলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঘৃত মাখন প্রস্তুত করাইয়া লইবে। পল্লী-সমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামে কয়েকটি ইক্ষু-পেষণের যন্ত্র, ধান এবং দালভাঙ্গার যন্ত্র, আম, কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল এবং বনের মধু হইতে বিবিধ

প্রকার আচার এবং মোরব্বা প্রস্তুতকরণ-যন্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। এ সমস্ত যন্ত্রাদি গ্রামবাসিগণের যৌথ-সম্পত্তি, সুতরাং সকলেরই ব্যবহার্য্য হইবে। গ্রামকে মহামারী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করিতে হইবে। সমবেত সমিতি গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে কূপ খনন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, খাল কাটিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জল-সরবরাহ, বনজঙ্গল পরিষ্কার, দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, অবৈতনিক কৃষিবিদ্যালয় এবং শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লীসেবকের আবশ্যকতা

এই সমস্ত অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র দেশে প্রসার লাভ করিতে পারে তাহার জন্য পল্লী-সেবক আবশ্যক। আমাদের দেশের জনসাধারণ একেবারেই অজ্ঞ এবং নিরক্ষর এবং নানা কারণে নিশ্চেষ্ট ও উদ্যমহীন। তাহাদিগকে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝাইতে হইবে। ইহাদিগের উপকারিতা একবার বুঝিতে পারিলেই তাহারা উদ্যোগী হইয়া নিজেদের কাজ নিজেরাই করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে প্রচার আবশ্যক এবং প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য অসংখ্য কর্ম্মবীরের উৎসাহ ও ব্যাকুলতা আবশ্যক। বহু বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া উহার কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র

প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সহিত না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র অরণ্যে রোদন করিয়াছিলেন, তাঁহার বাণী বাঙ্গালা দেশ শুনে নাই। তাহার কুড়ি বৎসর পরে একজন সন্ন্যাসী দীন-দরিদ্রের জন্য প্রাণে প্রাণে কাঁদিয়া ভারতবাসীর নিকট তাঁহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা এবং অদম্য উৎসাহ দায়স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। দরিদ্র এবং হীনবৃত্তি চণ্ডাল ও যে নররূপী নারায়ণ এবং তাহারই সেবায় যে দেবতার পূজা হয়, ইহাই তাঁহার বাণী। জ্বলন্ত বিশ্বাসে এবং প্রত্যক্ষসাক্ষাৎকারের দৃঢ়তায় সেই বীর সাধক তাঁহার গভীর উদাত্ত স্বরে ভারতবাসীকে শেষ আদেশ দিয়াছেন :—"যাও এই মুহূর্ত্তে পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই,—যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক পতিতা রমণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাও তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর—বলি—জীবনবলি, তাঁহাদের জন্য, যাঁহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিতদের জন্য।" * বিবেকানন্দের আহ্বান ভারতবাসীর নিকট ব্যর্থ

* পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ।

হয় নাই। তার পর আজ কয়েক বৎসর হইল আর একজন বাঙ্গালী শিক্ষা-প্রচারক ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নিঃস্বার্থ সমাজসেবা এবং কর্ম্মোপাসনার ভিত্তির উপর শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রচারের গোড়ার কথা,—'সাধনার' মূলমন্ত্র এই,—"ফ্যাক্টরীতে, কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ যথেষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিত হইয়া সকলেই নিজেকে বড় করিতে শিখিয়াছে। সেরূপ পণ্ডিত্য বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দরিদ্রের বন্ধু, অশিক্ষিতের সহায়, নিম্ন-শ্রেণীর উপদেষ্টা লোকহিতৈষী 'মানুষে'র সৃষ্টি করা যায় কি না দূরদর্শী ব্যক্তিগণের তাহাই ভাবিবার বিষয়।" গ্রামে গ্রামে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়া পল্লীতে পল্লীতে দেশের বিচিত্র কথা শুনাইয়া পল্লী-জীবনে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করিবার জন্য তিনি দেশের শিক্ষিত লোককে পরহিতব্রত গ্রহণ করিতে এবং প্রচারকের জীবন অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন। "যেখানে অতি নিস্তব্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকেরা শ্রমবিনোদন করিতেছে, যেখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন সময়েই কোন চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয় না, সকলেই শান্তির সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধা করিতেছে, যেখানে সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর এখনো বেশী প্রবেশ করে নাই, যেখানে হিন্দু-মুসলমান একমন একপ্রাণ হইয়া পাড়ার সমস্ত কাজ করিয়া থাকে, যেখানে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা এখনো প্রবিষ্ট হয় নাই,

সমস্ত লোকেই পূর্ব্বপুরুষদের চিরন্তন প্রথা প্রত্যেক সামাজিক ও পারিবারিক কাজেই বজায় রাখিবার জন্য যত্নবান, যেখানকার আম কাঁঠাল বনের দেবমন্দির হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এখনও অপসৃত হয় নাই—সেই সুখের নীড়, শান্তির আধার আমাদিগের পল্লী-সমাজে নূতন নূতন কথা শুনাইয়া পল্লীবাসীদিগের মনে এক অভিনব ভাব ঢালিয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, দেশের কোথায় কোন্ চিন্তা কোন্ কাজ হইতেছে। সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া এই আধুনিক পৃথিবীর নূতন অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গ্রাম্য জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। গ্রামের সঙ্গে শহরের যে বিরোধ কিছু কাল হইল ঘটিয়াছে, এবং এ জন্য পল্লীতে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সমস্তই প্রতিকার করিবার জন্য ঘরে ঘরে—হিন্দু, মুসলমান, কৈবর্ত্ত, ব্রাহ্মণ, জোলা, তাঁতী সকলকে শিক্ষাদান করিয়া স্বীয় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে হইবে"।*

এই বিপুল শিক্ষাদান এবং সেবার কার্য্য করিবার জন্য দরিদ্র-বন্ধু এবং শিক্ষাপ্রচারক অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে লোক-শিক্ষাপ্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক জেলায় এবং কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন, জাতীয় বিদ্যালয়, সুহৃৎ-সমিতি, শ্রমজীবি-শিক্ষা-পরিষৎ, অবৈতনিক পাঠশালা, গ্রন্থাগার, নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত

* শিক্ষা-সমালোচনা—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত।

হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণও এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন। বিদ্যালয়াদিতে ছাত্রদিগকে ইতিহাস, সাধারণ হিসাব, ভূগোল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য এবং বড় লোকের প্রতিকৃতি দেখান হইতেছে। স্থানে স্থানে কৃষি এবং শিল্পশিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে।

দুর্দ্দশার পরিমাণ

কিন্তু দেশে কার্য্য আরম্ভ হইলেও প্রয়োজনের অনুরূপ কিছুই আয়োজন নাই। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য লোক একেবারে নিরক্ষর ও দারিদ্র্যপীড়িত। পল্লীবাসীদিগের এখন অসংখ্য অভাব, সে সমস্ত মোচন করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত পল্লীগ্রামে শিবমন্দির কালীমন্দির প্রভৃতি দেবালয় এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, গ্রামের হরিসভার জন্য চাঁদার খাতায় অনেক টাকা বাকী পড়িতেছে, কথকতা, যাত্রাগান, প্রভৃতি উৎসাহ অভাবে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না, নদীগুলি সংস্কার অভাবে ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে। গ্রামে পানীয় জলের অভাব দেখা গিয়াছে। সমৃদ্ধিশালী নগরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ধনীলোকের অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, অথচ তাঁহাদিগের জন্মস্থানের দারিদ্র্যের

অবধি নাই। তাঁহাদিগের নিজ নিজ ভদ্রাসন—পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে এতকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়াছিলেন—তাহাও এখন বনজঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে। জলসরবরাহ একবারেই বন্ধ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অসংখ্য গ্রাম একসঙ্গে উজাড় হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত লোক কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহারা আপনাদের পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া শহরে চাকুরী খুঁজিতেছে। অনেক গ্রাম এরূপে এখন একেবারেই লোকশূন্য। যে সকল গ্রামে প্রায় কুড়ি ত্রিশটি টোলে শাস্ত্রজ্ঞগণ অধ্যয়ন করিতেন, বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রেরা আসিয়া যেখানে শিক্ষালাভ করিত, যে গ্রাম "বারো মাসে তের পার্ব্বণে" মুখরিত থাকিত, যেখানে দুর্গা ও কালীপূজার সময় প্রায় দুই শত বাড়ীতে মহোৎসব হইত, বারোয়ারী পূজার বিপুল সমারোহ জনসাধারণের হৃদয়ে বল এবং মনে আনন্দ সঞ্চার করিত, হরিনাম কীর্ত্তন, রামায়ণ এবং চণ্ডীর গান জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীকে আরও মধুর করিয়া তুলিত, সে গ্রাম এখন নিস্তব্ধ, নিরানন্দ—শৃগাল ব্যাঘ্রের রঙ্গভূমি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন কোন এক ভীষণ মহামারী গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মাঝে মাঝে বনজঙ্গলের ভিতর হইতে দুই একটা পতনোন্মুখ কোঠাবাড়ী পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি বহন করিয়া পথিকের মনে ভীতি এবং বিষাদ সঞ্চার করিতেছে। যে সকল গ্রাম একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদিগেরও ক্রমাবনতি হইতেছে। অধিকাংশ গ্রামের

কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবিগণকে অন্নাভাবে অনশনে থাকিতে হয়। কৃষকগণের সমস্ত পরিশ্রম জমিদারের খাজনা এবং মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেই ব্যয়িত হয়। একবার ঋণ গ্রহণ করিলে সে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশেষে আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় বহন করাও কঠিন হইয়া পড়ে। অন্নাভাববশতঃ কৃষকদিগের রোগাধিক্য এবং পরিশ্রমকাতরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার সঙ্গে বার্ষিক দুর্ভিক্ষ, জলাভাব, গোবংশের অবনতি এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস জড়িত হইয়াছে, কাজেই কৃষকদিগের দুর্গতির সীমা নাই। শিল্পজীবিগণকেও দারিদ্র্য হেতু পাইকার প্রভৃতির নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, ন্যায্য দরে তাহাদিগের দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা নাই বলিয়া তাহারা পরিশ্রমোযোগী ফললাভ করিতে পারে না। উপরন্তু, বিদেশ হইতে পল্লীর হাট বাজারে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের আমদানী হইয়াছে। গ্রাম্য দ্রব্যের আদর কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর প্রভাবে কাঠ, পিত্তল, মাদুর এবং মাটীর কাজ ব্যতীত সমস্ত শিল্পই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাকুরীর লোভে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য শহরে আসিতেছেন, চাকুরী পাইলে তাঁহারা ভ্রমক্রমেও নিজবাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন না। জমিদারবর্গ নানা কারণে ভোগবিলাসের লীলাভূমি নগরীতে আসিতে বাধ্য হন এবং ক্রমশঃ আপনাদিগের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান। প্রজাদিগের উন্নতির জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ উৎসাহ থাকে না। সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং ধনী সম্প্রদায়

গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে দলাদলি, বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের গুরুস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে, নৈতিক শিক্ষার অভাবে, জনসাধারণের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই চাকুরীজীবি অথবা চিরপ্রবাসী ; এবং জনসাধারণ—যাহা লইয়াই দেশের সমাজ এবং দেশের বল—রুগ্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত, ঋণভারগ্রস্ত, চিরদারিদ্র্যকে একমাত্র সখা করিয়া কালাতিপাত করিতেছে।

রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী।
যজ্জাবতি তন্মরণং সোঽস্থ বিশ্রামঃ ॥

বাস্তবিক বাঙ্গালীসমাজ এরূপ জীবন যাপনে কতদিন সন্তুষ্ট থাকিবে ?

পল্লীসেবকের কর্ম্মক্ষেত্র

যে সমাজে এই সমস্ত বিপুল অভাব সেখানে দুই একজন ভাবুক, কর্ম্মী, বা দুই একটি শিক্ষা-পরিষৎ বা সাহিত্য-পরিষৎ কি করিবেন। এখন পল্লীতে পল্লীতে কর্ম্মোপাসক ভাবুকের প্রয়োজন গ্রামের হাটবাজারে পল্লী-সেবকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার প্রয়োজন। দুঃখের কথা আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা রব উঠিয়াছে—"দেশের কাজ করিবার সুযোগ কোথায় ?" তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রই খুঁজিয়া পান না! বড়ই অনু-

তাপের বিষয় এই যে, তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করা এবং কতকগুলি হুজুগ সৃষ্টি করাই দেশের কাজ মনে করেন। অথচ সমাজব্যাপী দেশভরা এতগুলি অভাব রহিয়াছে। স্থিরভাবে সংযতভাবে ব্যক্তিগত ভাবে সেইগুলি পূরণ করা যাইতে পারে। তাহাতে সকলেরই সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কোন বিঘ্ন বা বাধা পাইবার কারণ নাই।

শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন পল্লীতে বাস করিতে হইবে, হাটে হাটে ভ্রমণ করিতে হইবে। পল্লী-সমাজে দেশবিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পকৃষিকর্ম্মের কথা শুনাইতে হইবে, তাহাদের আর্থিক, নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা নানা উপায়ে উন্নত করিতে হইবে। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী স্বদেশসেবকগণ গ্রামের ম্যালেরিয়া কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য যত্নবান হইবেন। গ্রামের পুষ্করিণীগুলি প্রতি বৎসর সংস্কৃত করাইতে হইবে। নদীর গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইবে। যেখানে কৃষকেরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছে, সেখানে গিয়া তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া কৃষকের কর্ম্মে সাহায্য করিতে হইবে। চাষ-আবাদের কি কি অসুবিধা আছে, তাহাদিগের হালের গরু এবং যন্ত্রাদির কিরূপ অভাব, জলসেচনের ব্যবস্থা কিরূপ, শস্যসমূহের বীজসংগ্রহ এবং সংসারের ব্যবস্থা কি প্রকার—এই সমুদয় তথ্য অবগত হইয়া চাষীদের মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যা প্রয়োগ করিবার জন্য শিক্ষিত

ব্যক্তিগণকে খাঁটি কৃষক হইতে হইবে। গ্রামে মহাজনের অত্যাচার আছে কি না; গ্রামের কতজন কৃষক ঋণভারগ্রস্ত, কত জন লোক মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; গ্রামের সুদের হার কত কিস্তিখেলাপী সুদ কিরূপ, গ্রামে সওয়া, দেড়ী বাড়ী প্রভৃতি কিরূপ প্রচলিত; গ্রামের পাইকার আড়ৎদার কিরূপ দাদন দিয়া থাকে, এই সকল অবস্থা বুঝিয়া ধন-বিজ্ঞানের উপদেশগুলি গ্রাম্য সমাজে কাজে লাগাইতে হইবে।

যাহারা শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিখিয়া পণ্ডিত হইতেছেন তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য এখন এই সমুদয় তথ্যসংগ্রহে এবং গ্রাম্য জীবনের উন্নতি বিধানে প্রয়োগ করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া শহরে বসিলে দেশীয় সমাজে বিজ্ঞান-প্রচার, শিল্প-প্রচার, ব্যবসায়-প্রচার হইবে না। এখন বিজ্ঞানবিদ্‌গণকে স্বয়ং গ্রামে বসিয়া অসম্পূর্ণতাগুলি সম্পূর্ণ করিতে হইবে—হাতে কলমে কাজ দেখাইয়া শিল্পীদিগকে উন্নত শিল্প-প্রণালীর প্রবর্ত্তনে উৎসাহিত করিতে হইবে।

সহানুভূতি এবং সাহচার্য্য হইতেই প্রকৃত পরিচয় জন্মে, এই কারণে গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় লাভ করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহাদিগের চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রণালী আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পল্লীবাসীদিগের অসংখ্য অভাব অভিযোগ, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। গ্রামের সমস্ত কৃষক, সমস্ত শিল্পী সমস্ত শ্রমজীবীর নিকট হইতে

তাহাদিগের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিতে হইবে—পরিবারের মধ্যে কয়জন উপার্জ্জন করে, স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন আছে কি না, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনে পরিবারের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি না, যদি কর্জ্জ করিয়া থাকে ঐ কর্জ্জ কত বৎসরের, কর্জ্জের কারণ কি, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় ব্যয়ের জন্য কি না, যদি পরিবারের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে উহা কিরূপে খরচ হয়; সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, যৌথ-ঋণদানমণ্ডলী বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় কি না। গ্রামের হাটে হাটে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, পল্লীর হাটে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, সে সমস্ত দ্রব্য পল্লীগ্রামেই প্রস্তুত হইতে পারে কি না, গ্রাম হইতে শস্যের রপ্তানি কি পরিমাণে হয়; উহার সঙ্গে পল্লীগ্রামের দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। প্রত্যেক মণ ধান পাট, গম, বুট, সরিষার জন্য কৃষক অথবা পাইকারগণ কত লাভ করে; গ্রামে জমি বন্ধক দিবার জন্য কি প্রণালী অনুসৃত হয়, খায়খালাসী, কটকবালা প্রভৃতি কিরূপ প্রচলিত—ইত্যাদি নানা বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। যেখানে জোলা, তাঁতী, ভাস্কর, কাঁসারি তাহাদিগের আপন আপন কুটীরে বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাদের উপকরণ-সামগ্রী কিরূপ মূল্যে ক্রয় করে; তাহাদিগের প্রস্তুতদ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয় হয় কি না, পাইকারেরা তাহাদিগের দ্রব্য শহরে বিক্রয় করিয়া কিরূপ লাভ করে; তাহা-

দিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য শহরের ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিরূপ সাহায্য করিতে পারে। তাহার পর প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডলের নিকট সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, গ্রামে দলাদলি আছে কি না, মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে, গৃহবিবাদ, গ্রাম্য বিবাদ প্রভৃতি মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার ঐ কার্য্যে কি উপায়ে সহায়তা করা যায়। গ্রামের নৈতিক অবস্থা কিরূপ, গ্রামে কতজন মদ্যপায়ী, তাড়িখানার সংখ্যা এবং আবগারীর আয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে, মদ্যপান নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত। এইরূপে নানাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসেবকগণকে বিভিন্নপ্রকার বৈষয়িক এবং সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

পল্লীগ্রামের চিন্তাজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার জন্য প্রাচীন পুঁথি, কুলজী গ্রন্থ, প্রাচীন গীত, ছড়া বচন, জনপ্রবাদ প্রভৃতি সঙ্কলন করিতে হইবে। পল্লী-সমাজের আমোদ-প্রমোদ ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মেলা-উৎসব প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে সরসতা ও সজীবতা প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর লোক-শিক্ষার জাতীয় প্রণালী বুঝিতে হইবে ; কথকতা যাত্রা এবং কবিগান, রামমঙ্গল গান, চণ্ডীগান, হরিনাম এবং গৌর নিত্যানন্দ নাম কীর্ত্তন প্রভৃতিতে বাঙ্গালার পল্লী-সমাজে কেমন আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা প্রচারের বিপুল আয়োজন হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রচাররীতি বজায়

রাখিয়া ইহাদের বিষয় ও প্রণালী সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায় কি না তাহা ভাবিতে হইবে। গ্রামে কোথায় কোন্ ভাল কথক, কবি যাত্রাওয়ালা অথবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সামান্য কুটীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কালাতিপাত করিতেছেন, তাঁহার সংবাদ লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে লোক-শিক্ষা-প্রচার কার্য্যে যথাসম্ভব নিযুক্ত করিতে হইবে। যাহারা ঘরে ঘরে হরিনাম করিয়া ঠাকরুণ বিষয় রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়া আসিতেছে, সেই ভিক্ষুক-ভিখারীদের ভিক্ষাবৃত্তি পল্লী-সমাজের আধ্যাত্মিক বোধকে সজীব রাখিয়া যাহাতে আরও সার্থক হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

যেখানে কৃষক লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে গান ধরিয়াছে, "মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা"; যেখানে তাঁতী কাপড় বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে "ওহে হর, এই ভয়েতে তাঁত বুনা কাজ খুব ভালই জান," যেখানে মাঝি নদীর স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া উদ্দাম প্রাণে গাহিতেছে "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারি না,"—তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের ভক্তি এবং প্রেমের গভীরতা বুঝিতে হইবে। তাহাদের নিকট সরলতা, ভক্তি ও তন্ময়তা শিখিতে হইবে। গম্ভীরার গান, ভাঁটিয়াল গান, বিষহরির গান, রাধাকৃষ্ণ ও হর-গৌরীসম্বন্ধীয় গান ইত্যাদি সকল প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

গ্রামে যে মুদী প্রত্যহ দোকানে আলো জ্বালিয়া তাহার মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের নিকট সীতা, সাবিত্রীর দুঃখ-কাহিনী, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, বেহুলার নিষ্ঠা এবং 'যবন' হরিদাসের অটল ভক্তির কথা শুনাইয়া তাহাদিগকে ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত করিতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই সহজ সরল ধর্ম্মজীবনের ভিতরকার সুরটির সহিত আমাদিগের সুর মিলাইতে হইবে।

আমাদের ভবিষ্যৎ

এই উপায়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত যখন জনসাধারণের গভীরতর ভাব বিনিময় হইতে থাকিবে, তখন শিক্ষিত সমাজ আপামরজনসাধারণের সুখ-দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি আর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন না। তখন তাঁহারা বুঝিবেন, পল্লী-সমাজই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অন্তস্থল। যুগ-যুগান্তকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের উপর যে চিন্তাস্রোত অব্যাহত বহিয়া আসিতেছে, যে স্রোত শহরের আফিস-আদালত কল-কারখানার মধ্যে আবিল এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পল্লী-সমাজে এখনও তাহা নিরাবিল এবং প্রবল। এই জাতীয় প্রাণ-ধারার সহিত যতই তাহারা আপনাদিগের প্রাণের যোগ অনুভব করিবেন, ততই পল্লীজীবনের শান্তি, সরলতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং আনন্দ তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের এক অপূর্ব্ব সম্পদ বলিয়া বোধ হইবে। পল্লীসমাজের সমাদর আরম্ভ হইলে পল্লী-

জীবনে গৌরববোধ জন্মিবে, তাহার ফলে সমগ্র সমাজ ভাবুকতার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িবে। দেশের সর্ব্বত্র শীঘ্রই একটা বিপুল আন্দোলন সৃষ্ট হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন প্রকৃত জন-নায়কগণ দেখা দিবেন। জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য মোচন এবং শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ইহাদিগের পিতা স্বরূপ হইবেন,—

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥

অসংখ্য জনসাধারণের সমস্ত আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ এই জন-নায়কগণের জীবনে অভিব্যক্ত হইবে। কত শত বৎসর ধরিয়া সমাজে যে বেদনা অব্যক্ত ও অস্ফুট ছিল তাহা এখন প্রকাশের সুযোগ পাইবে। এত দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জগতের নিকট যে বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করিতেছিল তাহা এখন সার্থক হইবে। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কৃষিশিল্প-বিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানাগার খোলা হইবে এবং সমবেত প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকিবে। লোকশিক্ষা এবং সমবায় অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন চলিতে থাকিবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভারতবর্ষের পল্লীবাসীর দারিদ্র্য মোচন করিবে। ভারতীয় পল্লীবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন তখন নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ লাভ করিতে পারে না।

এ জন্য সাম্য-নীতিমূলক সমাজ-তন্ত্র এবং অতীন্দ্রিয়ভাবাপন্ন সাহিত্য ও চিত্রকলার দ্বারা পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সমাজের প্রতিযোগিতা, অনৈক্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু কারল্ মার্ক্স্ ও এঞ্জেলস্, রস্কিন এবং মরিশ প্রভৃতি কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণ ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কার এবং পরিশোধন কার্য্যে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ভারতবর্ষের পল্লীসেবকগণকে সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পারদর্শী ভারতবর্ষের পল্লীসেবক বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতীয় পল্লী-জীবনের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিয়া এক বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া দিবেন। এই আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সামাজিক জীবনে সুখশান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে।

বিশ্ব-দেবতা ভারতবর্ষের পল্লীসেবককে উপলক্ষ্য করিয়া মানবজাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন।

একাদশ অধ্যায়

নব-নাগরিক সভ্যতার মোহজাল

অস্বাস্থ্য

কলিকাতার সাহিত্যসম্মিলনে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি পল্লীর স্বাস্থ্যের দিকে আমাদিগকে মন দিতে বলিয়াছিলেন। সাহিত্যাচার্য্য সরকার মহাশয় অভিভাষণের একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পল্লীবাসী সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে আমি যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে প্রধানতঃ প্রজার দারিদ্র্যের কথা বলিয়াছি, দেশ যে বিষম অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, এ কথা ভাল করিয়া বলি নাই। সরকার মহাশয় রোগ-পীড়িত দেশবাসীদিগের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার কথা সাহিত্যসেবিগণকে বৎসর বৎসর শুনাইতেছেন, তাঁহার করুণাপূর্ণ হৃদয়ের গভীর বেদনা তাঁহার অভিভাষণে ফুটিয়া উঠিয়া প্রত্যেক বৎসরই আমাদের হৃদয়ে একটা উদ্বেগ আনিয়া দিয়াছে।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-বৃদ্ধি যে বাঙ্গালার গ্রামগুলির অবনতির প্রধান কারণ, আর সেই কারণ

দূর করিতে না পারিলে যে পল্লীরক্ষার কোনও উপায়ই করা যাইবে না, এ কথা আমি ভাল করিয়া বলিব তাহা বলি নাই বলিয়া তাঁহার দুঃখ।

আমি তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছি বলিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি। আমার নিজের কথা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিলে বোধ হয় আমি তাঁহার দুঃখের কারণ হইতাম না।

উপসর্গ

আমার মনে হয়, দেশের অসুস্থতাই যে দেশের প্রধান শত্রু বলিয়া এক্ষণে বোধ হইতেছে, এবং পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেই যে পল্লীরক্ষা হইবে, তাহা ঠিক নহে। দেশের প্রতি পল্লীগ্রামই যে এক্ষণে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, তাহার কারণ প্রাকৃতিক নহে, এক একটা ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামেও আবদ্ধ নহে। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া একটা সামাজিক বিপ্লব চলিতেছে—যাহার ফলে আমাদের পল্লীগ্রামে শুধু যে স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইতেছে তাহা নহে, পল্লীজীবন নাগরিক জীবনের পুষ্টিবিধানের জন্য একেবারে বিসর্জ্জিত হইতেছে। সমাজের একটা অঙ্গ আর একটা অঙ্গের রক্ত শোষণ করিতেছে,—পল্লীর অস্বাস্থ্য সে ত মৃত্যু-রোগের একটা উপসর্গ মাত্র। উপসর্গ নিবারণের জন্য চিকিৎসা না করিয়া আসল রোগকে দূর করিতে হইবে।

নাগরিক আদর্শের প্রাবল্য

আমাদের আধুনিক সভ্যতায় এখন কি দেখিতেছি ;—পল্লী-কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম নাগরিক জীবনকে পুষ্ট করিতেছে, দেশবাসির অভাব সম্পূর্ণ মোচন না করিয়া অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সাহায্যে বিদেশের অভাব মোচন করিতেছে অথবা বিলাসিতার উপকরণ জোগাইতেছে, পল্লীর শিক্ষা পল্লীজীবন সংগঠনের উপায় না হইয়া নাগরিক জীবন গঠনের উপাদান সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছে, দেশের সমস্ত ধীবুদ্ধি-শক্তিকে এক ভাবে নিয়োজিত করিয়া নাগরিক ব্যক্তিত্বকে গঠন করিতেছে, এমন কি আমাদের সাহিত্যের আধুনিক ভাব ও আদর্শ নাগরিক শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সমগ্র জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন জীবন-বিকাশের অন্তরায় হইতে চলিয়াছে। ইহার ফলে পল্লীর জীবনীশক্তি যে হ্রাস পাইবে তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু নাগরিক জীবন যে পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাও নহে,—বিদেশীয় সভ্যতানুমোদিত কৃত্রিমতা ও বিলাসিতার অত্যাচারে, ব্যয়-সাপেক্ষ মিউনিসিপ্যালিটিসমুদয়ের করস্থাপনের গুরুভারে, অন্ন সংস্থানে পরাধীনতায়, দেশীয় শিল্পী ব্যবসায়ীদিগের দৌর্ব্বল্যে, বিদেশীয় বণিকদিগের প্রাবল্যে, লোকসংখ্যায় স্ত্রীবিহীনতায় একটা বিকৃত নাগরিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে।

পুরাতন সামাজিকতা একবারে অন্তর্হিত। এখানে আছে শুধু মালিক ও বণিকের লোভ, হৃদয়হীনতা। নগরের সামাজিক

জীবনও অত্যন্ত কৃত্রিম, স্বার্থপর, আত্মমর্য্যাদাহীন। আর আছে অনাচার ও কদাচার। নগরের লোকগণনায় আমরা দেখিতে পাই, পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প—পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যার এই তারতম্য হেতু নগরে পাপের ভীষণ ও নির্লজ্জ মূর্ত্তি। কলিকাতায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম। এক হাজার পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা—লণ্ডনে ১০৭০, বোম্বাইয়ে ৫৩০, হাবড়ায় ৫৬২ এবং কলিকাতায় ৪৩০। এই তারতম্যই সামাজিক কদাচারের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে।

কলিকাতায় পতিতা নারীর সংখ্যা দেখিলে সত্যই ভয় হয়। এই মহানগরী ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থানসমূহে ভ্রষ্টানারীর সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে ১২,৮৪৮ এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাত্তর গণনায় ১৬,০০০। বিংশতি হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা প্রত্যেক দ্বাদশ নারীর মধ্যে একজন ভ্রষ্টা। এতদ্ব্যতীত পতিতাগণের দ্বারা প্রতিপালিত দশ বৎসরের নিম্নবয়স্কা বালিকার সংখ্যাও ১০৯৬-এর কম নহে। তাহারা সকলেই যে ঐ ঘৃণিত জীবনযাত্রার জন্য লালিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদুপরি পরিতাপের কথা এই যে, উক্ত বালিকাগণের অধিকাংশই তাহাদের লালন-কর্ত্রীর সন্তান নহে। অনেকেই বিক্রীত অথবা পতিতাগণের দ্বারা প্রতারিত। বোম্বাই নগরে এই পাপের পরিমাণ কম। উপরন্তু কলিকাতার ন্যায় বোম্বাইবাসী এ বিষয়ে যত্নহীনও নহে। কলিকাতায় মৃতজাত সন্তানের সংখ্যা ১১০১ অর্থাৎ প্রত্যেক ১৭-টি

সন্তানের মধ্যে একটি মৃতজাত। পাশ্চাত্যদেশে একই অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকারী ও বিবাহ সম্বন্ধে একই নিয়মানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণের মধ্যে এতাদৃশ মৃতজাতের সংখ্যা দেখিলে সহজেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অত্যধিক উপদংশ রোগের প্রাদুর্ভাব অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় ও সন্তানকে অধিকতর সময় ধরিয়া স্তন্য দেওয়ায় এবং উৎপাদিকাশক্তির অপেক্ষাকৃত পূর্ণতার পূর্ব্বেই সন্তান প্রসব করায় হাসপাতালের ডাক্তারদিগের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা ভারতবর্ষে মৃতজাত সন্তানের আধিক্য হইতে উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব স্বীকার করিতে পারি না। সৈনিকদিগের চিকিৎসাগারে ভারতীয় ও ব্রিটিশ-সৈন্যগণের মধ্যে উপদংশ রোগের চিকিৎসার্থীর সংখ্যা দেখিলে এ দেশে ঐ রোগের অপেক্ষাকৃত প্রভাব যে কম তাহা জানিতে পারি।

সামাজিক কদাচার দূর করিতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা ভাবিবার বিষয়। কিরূপে পাপ ও রোগ দূর হইতে পারে তাহা স্থির করিতে হইলে কি কি কারণে কলিকাতায় বেশ্যাবৃত্তির এত প্রাধান্য তাহা প্রথমে এক একটা করিয়া দেখা আবশ্যক। পতিতা-দিগের তত দোষ নহে। যত দোষ দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার, কারণ ইহাই তাহাদের অধঃপতন সহজ করিয়া দেয়। এইরূপ সামাজিক ও আর্থিক অবনতি কলিকাতায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। কলিকাতায় অনেক লোক আছে যাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। তাহারা আসে যায়, কিছুদিন থাকিয়া

কার্য্যশেষে তাহারা নগর পরিত্যাগ করে। মফঃস্বল হইতে আগতপ্রবাসী ব্যক্তিগণই কলিকাতার লোক-সংখ্যা স্থায়ী এবং বর্দ্ধিত করে। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অত্যন্ত আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার লোক-সংখ্যায় এক শত জন পুরুষের প্রতি ৪৭জন মাত্র স্ত্রীলোক আছে। নগরীর মধ্যভাগে বিবাহিত ব্যক্তি অতীব বিরল। লোক-সংখ্যা এখানে প্রায় স্ত্রীবিহীন দাঁড়াইয়াছে। মফঃস্বল প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে ২/৩ ভাগ পুরুষ ও ১/৩ ভাগ স্ত্রীলোক পূর্ণবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে। এই বয়সের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা তিন গুণ বেশী। বিলাতের নগরসমূহে ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কদিগের মধ্যে ১০৭ জন স্ত্রীলোক প্রতি ১০০ জন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গৃহকর্ম্মের দাসীভাবে থাকে। ২০ হইতে ৪৫ বৎসরের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে উভয়ের সংখ্যা তথায় প্রায়ই সমান।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে, পারিবারিক জীবনের আকর্ষণ অন্যদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। পারিবারিক ভূমি ও শিল্প এবং বাল্যবিবাহ এখানে তাহার প্রধান উপাদান। কিন্তু দারিদ্র্য ও গৃহাভাব কলিকাতার শ্রমজীবিগণকে এবং মধ্যবিত্ত-দিগকে পারিবারিক জীবনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া ভগ্নোদ্যম ও অ-মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতার কুৎসিত আমোদের মোহজালের মধ্যে অনেককেই পরিবার-বিরহিত-জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। একদিকে গার্হস্থ্য জীবনের

প্রভাব তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে না, অপর দিকে বাধ্য হইয়া স্বভাব বিরুদ্ধ একক জীবন অতিবাহিত অনেকেরই করিতে যাইয়া পিচ্ছিল পথে পদস্খলন হইতেছে। বেশ্যাসক্তিই এই অস্বাভাবিকতার দারুণ পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া।

পৃথিবীর সর্ব্বনিকৃষ্ট গৃহপূর্ণ মহানগরী

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া গৃহাভাবেও মনুষ্যের চরিত্র নষ্ট হয়। প্রাসাদপূর্ণ মহানগরী বলিয়া যে কলিকাতা আজ বিখ্যাত তাহা কিন্তু আবার অতি নিকৃষ্ট বাসস্থানেরই আগার। গ্রাম হইতে শ্রমজীবিগণ কলিকাতায় আসিয়া পরিবারবর্গ বিরহিত হইয়া বহুজনপূর্ণ "বস্তি" অথবা "চালায়" অন্ধকার অপরিষ্কার ঘরে দুঃখময় শুষ্কজীবন অতিবাহিত করে। এইরূপ অবস্থায় সৌন্দর্য্যবোধ চলিয়া যায়, বুদ্ধিলোপ পায় ও অসংযত আমোদপ্রিয়তা জাগিয়া উঠে এবং অস্বাভাবিক উত্তেজনা লাভের জন্য একটু মত্ত ইচ্ছা আসে। মদ্য ও নারী তখন আশ্রয় হয়। মদ্যের দোকান ও বেশ্যালয়ে লোকে আলোক ও আমোদ পায়, সঙ্গী পায়, ক্ষণেকের স্নায়বিক উত্তেজনায় জীবনের দুঃখ কষ্ট ভুলিতে পায়, মদ্যপানে ও কামসম্ভোগ দিনের কঠিন পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত দেহকে অবশ করিয়া ফেলে। গৃহহীন বিরহক্লিষ্ট-জীবন পথিকের সম্মুখে যখন বহুজনসমাকীর্ণ নগরীর পাপ-সমূহ তাহাদের মোহজাল বিস্তার করে তখন পারিবারিক প্রেম, গ্রাম্যশাসন ও ধর্ম্মের কাহিনী কোথায় বাতাসে মিলাইয়া যায়।

অপরিচ্ছন্ন নগরীর বেশ্যালয়সমূহে জনতা, বিজন পল্লীগ্রামের পরিত্যক্ত গৃহের বিপরীত ছবি, একটি অপরের ছায়া।

মীমাংসার উপায়

পল্লীগ্রাম সংস্কার, পল্লীর শিল্প ও সামাজিক নীতিসমূহের পুনর্গঠন ও নারীদিগের উপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োগ এই সকলের সহিত আমাদের নাগরিক পাপ-সমস্যা অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের শ্রমজীবিগণের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে অথচ নগরে সংসারপালনে তাহারা অক্ষম। ঘন অন্ধকার ক্ষুদ্র জীর্ণ বাসস্থানে তাহাদের আহার নিদ্রা মৈথুন সব ক্রিয়াই সম্পাদন করিতে হয়। বাসস্থানের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় নগরসমূহে আমাদের স্বল্প বেতনভোগী মধ্যবিত্তগণেরও মেস্ (mess) অথবা নীচের তলায় বাস ভিন্ন উপায় নাই। পারিবারিক জীবনের সংস্পর্শ ও সামাজিক ভয় পাপের পথে বাধা দেওয়ার জন্য উপস্থিত নাই। তাহাতে আবার এ দেশে নারী অবলা। দারিদ্র্য অথবা সমাজের দ্বারা একবার লাঞ্ছিত হইলে তাহাদের পথে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া একা সংসারে দাঁড়াইতে পারা এক রকম অসম্ভব। স্ত্রীলোকেরা জীবন-যাত্রার জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, গৃহের ও সমাজের আধুনিক অবস্থায় তাহাদের স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন একরূপ অসম্ভব। অসহায় বিধবাগণ চরকা বা অন্য ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা স্বজীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে না। সমাজের বন্ধন শিথিল হওয়ায় তাহাদিগকে

সম্পূর্ণ একাকী জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। দারিদ্র্য ও দুঃখের সময় আশ্রয়-স্থল চিরপ্রচলিত স্ত্রী-ধনরক্ষার প্রথাও লোপ পাইয়াছে। পারিপার্শ্বিক কদাচার ও কুব্যবহার মধ্যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত পাট ও তুলার কারখানায় কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। দেশের আধুনিক আর্থিক অবস্থার সহিত সমাজ-নীতির পরিবর্ত্তন না হওয়ায় দিনে দিনে হাটে কারখানায় স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিকৃত হইতেছে। দেশের নূতন অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী-শ্রমজীবিগণ একস্থানে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সংসর্গ সম্বন্ধীয় আদবকায়দা পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। উপরন্তু মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে আধুনিক সামাজিক পরিবর্ত্তনবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের অধিকতর মেলামেশা দেখা গিয়াছে। সামাজিক স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে সব দিক হইতেই দেশের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করা একান্ত আবশ্যক।

এই ত আমাদের অবস্থা। একটা বিকৃত কদাচারী নাগরিক জীবন দেশময় তাহার ভাব, বণিকের সঙ্গে রেল গাড়ীর সঙ্গে বিস্তৃত করিতেছে, অন্য সব আদর্শ ধুইয়া পুঁছিয়া একবারে লোপ সাধন করিয়া দিতেছে। পল্লীরক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান সমাজের গোড়া পত্তন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, আধুনিক সমাজের ভাব ও আদর্শ কাজ ও কর্ম্মের বিপ্লবসাধন করিতে হইবে। যে চিন্তা ও কর্ম্মের প্রভাবে আমরা কেবলমাত্র নাগরিক ব্যক্তিত্বের পুষ্টি বিধান করিতেছি, সর্ব্বাঙ্গীন নাগরিক ব্যক্তিত্ব নহে, একটি দীন

হীন নিকৃষ্ট ব্যক্তিত্বকে সমাজের আদর্শরূপে স্থাপন করিতেছি, যাহাদের প্রভাবে আমরা নগরের আফিস আদালত সেরেস্তায় দেশের মনুষ্যত্বকে নায়েব, সেরেস্তাদার, বড়বাবুর হাতে গড়িতে দিয়াছি, পল্লীগ্রামের অন্ন পল্লীগ্রামে সঞ্চয় না করিয়া বিদেশী বণিকদিগের হাতে অফুরন্ত তুলিয়া দিতেছি, পল্লীগ্রামের উপকরণ দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় ব্যবহার করিবার জন্য কারখানা স্থাপন না করিয়া বিদেশের কারখানায় পাঠাইয়া দিতেছি, দেশে স্বাভাবিক গমনাগমন ও বাণিজ্যপথ, নদনদী খালগুলিকে চক্ষের সম্মুখে শুষ্কপ্রায় হইতে দেখিয়াও বহির্বাণিজ্যের প্রশস্ত রেলপথ নির্ম্মাণে আনন্দে অধীর হইতেছি,—পল্লীবাসী কৃষিজীবিগণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বাধ্যকরী লোকশিক্ষা-বিধির নামে করতালি দিতেছি,—সে চিন্তা ও কর্ম্ম লোপ না পাইলে সমাজের মঙ্গল নাই, নগরের গৌরব নগরবাসীদের হীনতা, এবং পল্লীর দুঃখ দারিদ্র্য দেশবাসিগণের মোহান্ধতার স্থায়ী চিহ্ন থাকিবে—নগরে দুই একটা বঙ্গলক্ষ্মী মিল বা হিন্দুস্থান কোম্পানী সে হীনতাকে দূর করিতে পারিবে না, পল্লীগ্রামে দুই একটা পল্লী-পরিষৎ বা সেবাশ্রম সে দুঃখদারিদ্র্যমোচন বা স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে পারিবে না।

পল্লী-পরিষৎ গঠিত হউক, সেবাশ্রম স্থাপিত হউক, স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা হউক, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হইবে—যতক্ষণ আমরা সমাজের আধুনিক ব্যবস্থা, চিন্তা ও কর্ম্মের গতির পরিবর্ত্তন করিতে না পারি। আমরা শিক্ষা, দীক্ষা, অন্নসংস্থানের

জন্য নগরে যাইতেছি, আমরা গ্রামে বাস করিলে 'চাষা' থাকিব, সভ্যতার আদব-কায়দা শিখিবার জন্য নগরে যাইতেছি,—এ ক্ষেত্রে গ্রাম বনজঙ্গল পরিপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর ত হইবেই, নগরের অধিষ্ঠাত্রী বিদেশিনী ডাকিনীর কুহক হইতে যতদিন না আমরা পলাইতে পারি, ততদিন জ্বর-রাক্ষস আমাদের রক্ত শোষণ করিবেই।

একাদশ অধ্যায় (ক)

স্বদেশী

একটা শিকলকে আমরা খুব শক্ত মনে করিতেছি। শিকল-টাকে খুব জোরে টানিল, সেটা ছিঁড়িয়া গেল। শিকলের জোর বুঝিতে গেলে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল কড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। শিকলের জোরের মত আমাদের শিল্প-বাণিজ্য-প্রণালীর শক্তি এই যুদ্ধের দুর্দ্দিনে বেশ বুঝা গিয়াছে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের দুর্ব্বলতা, এখন ঠিক ধরা পড়িয়াছে।

বিদেশে রপ্তানি বনাম দেশীয় বাণিজ্য

আমরা বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি, আমাদের কৃষি-কর্ম্মের উপর ইউরোপীয় বণিকগণ ধীরে ধীরে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, আমরা যে খাদ্যশস্য অধিক উৎপন্ন না করিয়া পাট তুলা তিসি ইত্যাদি উপকরণশস্য উৎপন্ন করিতেছি, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া আমরা যে ক্রমশ বিদেশীয় বাণিজ্যকে আমাদের সম্বল মনে করিতেছি ইহাতে দেশের সকলের, বিশেষত কৃষক শ্রমজীবিগণের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলের সূচনা হইতেছে সন্দেহ নাই।

১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে চাউল গম ইত্যাদি খাদ্যশস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কেবলমাত্র ৭·১৭ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু তুলা পাট ইত্যাদি উপকরণশস্যের পরিমাণ এই কয় বৎসরে ৫০·০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমরা আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব জন্য যে বিদেশীয়দিগের উপর নির্ভর করিতেছি শুধু তাহা নহে ; আমাদের কৃষি, দেশীয় অভাবমোচনের জন্য অধিক তৎপর না হইয়া আপনার উন্নতির জন্য বিদেশীদিগের অভাব মোচনে ব্যস্ত হইয়াছে।

ইউরোপীয় যুদ্ধ আমাদের বিদেশীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করিয়া আমাদের অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া দিল। আমরা না বুঝিয়া একটা ভুল বাণিজ্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলাম। এখনকার অন্নকষ্ট আমাদের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

পাটের উদাহরণ হইতে শিক্ষা লাভ

আমাদের কৃষকগণ পাট চাষ করিয়া বিদেশে পাট রপ্তানি করিয়া কিছু অর্থলাভ করিতে পারিয়াছিল। যুদ্ধের সময় পাট উৎপন্ন করিয়া কৃষকগণ তাহা বিক্রয় করিতে পারে নাই, মাঠের পাট মাঠে পচিয়াছে, কৃষকগণের হা হুতাশ সত্ত্বেও ব্যাপারীরা পাট ক্রয় করে নাই। পূর্ব্ববঙ্গে পাটই কৃষকের প্রধান সম্বল। পাট বিক্রয় না হওয়াতে সেখানে অন্নকষ্ট দেখা গিয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে পাট বিক্রয় যে কত কমিয়া গিয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত তালিকাটি পড়িলে বুঝা যাইবে।

জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ১৯১৩		ঐ কয় মাস ১৯১৪
নারায়ণগঞ্জ	৩১, ৯০, ৩৫৪ মণ	৬৮, ৪০০ মণ
চাঁদপুর	১১, ৯৯, ৯০১ মণ	৬, ৯৭, ২১০

সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জ হইতেও পূর্ব্ব বৎসরের এক তৃতীয়াংশ মাত্র পাট রপ্তানি হইয়াছে।

পাট উৎপন্ন করিয়া ঘরে অর্থ আসিল না। পাটে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং অনেক কৃষক অর্দ্ধাশনে অনাহারে রহিয়াছে।

ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের দুরবস্থা ও পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকের অন্নকষ্টের কথা স্মরণ করিতে আমরা এই কয়টি বৈষয়িক তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি।

১। কোন দেশেরই পক্ষে খাদ্যশস্য চাষ হ্রাস করিয়া উপ-করণশস্য চাষের উৎসাহ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

২। অর্থলাভ বৈষয়িক ক্ষেত্রেও সার্থক নহে যখন অর্থের বিনিময়ে খাদ্য পাওয়া সুকঠিন।

৩। উপকরণ শস্য চাষ সেই ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, যখন উহা হইতে দেশেরই কলকারখানার দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

৪। পূর্ব্বলিখিত ব্যবস্থায় উপকরণশস্য চাষ সুবিধাজনক হইলেও খাদ্যশস্যের পরিবর্ত্তে উপকরণশস্য উৎপন্ন করা মঙ্গলজনক নহে।

উপায় কি ?

এখন উপায় কি? উপায় হইতেছে পাট চাষের পরিবর্ত্তে ধান্যচাষ পুনরায় প্রবর্ত্তন করা। ইতিমধ্যে অন্নকষ্ট সহ্য করিতে

হইবে। এক উপায় ছিল—অন্য দেশে যুদ্ধের সময়ে এরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে—গভর্ণমেণ্ট, যে পাট বিক্রয় হয় নাই তাহা ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু আধুনিক ক্ষেত্রে তাহার সম্ভব নহে। তবে যতদিন না ধান্য আবশ্যকমত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ততদিন অন্নকষ্টকেই বরণ করিতে হইবে।

এই অন্নকষ্ট হইতে যদি আমাদের উপকরণশস্য চাষের কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, যদি দেশের কৃষকদিগের এ সম্বন্ধে চোখ ফুটে, তবে বর্ষব্যাপী কলেরা বসন্ত অপেক্ষা এই অন্নকষ্টই বাঞ্ছনীয়।

বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় আমরা আমাদের বর্ত্তমান কৃষির দুর্ব্বলতা বুঝিলাম। শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রেও আমাদের অক্ষমতা এই যুদ্ধ হেতু প্রতীয়মান হইয়াছে।

স্বদেশী ও সংরক্ষণ

ইউরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে দ্রব্যের আমদানি ও আমাদের দেশ হইতে ঐ দুই দেশে রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন অংশের সহিত শত্রুপক্ষের বাণিজ্য চলে নাই। ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সভা, জর্ম্মাণী এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় ঔষধ, রাসায়নিক উপকরণ, রং, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল, সে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

আমাদের দেশেও যুদ্ধের মধ্যে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়া জর্ম্মাণ-বাণিজ্য হস্তগত করিবার একটা আন্দোলন জাগিয়া উঠি-

য়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন, শিল্প-সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা আবার দেখা দিয়াছিল। এবার ইংরেজ পত্রিকা স্বদেশী লইয়া কোন বিবাদ করে নাই। ইংলিশম্যান লিখিয়াছেন, দেশে এতদিন অবাধ-বাণিজ্যনীতি প্রচলিত ছিল; সেই জন্য বৈদেশিক পণ্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এক্ষণে জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে যে সকল দ্রব্যের আমদানী হয়, সে সকল দ্রব্য দেশবাসীরই পক্ষে প্রস্তুত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঠিক নয় বৎসর পূর্ব্বে এ কথা ইংলিশম্যান বলিলে দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। যাহা হউক, সত্য কথা বলিলে দোষ নাই, মিথ্যা বলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিলম্বে হইলেও ভাল।

জর্ম্মাণীর বাণিজ্য

জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে আমরা যে সকল দ্রব্যের অধিক আমদানী করিয়া থাকি, তাহাদের তালিকা অনুধাবন করিলে আমাদের কোন্ কোন্ শিল্পের উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য তাহা বুঝা যাইবে।

	যুদ্ধের পূর্ব্বে লক্ষ	যুদ্ধের পরে লক্ষ
১। পোষাক পরিচ্ছদ	১০	৯.২
২। রং	৮২	৭৬
৩। কাচ, চুড়ী ইত্যাদি	৬২	১২০

		যুদ্ধের পূর্ব্বে	যুদ্ধের পরে
৪।	পশমী দ্রব্য	৭১	৯
৫।	চিনি	১৪০৯	১৬০৭
৬।	লোহার কল, কড়ি ইত্যাদি	৬৪	৩৫
৭।	কাগজ	৩	১৯

তালিকায় সকল দ্রব্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু উহা হইতে আমরা মোটামুটি আমাদের বৈষয়িক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি।

পোষাক-পরিচ্ছদ

পোষাক-পরিচ্ছদ, সার্ট, গেঞ্জী প্রভৃতি বোম্বাইয়ের কলে তৈয়ারী হইতে পারে; কিন্তু যতদিন না ব্যবসায়ীরা তাহাদের শিল্পপ্রণালীতে পুরাতন পথ ছাড়িয়া না দেয়, ততদিন ইহা অসম্ভব। তাহা ছাড়া বোম্বায়ের ব্যবসায়ীদিগের এখন দুঃসময়। চীনে অনেক কাপড় বিক্রয় হয়, কিন্তু জাহাজ অভাবে চীনের সহিত বাণিজ্য লোপ পাইয়াছে। অনেক সূতা ও কাপড় তৈয়ারী রহিয়াছে, মাল বিক্রয় হইতেছে না। কাজেই অনেক মিলে এখন কাজ বন্ধ রহিয়াছে। Jacob, Sassoon, China, Moon প্রভৃতি কল একেবারেই বন্ধ; অন্য সকল মিলে খুব কম কাজ হইতেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বোম্বায়ের ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সার্ট, গেঞ্জী প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া জর্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগের স্থান অধিকার করা বড় সহজ নহে।

স্বদেশী রং

আমাদের দেশে গাছ গাছড়া হইতে রং তৈয়ারী হইত। জর্ম্মাণী আলকাতরা হইতে অতি সস্তায় সুন্দর রং তৈয়ারী করিয়া পৃথিবীময় বিক্রয় করিতেছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যাহারা রং তৈয়ারী করিত, তাহারা এখন অন্য শিল্পে মনোযোগ দিয়াছে, কাজেই পুনরায় এ দেশে দেশীয় প্রণালীতে রং তৈয়ারী করা বড় সহজ নহে। তবুও অনেকে মনে করিতেছেন, নীল হইতে রং তৈরারী করা এখন সম্ভবপর, কিছু উন্নতির সম্ভাবনাও আছে। এমন কি, বেহারে কয়েক জায়গায় নীলকুঠিও স্থাপিত হইয়াছে। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রঙ্গ বিবেচনা করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে জর্ম্মাণ রংয়ের সহিত দেশীয় নীল প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতে পারে।

কাচের ব্যবসায়

৬৲ লক্ষ টাকার কাচ চুড়ি ইত্যাদি আমরা জর্ম্মাণী হইতে যুদ্ধের পূর্ব্বে আমদানী করিতাম। ১৯২০।২১ সালে ১২০ লক্ষ টাকা কাচের দ্রব্য ভারতবর্ষ জর্ম্মাণী হইতে আমদানী করিয়াছে। আমাদের দেশে কুটীরে শিল্পীরা কাচের চুড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে—বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া

এ ক্ষেত্রে কুটীর-শিল্পের কত দূর উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বেলজিয়াম্ ও জাপানে কুটীর-শিল্পপ্রণালীর দ্বারাই সুন্দর সুন্দর কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে—আমাদের দেশে তাহা করিবার চেষ্টা করিলে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। পঞ্জাবে কয়েকটা কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা এই সুযোগে খুব উন্নতি লাভ করিবে নিশ্চয়।

কুটীরে কাচ তৈয়ারী

পঞ্জাবে যাহারা কুটীরেই কাচের চুড়ী ইত্যাদি তৈয়ার করে, তাহারাই কাচের কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছে। জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে যে সকল Blower-কে পূর্ব্বে আনা হইয়াছিল, তাহাদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত বেশী, এমন কি ২০০৲ হইতে ৩০০৲ পর্য্যন্ত। এ দিকে দেশীয় শিল্পীরা কারখানায় প্রবেশ করিয়া অতিসুন্দর কাজ করিতে শিখিয়াছে, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া ইউরোপীয় শিল্পীর মতই পারিশ্রমিক আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত এবং কাচের কাজ তাহাদের একচেটিয়া হওয়াতে তাহারা বেশী পারিশ্রমিক লইয়া কারখানার পরিচালকদিগকে ঠকাইবার জন্যও সচেষ্ট। উপযোগী কাচ পঞ্জাবে খুব সস্তায় মিলে, পঞ্জাবের আবহাওয়া কাচ তৈয়ারীর উপযোগী; অনেক মূলধন কাচের কারখানায় নিয়োজিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তবুও কিছু হইতেছে না। যাহারা কুটীরে বসিয়া দেশীয় প্রণালীতে ভাঙ্গা শিশি,

চিমনি গলাইয়া কাচের চুড়ী তৈয়ারী করে তাহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিখাইবার ব্যবস্থা করিলে কাচের কারখানা কয়জন নিপুণ শিল্পীর একচেটিয়া হয় না। কে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে? আমরা, না গভর্ণমেণ্ট? শিক্ষার এরূপ একটা ব্যবস্থা করিলে এই সুযোগে কারখানাগুলা কি দাঁড়াইয়া যাইতে পারিত না?

চিনির ব্যবসায়ের অবনতির ইতিহাস

তাহার পর চিনি তৈয়ারীর কথা। আমাদের দেশ হইতেই কিছুকাল পূর্ব্বে দেশ বিদেশে চিনি রপ্তানী হইত। পাশ্চাত্যজগৎ ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বাধিক পরিমাণে চিনি আমদানী করিত। আর এখন আমরা যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে চিনি পাইব না বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছি।

নেপোলিয়নের মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের ব্যবসায় ধ্বংস করিবার জন্য নেপোলিয়ন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের প্রস্তুত অথবা ইংলণ্ড কর্ত্তৃক আনীত কোন দ্রব্য ইউরোপের লোক ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইউরোপ তখন ইংলণ্ড হইতে অনেক পরিমাণে চিনি আমদানী করিত। যুদ্ধের সময় সে আমদানী বন্ধ হওয়াতে, ফ্রান্স জর্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ মহাবিপদে পড়িল। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের একজন বিজ্ঞানাধ্যাপক বিট হইতে চিনি তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮০১ সাল পর্য্যন্ত বিট চিনির কারখানা তৈয়ারী হয় নাই। প্রথমে ফ্রান্সেই অধিক

পরিমাণে বিট চিনি তৈয়ারী হইতে লাগিল, তাহার পর জর্ম্মাণী গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইয়া চিনির ব্যবসায়ে লাগিল। অন্য দেশে জর্ম্মাণ ব্যবসায়িগণ যাহাতে চিনি বিক্রয় করিতে পারে, তাহার সুবিধাবিধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিলেন। এরূপে জর্ম্মাণী বিট চিনির ব্যবসায়ে প্রাধান্য লাভ করিল।

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া হইতে বিট চিনি এবং যবদ্বীপ ও মরিষাস হইতে আখের চিনি প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতে লাগিল। আমাদের দেশীয় চিনির ব্যবসায় বিনষ্টপ্রায় হইল।

আমাদের দেশে এখন চিনি আমদানী বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া চিনির কারখানার দিকে গভর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের নজর পড়িয়াছে। দেশীয় প্রণালীতে চিনি তৈয়ারীর অনেক বিষয়ে উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে। খাঁ বাহাদুর মহম্মদ হাদি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দেশীয় প্রণালীর উন্নতিসাধন করিয়া দেশবাসীর বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বাংলাদেশে হাদির উন্নত প্রণালী ব্যবহৃত হইলে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশে চিনি তৈয়ারী

চিনির কারখানা অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। বাংলা-দেশে একটানা বিস্তৃত আখের ক্ষেত নাই; সুতরাং চিনির

কারখানা স্থাপনের এখানে সুবিধা কম। আখ গুদামে সঞ্চিত করিলে নষ্ট হইবে, কারখানায় এত অধিক আখ প্রত্যেক দিনেই প্রয়োজনীয় যে খুব বিস্তৃত আখের ক্ষেতের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করিলে কারখানা চলিবে না। তাহা ছাড়া যবদ্বীপের চিনি প্রথমে জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসে, তাহার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সঞ্চালিত হয়। বাংলা দেশের চিনির কারখানা "সংরক্ষিত" না হইলে তাহার পক্ষে যবদ্বীপের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব।

লোহার কল, কড়ি ও কাগজ তৈয়ারী

লোহার কল, কড়ি ইত্যাদি আমাদের সাকচির বিপুল কারখানায় তৈয়ারী হইতেছে। জর্ম্মাণ হইতে এ সকল দ্রব্যের আমদানী কমিলে ভারতীয় কারখানা উন্নতি লাভ করিবে সুনিশ্চিত।

দেশে অনেকগুলি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কয়টি গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্ট লাভ করিয়াছে তাহাদের অবস্থা মন্দ নয়, বাকীগুলি অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মাণীর কাগজের সহিত প্রতিযোগিতায় কোন রকমে বাঁচিয়া আছে।

যে সকল দ্রব্য আমরা জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া হইতে আমদানী করিয়া থাকি, সে সকল দ্রব্যের দেশীয় কারখানায় তৈয়ারীর ব্যবস্থা এবং অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

বাণিজ্যে জর্ম্মাণীর প্রভুত্ব ও আমাদের শিক্ষা

অন্য দেশ অপেক্ষা জর্ম্মাণী এই সকল দ্রব্য বিষয়ে ব্যবসায়ে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। আমরা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারিব।

আমদানী দ্রব্য বিষয়ে যুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মাণীর ব্যবসার অংশ।

	শতকরা
তৈয়ারী নীল	৮৮·৬
অন্য প্রকার তৈয়ারী রং	৭৯·৭
আলুমিনিয়াম	৪৮·২
ষ্টীল	৩৬·৪
তামা	৩৫·৫
ছুরি কাঁচি ইত্যাদি	৪৩·৪
পশম	২৭·৯
খেলনা	২৬·২
মদ	২৪·১
কাগজ	১৭·৩
কাচ	১৪·৭
রাসায়নিক দ্রব্য	১২·৪

যুদ্ধের পরেই জর্ম্মাণী এই সকল শিল্পব্যবসায়ের প্রসারের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে ব্রতী হইয়াছে।

এই বৎসরে জর্ম্মাণীর হঠাৎপ্রভুত্ব

১৯২০-২১ সালের ভারতীয় বাণিজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য বিষয় হইতেছে জর্ম্মাণীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

ভারতবর্ষের সহিত জর্ম্মাণীর বাণিজ্যের মূল্য ১৯১৯-২০ সালে দেড় কোটী টাকা হইতে পর বৎসর সাড়ে তের কোটী হইয়াছে অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বের ব্যবসার এক তৃতীয়াংশ জর্ম্মাণী ফিরিয়া পাইয়াছে।

আমদানী দ্রব্য		
তৈয়ারী নীল	১১৭	লক্ষ
লোহা ও ষ্টীল	৫৭	"
কাচ	২০	"
লবন	৩৫	"
কাগজ	১৯	"
কল	১৭	"
কাপড়	৯	"

রপ্তানীর পরিমাণ ৮ $\frac{৩}{৪}$ ক্রোড় হইয়াছে। তুলা—৩ $\frac{১}{২}$ এবং ২ $\frac{১}{৩}$ ক্রোড়।

জর্ম্মাণী উন্নত-বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যকে সংরক্ষণ করিয়া আপনার বিরাট শিল্প ও ব্যবসার অনুষ্ঠান গঠন করিয়াছে। আমাদের প্রতিযোগী

প্রবলপরাক্রমশালী। প্রতিযোগিতায় সফল হইতে হইলে আমাদিগকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে এবং যুদ্ধ যে কয় বৎসর চলিয়াছিল সেই সময়ের মধ্যে ব্যবসায় জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইত। এক একটা বড় যুদ্ধের সময়ে শুধু রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়া হয় না, ব্যবসায়-জগৎও তোলপাড় হয়, ব্যবসায়েরও ভাঙ্গা-গড়া হয়। এই যুদ্ধের সময়ে আমরা আমাদের নষ্টশিল্পের জীবনদান অথবা ম্রিয়মান শিল্পের জীবনরক্ষার একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সময়েও আমাদের বুদ্ধি কার্য্যকুশলতা আমাদের কাজে আসে নাই, সুযোগলাভ সত্ত্বেও আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলাম। তাই আমরা যে তিমিরে কাল ছিলাম, সে তিমিরে আজও আছি।

মথি অঙ্গহরে পর স্বর্গসুখে
তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে।

জর্ম্মাণীর প্রতিযোগী হইতে হইলে, জর্ম্মাণীর হাতিয়ার হাতে লইতে হইত। জর্ম্মাণী কি উপায়ে তাহার শিল্প ও বাণিজ্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে তাহা এবং জর্ম্মাণীর শিল্প ও ব্যবসায় প্রণালী আমরা এ দেশে নিয়োগ করিতে পারিব কিনা আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে।

জর্ম্মাণীর সংরক্ষণ-নীতি

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা অপেক্ষা জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া ভারতীয় বাণিজ্যে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ১৯০৮-১০ সালের বাণিজ্যের সহিত ১৯১৪-র বাণিজ্য তুলনা করিলে আমরা ইহা দেখিতে পাইব।

১৯১০-১৯১৪ এই পাঁচ বৎসরে ব্যবসায়ের উন্নতি, শতকরা হিসাবে—

	আমদানী	রপ্তানী	মোট
জর্ম্মাণী	৯৬.১	৪৬.৪	৫৯.৪*
অষ্ট্রিয়া	৬৬.৯	৫৩.৮	৫৭.৫
ইংলণ্ড	৬০.৩	১৮.৭	৪৩.৬
ফ্রান্স	১১৬.২	১৯.০	৩৪.৮
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৩০.২	৫০.৫	৪৬.৪
(১৯২০।২১) ইংলণ্ড	৬১	২১.৯	৪৪.১

সাধারণ বাণিজ্যে, বিশেষতঃ ভারতীয় বাণিজ্যে, জর্ম্মাণীর এই অসাধারণ উন্নতির কারণ কি? যুদ্ধের পর বাণিজ্যে জর্ম্মা-ণীর অসাধারণ পুনঃ প্রতিষ্ঠারই বা কারণ কি? জর্ম্মাণীর বাণিজ্য-উন্নতিসাধন-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। জর্ম্মাণী

* অর্থাৎ যদি পূর্ব্বে ব্যবসায় হইয়াছিল ১০০ টাকার এখন ব্যবসায় হইতেছে ১,৫৯.৫ টাকার।

বাণিজ্য বড় হইয়াছিল, জর্ম্মাণী পৃথিবীর বাণিজ্য আপনার করতলগত করিয়াছিল,—একমাত্র উপায়ে।—সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া। যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা শিল্প লাভ করিতে পারে তাহা সংরক্ষণ করিয়া, যে শিল্পশিক্ষার দ্বারা শ্রম-জীবীদিগের শিল্পনৈপুণ্য বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা সংরক্ষণ করিয়া, রেলপথ জলপথ যাহাদের দ্বারা শিল্প প্রসারিত হইতে পারে তাহা সংরক্ষণ করিয়া, বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশী শিল্পকে রক্ষা করিয়া। শুধু শিল্প-সংরক্ষণ নহে, বাণিজ্য ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া। একটা ক্ষুদ্র শিশুশিল্প যাহাতে শৈশবোপযোগী আহার লাভ করিয়া সবল হইতে পারে, সবল হইয়া নিজ দেশে অবাধ স্বচ্ছন্দ বিহারের দ্বারা যাহাতে পুষ্ট হইতে পারে, রাষ্ট্র তাহার সুযোগ বিধান করিয়াছে; তাহার পর বিশ্ব-বাণিজ্যের মহামেলায় ক্ষুদ্র শিশুকে স্কন্ধে লইয়া রাষ্ট্র তাহাকে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি হইতেও রক্ষা করিয়াছে। তাই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মাণীর ক্ষুদ্র শিশুশিল্প ও শিশু-বাণিজ্য আজ কলোসাসের আকৃতি ও শক্তি লাভ করিয়াছে, তাই তাহার পদভরে জলস্থল কম্পিত, তাহার দম্ভ ও মত্ততায় জগৎ নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

এই কলোসাসের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে নামিয়াছিলাম। কিন্তু এই কলোসাসকে কে শক্তি প্রদান করিল? যে কলোসাস আজ ব্যবসায় লব্ধ অর্থে প্রতাপান্বিত হইয়া বাণিজ্য-পথে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে তাহাই ত নীট্‌শের 'অতি-মানুষ'

সাজিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপশালী। এই কলোসাস বা অতি-মানুষকে আমরাই শক্তি দান করিয়াছি। প্রবল শত্রুকে আমরাই হাতিয়ার প্রদান করিয়াছি।

অবাধবাণিজ্য ও জর্ম্মাণ পোষণ

আমাদের অবাধবাণিজ্য-নীতি জর্ম্মাণীর শিল্প ব্যবসায়ের পুষ্টি বিধান করিয়াছে, আমরাই কলোসাসের শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করিয়াছি।

অবাধবাণিজ্য-নীতির দ্বারা ইংলণ্ডের উপকার হইয়াছে সত্য; কিন্তু নিজ উপকার সাধন করিতে যাইয়া ইংলণ্ড যে তাহার শত্রুর শক্তির সঞ্চয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে তাহা এতদিন পরে সে বুঝিতেছে। আমরা ভারতবাসী ত কতকাল ধরিয়া ব্যবসায়ে শিল্পসংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনকে আমাদের শিশু-শিল্পের উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায় স্থির করিয়া বসিয়া-ছিলাম। আজ এতদিন পরে—এই যুদ্ধের দুর্দ্দিনে—ইংলণ্ড বুঝিতেছে, জর্ম্মাণীর শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা হইতে আমাদের শিল্পকে সে রক্ষা না করিয়া আপনার শক্তিকে সে হ্রাস ত করিয়াছেই, শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির উপায় বিধানও করিয়াছে।

বর্ত্তমান শিল্পসংরক্ষণ-চেষ্টা

তাই আজ দেশীয় শিল্প-সংরক্ষণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমা-দিগকে আর কিছু বলিতে হইবে না। এ সম্বন্ধে আমরা অনেক বলিয়াছি, এখন ইংরেজেরাই বলুক।

জর্ম্মাণীকে ভারতে শিল্প-ব্যবসায়ের সুবিধা প্রদান করিয়া আমরা তাহার যুদ্ধ-সিন্ধুক আর ভারী করিতে যাইব না এই সমস্ত কথা ইংরেজ সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে।

অবাধবাণিজ্য-নীতি জগতে একা ইংলণ্ডই অবলম্বন করিয়াছে; সব জাতিই ব্যবসায়ে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিয়াছে। একা ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্য-নীতি অবলম্বনের কারণ,—ইংলণ্ড শিল্প ও ব্যবসায়ে ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ডের পক্ষে অবাধবাণিজ্যে সুবিধা ছিল। কিন্তু সকল দেশই ক্রমে ক্রমে আপনাদের স্বার্থ বুঝিয়া বিদেশী দ্রব্যের অবাধআমদানীর প্রতিরোধ করিয়াছে।

নবীন জাপান অবাধবাণিজ্য-নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। জাপানের আধুনিক শিল্পোন্নতির কারণ—শিল্প ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন। এমন কি ইংলণ্ডের উপনিবেশসমূহ ইংলণ্ডের কারখানার তৈয়ারী দ্রব্যের অবাধ-আমদানী প্রতিরোধ করিয়াছে।

সকল দেশই শিল্পকে সংরক্ষণ করিয়া শিল্পের উন্নতি বিধানের উপায় করিয়াছে। এ সত্য আমরা বহুকাল হইতে জানিয়াছি। আজ ইংরেজ ব্যবসায়-জগৎ হইতে এ সত্য প্রচারিত হইল। রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়-জগৎ যখন স্বার্থের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত তখন একটা ক্ষুদ্র স্বার্থ আর সত্য প্রকাশের অন্তরায় হইল না।

এখন শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি বাস্তবিক অবলম্বিত হইবে কি না তাহা অন্য কথা। ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে শিল্প-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট একটা প্রকাণ্ড রং তৈয়ারী করিবার কারখানা যাহাতে স্থাপিত হয় তাহার আয়োজন করিতেছেন, নিজেই অনেক অংশ ক্রয় করিবেন বলিয়াছেন, এবং সমস্ত মূলধনের উপর একটা সুদ দিবারও দায়িত্ব লইয়াছেন।

কিন্তু এ দেশে শিল্প-সংরক্ষণ কথায় হইয়াছে, কাজে এখনও কিছু হয় নাই।

ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়ে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বিলাতী কাপড় দেশে আসিতেছে না, তবুও দেশী মিলের কাপড় কর (excise duty) দিতেছে। জাহাজ অভাবে চীনের সহিতও ব্যবসায় বন্ধ হওয়ায় অনেক বোম্বাই মিল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের উপর কর উঠাইয়া দিলে দেশীয় মিলগুলির অবস্থা কিছু ভাল হইত সন্দেহ নাই। যুদ্ধের জন্য মিলের তৈয়ারী সুতা বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে না; তাহাতে আমাদের তাঁতীদেরও নিশ্চয়ই সুবিধা হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথাই হয় নাই।

নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়েই ইউরোপের বিট চিনির ব্যবসার উন্নতিলাভ করিয়াছিল। আমাদের আখের চিনির ব্যব-

সায়ের তখন হইতেই অবনতি। কাপড়ের ব্যবসায়ের মত চিনির ব্যবসায়ে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা নাই। এই যুদ্ধের সময় যদি আমাদের দেশে আখের চিনির শিল্প ও ব্যবসায় সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে অচিরেই জর্ম্মাণীর ও অষ্ট্রিয়ার বিট চিনির ব্যবসা চিরকালের জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে আশা করা যায়। দেশীয় চিনির ব্যবসায় সংরক্ষিত করিতে গেলে কৃষকদিগকে আখ উৎপন্ন করিবার জন্য অর্থ দিতে হইবে, চিনির কারখানার জন্য বিনা খাজনায় বিস্তৃত আখের জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে, আখ ও চিনির জন্য রেলের ভাড়াও কমাইয়া দিতে হইবে। দেশীয় বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। চিনির কারখানার মত পশমী কাপড়, কাগজ, কাচ ও রংয়ের কারখানাও নানা অনুরূপ উপায়ে সংরক্ষিত হইতে পারে।

বাণিজ্য-সংরক্ষণ

কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে মাড়োয়ারী ধনীরা মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদিগকে যে মূলধন ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে। কাহারও নিকট তাহারা টাকা বাকী রাখে নাই। বাজারে তাই টাকার টানা-টানি। গভর্ণমেণ্ট এ জন্য সভারেন দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ব্যবসার মহলে যে একটা আতঙ্ক রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করি-

-বার উপায় নাই। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য-সংরক্ষণ প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে এখন যদি অর্থ সাহায্য করেন তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা একটু সুস্থচিত্ত হইতে পারে। টাকা এখন ঘরমুখো হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট এ সময়ে ব্যাঙ্ককে উৎসাহ প্রদান করিলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনিশ্চিততা ও অবিশ্বাস দূর হইবে, এবং টাকা ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্যবসার কার্য্যে লাগিবে সন্দেহ নাই।

আরও অনেক উপায়ে বাণিজ্য-সংরক্ষিত হইতে পারে। মিশর দেশে যে তুলা বিক্রয় হইতেছে না গভর্ণমেণ্ট তাহা ক্রয় করিয়া লইতেছে অথবা খরিদ্দারদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া তুলা ক্রয় করিতে উৎসাহ দিতেছে। বাংলা দেশে পাট ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে তুলা বিক্রয় না হওয়াতে কৃষকগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে, অনেক স্থান হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ আসিতেছে। পাট ও তুলা গভর্ণমেণ্ট নিজে ক্রয় করিয়া লইলে* অথবা দেশীয় কোন ব্যবসায়-অনুষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করিয়া ক্রয় করিতে উৎসাহ প্রদান করিলে কৃষকেরা রক্ষা পাইবে।

কত উপায়ে যে শিল্প ও বাণিজ্য-সংরক্ষিত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। উল্লেখ করিয়াই বা কি হইবে? এ সম্বন্ধে যদি প্রয়াস লক্ষিত হইত তবে এ সকল বিষয়ের আলোচনা সার্থক হয়।

---

* যব ক্রয় করিবার প্রস্তাব উত্থাপনের বহুপূর্ব্বে ইহা লেখা হইয়াছিল।

তথাপি আর একটি উপায়ের উল্লেখ না করিয়া আলোচনা শেষ করিতে পারিলাম না। অন্যদেশ অপেক্ষা জর্ম্মাণী যুদ্ধের পূর্ব্বে আমাদের দেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চামড়া ক্রয় করিত।

	রপ্তানির শতকরা অংশ
গরুর চামড়া	৪৮.৩
ছাগলের চামড়া	৩.৪

যুদ্ধের সময় আমাদের দেশ হইতে চামড়া আর রপ্তানী হইতে পারে নাই। অথচ জুতার দাম খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল; যুদ্ধে অধিক জুতা যে প্রয়োজন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এই সময়ে চামড়ার কারখানাকে যদি গফর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য প্রভৃতি নানা উপায়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন তাহা হইলে আমাদের একটি শিল্প অন্ততঃ জর্ম্মাণীর ব্যবসায়ের স্থান পূরণ করিতে পারিত। গত বৎসরের শেষ কয় মাসে এ দেশ হইতে জর্ম্মাণীতে চামড়ার রপ্তানী আবার স্থুরু হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে শিক্ষালাভ

দেশে শিল্প ও ব্যবসায় সত্য সত্যই সংরক্ষিত হউক বা না হউক ইউরোপীয় যুদ্ধ হইতে আমরা শিক্ষা করিলাম:—

(ক) কখনও কোন দেশের পক্ষে খাদ্য-শস্য চাষের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় বাণিজ্যোপযোগী উপকরণ শস্যের চাষ বাঞ্ছনীয়

নহে; কৃষকগণ সাময়িক স্বার্থের জন্য উপকরণ-শস্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করিলে অবাধ উপকরণ-শস্য-চাষ সংযত ও খাদ্য শস্য চাষকে সংরক্ষিত করিতে হইবে।

(খ) শুধু কৃষিকে যে সংরক্ষিত করিতে হইবে তাহা নহে; শিশু শিল্পের পুষ্টিসাধনের একমাত্র উপায় সংরক্ষণ। ইংলণ্ড ও তদধীন ভারতবর্ষ ব্যতীত প্রত্যেক দেশই শিল্প-সংরক্ষণের দ্বারা শিল্প-সমূহের উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইংলণ্ডও এক্ষণে শিল্প-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছে।

(গ) বাণিজ্যকেও সংরক্ষিত করিতে হইবে। ব্যবসায়ের জন্য মূলধন জোগাইয়া এবং বিদেশে রপ্তানীর জন্য অর্থ সাহায্য (bounties) করিয়া দেশীয় বাণিজ্য ও বিদেশে বাণিজ্যের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে।

শিল্পরক্ষা সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য

শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনের জন্য শিল্প ও ব্যবসায় বিদ্যাকে সংরক্ষিত করিতে হইবে। উপযোগী শিল্প-ব্যবসায়-বিদ্যার প্রসার ভিন্ন শিল্পোন্নতি একেবারেই অসম্ভব। বিশেষতঃ যে রাসায়নিক বিদ্যোন্নতি ভিন্ন উন্নত কৃষি ও শিল্পকর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তন অসম্ভব তাহার উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। শুধু শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা প্রচার নহে, ব্যাঙ্ক রেল ও জলপথের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, শ্রমজীবী-সংঘটন প্রভৃতি নানা দিকে

সমাজের দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। শিল্প ও কৃষিকর্ম্মের পুষ্টি-সাধনকল্পে ব্রতী হইলে সমাজ ক্রমশঃ নূতন নূতন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। সমাজ তখন ব্যক্তির সহিত একটা নূতন রকম সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। সমাজের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে, সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন, ব্যক্তিজীবনের প্রধানতম লক্ষ হইবে সমাজ জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধন। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জর্ম্মাণীতে তাহাই এক প্রকার হইয়াছিল, তাহারই ফলে জর্ম্মাণ-সমাজ শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে হস্তনিক্ষেপ করিয়া তাহাদের এত উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিল, তাহারই ফলে জর্ম্মাণীতে ব্যক্তি সমাজের নিকট আপনাকে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া কখনও তাহার স্বাধীনতা হারায় নাই। ভাবুকপ্রবর হেগেল ব্যক্তির সহিত সমাজের এই নূতন সম্বন্ধের বাণী প্রচার করেন, আধুনিক জর্ম্মাণীর জাতীয় জীবনের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহৎ তাহারই মূলে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধের যে নীতি হেগেল প্রচার করিয়াছেন তাহাই। লর্ড হ্যালডেন এ সম্বন্ধে তাঁহার দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ব্যবসায় প্রচারক

আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের সংরক্ষণ কাহারা করিবেন? দেশে যেমন শিক্ষা প্রচারক পরহিতব্রত সন্ন্যাসী

দেখা দিয়াছেন, সেরূপ ব্যবসাক্ষেত্রেও ত্যাগী প্রচারক আবশ্যক। ধনী ভূম্যাধিকারীগণের মধ্যে যতদিন না এমন শ্রেণীর ত্যাগী দেখা যায়—যাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব দেশের ব্যবসায়ের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিবেন, ততদিন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি অসম্ভব। যাহা রুশিয়ায় পীটার দি গ্রেট করিয়াছিলেন, যাহা জর্ম্মাণীতে ও জাপানে রাষ্ট্র করিয়াছে, বরোদা রাজ্যে গাইকোয়াড় করিতেছেন, সেই মহা কর্ত্তব্য সাধনের গুরুভার ভারতবর্ষের ধনী ভূম্যাধিকারীদিগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। আমাদের বাংলা দেশের ভূম্যাধিকারীগণের মধ্যে কেহ কি আপনার সর্ব্বস্ব সমস্ত ধন-জন-সম্পদ দেশের কল্যাণব্রতে নিয়োগ করিয়াছেন?

দ্বাদশ অধ্যায়

পল্লী-স্বরাজ

গ্রাম ও সমাজ-জীবন

আবার বাঙ্গালার তরুণ প্রাণকে স্পন্দিত করিয়া এক নূতন আন্দোলন জাগিতেছে। ১৯০৫-১০ সালের জাতীয় শিক্ষার কথা আবার আমরা শুনিতেছি। বাঙ্গালী যুবকের স্বাধীন শিক্ষা ও জীবিকার কথা শুনিতেছি। সেই পল্লীসেবা ও পল্লীসংস্কারের আকাঙ্ক্ষা আবার জাগিতেছে। নিরন্ন কৃষকের সেবার ভার শিক্ষিত সমাজ আবার গ্রহণ করিতেছে। মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা পরিষৎ ও মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতির নৈশ-বিদ্যালয় ও শ্রমজীবি-আন্দোলনকে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া এক বিরাটতর অভিযানে বাঙ্গালার যুবক আবার নামিতেছে। পৃথিবীতে যখন যেখানে গ্রাম-প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তখনই তাহা সাহিত্য, সমাজ ও বৈষয়িক জীবনে একটা যুগান্তর আনয়ন করে। জর্ম্মাণীর সেই Aufklarung নবজাগরণের প্রথম পুরোহিত হার্ডার লোকসাহিত্য ও গ্রাম্য-সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা

করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে ভাবাত্মক যুগান্তর, Romantic Movement, আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে এমন কি শিল্পী-শ্রেষ্ঠ গেটেরও অন্তঃকরণ সাড়া দিয়াছিল। শীলার তাঁহার নাটক-গুলিতে জনসমাজের নবজাগ্রত চৈতন্যকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অচিরে এমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল যাহার ফলে জর্ম্মাণীর সেই War of Liberation, মুক্তির যুদ্ধ, তাহার বিপুল প্রসারের সেই প্রথম চেষ্টা। ঠিক তেমনি ভাবে রুশিয়ায় যখন ডানিলেভস্কি প্রমুখ শ্লাভোফিলগণ গ্রাম-প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রকাশ করিলেন তখনই সমগ্র সমাজ ব্যাপিয়া একটা ভাবান্তরের সূচনা হইল। হার্জেন প্রচার করিলেন যে, পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রের ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা ও প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সমূহজ্ঞানের সমন্বয় না হইলে রুশিয়ার উন্নতি অসম্ভব এবং সেই উন্নতিকে রুশিয়ার অসংখ্য স্বাধীন গ্রাম্য-সমাজের ভিত্তিতে সুদৃঢ় করিতে হইবে। তাহার পর হইতে রুশিয়ার প্রায় সমস্ত চিন্তাশীল লোকই গ্রাম্য-সমাজের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িতে চাহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকের চিন্তার ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুস্কিনের সেই ভাবোন্মত্ত কাব্যধারা ত্যাগ করিয়া তুর্গেনিভের সেই অতিমাত্র শিল্প ও সার্ব্বজনীন বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া, জাগিয়াছে এক নূতন সাহিত্য যাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছে টলষ্টয়ের সেই বিশ্ব-বিশ্রুত কৃষক-প্রেমে, ডষ্টয়ফেস্কির সেই হীনতার ও পাপের মহিমা কীর্ত্তনে, গর্কির সেই মর্ম্মন্তুদ জ্বালাময় ভ্রাতৃত্ববোধে। আবার আয়র্-লণ্ডের আধুনিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে

পাই, কর্ম্মবীর হোরেশ প্লানকেটের পল্লী-সমাজ ব্যাপিয়া সেই বিরাট কৃষি-সমবায় গঠন একদিকে যেমন ঋষিকল্প জর্জ্জ রাসেলের মিষ্টিক কবিতার ও তত্ত্বদর্শনের উপাদান যোগাইয়াছে, অপর দিকে একটা কেল্টিক জাগরণের সূচনা করিয়া আয়র্লণ্ডীয় সাহিত্য, গীতিকাব্য, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে নববলে বলীয়ান করিয়াছে। আর একদিকে বলকান রাষ্ট্রসমুদয়ে নব্য স্থপতির অভ্যুত্থান সেখানকার লোকসাহিত্যের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

এই যে এখন গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের আবার জাগিতেছে, তাহাতে আমাদের আবার যে সাহিত্যের স্বাধীনতা ও সম্পদ বাড়িবে শুধু তাহা নয়, সমাজের উচ্চ ও অধঃশ্রেণীর ভাব বিনিময় আমাদের নিকট রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আরও গভীর ও জ্বলন্তভাবে ফিরাইয়া আনিবে, আমাদের বৈষয়িক জীবনের পরাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচাইয়া দিয়া আমাদিগকে ধনে বলে ঐশ্বর্য্যে বলীয়ান করিবে সন্দেহ নাই।

কৃষকের অধিকার

বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে, এই যে নূতন democracy আমরা পাশ্চাত্য জগৎ হইতে পাইলাম তাহা আমাদের বিরাট কৃষক-সমাজের সহিত একেবারেই খাপ খায় না। যে রাষ্ট্রীয়-

অনুষ্ঠান উপর হইতে চাপাইয়া বসান হয়, কৃত্রিম ভাবে রিপোর্ট, কমিশন দ্বারা যাহা সৃষ্ট, অথবা সংস্কৃত, তাহা শ্রেণী-বিরোধ না ঘটাইয়া পারে না। এই যে চটুল, কলহপ্রিয় কাউন্সিলগুলি সৃষ্ট হইল তাহাদের বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে নির্ব্বাক কৃষক ও শ্রমজীবি-সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগ স্থান পাইবে না। মধ্যবিত্ত, ধনী ও জমিদারগণই তাঁহাদের বুদ্ধি ও আদর্শ অনুযায়ী আইনকানুন করিবেন। নিরক্ষর কৃষকশ্রেণী সেই তিন বৎসর অন্তর ভোট দিবার সময় একবার হয় ত রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের কথা ভাবিলেও ভাবিতে পারে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর তাহাদের সহিত সদস্যগণের কোন সম্বন্ধই থাকিল না এবং সদস্যগণও শুধু খবরের কাগজ ও শহরের বক্তৃতা হইতে দেশের অভাব ও অভিযোগ মোচনের পন্থা নিরূপণ করিয়া লইবে। এই গেল আমাদের কথা।

প্রজাতন্ত্রের নূতন দিক

অপর দিকে পাশ্চাত্য জগতের প্রজাতন্ত্র এই কয় বৎসরের মধ্যে এক নূতন দিকে বিকাশ লাভ করিতেছে। ভোট হইল, একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইল এবং তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত কাজ চালাইলেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলি নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, অপর দিকে ব্যুরক্রেসি বা আমলাতন্ত্রের প্রকোপ বাড়িতে বাড়িতে শেষে

তাহার চাপ দুর্ব্বহ ও সর্ব্বগ্রাসী হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকায় স্থানীয় রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রগুলির রক্ষা করিবার আয়োজন চলিতেছে। ফ্রান্সে regionalism মানেই হইতেছে চৌকা চৌকা কৃত্রিম শাসনবিভাগ-নীতিকে ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক সমাজ ও ব্যবসায় বিষয়ক বিভাগকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রীয় শক্তির উদ্বোধন ও উৎসাহ প্রদান।

আর একদিকে যাবতীয় শ্রমজীবী তাহাদের বিভিন্ন কারখানা ও ব্যবসায়ে স্বায়ত্তশাসন চাহে। শ্রমজীবিগণ এইরূপে ব্যবসায় বিষয়ে পরোক্ষ শাসন ও নির্ব্বাচন-প্রথা ত্যাগ করিয়া আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে স্বরাজ স্থাপনের প্রয়াসী।

এই সকল আন্দোলনের ফলে, এমন কি ইংলণ্ডেরও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পার্লামেণ্টশাসনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রজাতন্ত্রের সংস্কার-সাধন করিতে চাহিতেছেন। যাহাতে রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যক্তির নিকট বস্তুতন্ত্রহীন না হইয়া তাহার দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে, তাহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইংলণ্ডের কারখানা অথবা ব্যবসায়ক্ষেত্র ভিন্ন এই ভাবে নির্ব্বাচন-নিরপেক্ষ-স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়া পাওয়া অসম্ভব।

আমাদের নীরব প্রজাতন্ত্র

প্রাচ্য-ভূখণ্ডে এইরূপ দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনকে আশ্রয় করিয়া একটা কর্ম্মঠ ও আড়ম্বরবিহীন প্রজাতন্ত্র চলিয়া আসিতেছে

যাহাকে ভিত্তি না করিলে সমস্ত শাসন-সংস্কার বিফল, এমন কি বিপদসঙ্কুল হইবার কথা। চীন মহাদেশের একান্নবর্ত্তী পরিবার, গোষ্ঠী ও গ্রাম্যমহাজন বিবাদ নিষ্পত্তি, শান্তিরক্ষা ও সংস্কার, আর্ত্তসেবা, যৌথ-ব্যবসায় প্রভৃতির ভার লইয়া এক প্রত্যক্ষ, নিরন্তর উদ্যোগী, অক্ষয় প্রজাতন্ত্রের সাক্ষ্য দিতেছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে কোন্ দূর শতাব্দী হইতে যে এক স্বাধীন গ্রাম্য-সমাজ অব্যাহত ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া আসিতেছে, ভারতের ইতিহাস তাহার বিষয়ে আজও মৌন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সেই বিরাট সাম্রাজ্য-শাসন-যন্ত্রের মধ্যেও আমাদের সেই গ্রাম্য-সমাজ তাহার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয় নাই। গ্রাম্য সমাজ, কৃষি, শিল্প ও সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের আইন-কানুন নিজেরাই তৈয়ারী করিত। তাহা ছাড়া শ্রেণী, পূগ, সমূহ প্রভৃতির স্বাধীনতাও অটুট ছিল। শুক্রনীতি ও যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে অথবা নারদের সূত্রে আমরা গ্রাম্য-শাসনের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাই। চোল মহারাজ যখন উড়িষ্যা ও পেগু জয় করিয়াছিলেন, যখন তাঁহার জাহাজ লঙ্কা, আন্দামান, নিকোবার পর্য্যন্ত গৌরবে যাতায়াত করিত, তখনও তিনি তাঞ্জোর, মাদুরার গ্রাম্য-শাসন বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডারে, এমন কি রাজকোষের অর্থও গচ্ছিত রাখিতেন।

আকবর বাদশাহের খাজনা-সংস্কার গ্রামমণ্ডলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল, পেশোয়াগণের শাসন-প্রণালী দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। যেখানে যে কারণে এই স্বাধীন

গ্রাম্য সমাজের কর্ম্মকুশলতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, মোগল জায়গীরদার, শিখ করদার, মারহাট্টা নায়েক, ইংরেজের জমীদার যেখানে সৈন্য সাহায্য অথবা খাজনা আদায়ের অছিলায় মাথা তুলিয়া প্রতাপশালী হইয়াছে, সেইখানেই গ্রাম্য সমাজ উদ্যমহীন, কলহপ্রিয় ও সংস্কারাবদ্ধ।

নূতন সংস্কার

কিন্তু এই বিরাট দেশে আজও বহু স্থানে আমাদের স্বদেশী পল্লী-সমাজ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতেছে, সাধারণ ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছে, গ্রাম্য রাস্তা, নদী খালের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, নানা বিচিত্র উপায়ে কর স্থাপন করিয়া যাত্রা, কথকতা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতেছে। সেই গ্রাম্য-সমাজ যেখানে অস্ফুট, তাহাকে সেখানে প্রকাশ করিতে হইবে, যেখানে নিস্পন্দ সেখানে তাহাকে সদা জাগরূক করিতে হইবে, যেখানে সে আজও কর্ম্মঠ সেখানে তাহাকে পঞ্চগ্রাম, দশগ্রাম, শত গ্রামের সমবায়ে এক বিরাট আকার দিতে হইবে। তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া যে কোন শাসনযন্ত্র আমরা সৃষ্টি করি না কেন, তাহার অচিরে শোষণ-যন্ত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। তাহাকে আশ্রয় করিয়া, সমবায়ের দ্বারা তাহাকে বিরাট বিস্তীর্ণ করিয়া গড়িতে পারিলে, আমরা যে শুধু পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রের কুফল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব তাহা নয়, আমাদের অতীত ক্রমবিকাশের ধারা

রক্ষা করিয়া সত্য সত্যই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সহিত জনসমাজের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ পুনরানয়ন করিব। তথাকথিত শাসন-সংস্কার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সহিত দেশের সামাজিক ইতিহাসলব্ধ প্রথা-পদ্ধতির বিরোধ সৃষ্টি করিয়া একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনের কৃত্রিমতা ঘোষণা করিতেছে অপর দিকে জনসমাজকে আরও অজ্ঞ ও উদাসীন করিয়া রাখিতেছে।

স্বাধীন ও স্বাবলম্বনশীল পল্লী-সমাজই আমাদের সেই আসল স্বাভাবিক যুগপরম্পরা-অর্জ্জিত স্বরাজ। এই স্বরাজ নিস্তেজ থাকিলে আমাদের সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা ম্রিয়মাণ। এই স্বরাজের সহিত পাশ্চাত্যের আমদানী, উপর হইতে স্থাপিত প্রজাতন্ত্রের একটা সমন্বয় না হইলে সে প্রজাতন্ত্র ক্রমাগত বিরোধের পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া শেষে ধ্বংসমূলক সমীকরণবাদে পর্য্যবসিত হইবে। সে স্বরাজকে পুনরায় ফিরিয়া না পাইলে আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ভাবুকতা ব্যর্থতার অতলে ডুবিয়া যাইবে।

তাই সুখের বিষয় যে, এই নবজাগ্রত ভাবুকতা তাহার সমস্ত অসঙ্গতি ও সরল ঔদাসীন্য সত্ত্বেও গ্রামপ্রত্যাবর্ত্তনকে জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের আধুনিক প্রজাতন্ত্র নিতান্ত কলহপ্রিয়, কারণ তাহার সহিত দেশের নাড়ীর সংযোগ, বিরাট জনসমাজের প্রভূত কল্যাণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, কৃষক প্রজাতন্ত্রের অভ্যুত্থানই কেবল সম্ভব, যদি দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও ভাবুকতা কৃষক ও তাহার কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শিল্প-জীবনে নূতন আদর্শ

একদিকে যেমন স্বাধীন পল্লীসমাজকে নূতন প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অপর দিকে পল্লীগ্রামের বৈষয়িক জীবনে আত্মনির্ভর কৃষি ও শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ এবং পঞ্চায়েতের দ্বারা গ্রামবাসীর সমগ্র কল্যাণকল্পে তাহাদের নিয়োগ,—বৈষয়িক জীবনের বিস্তারের জন্য পরিচালিত করিতে হইবে।

একদিকে যেমন দলবিভাগ-নীতিসম্বলিত পার্লামেণ্ট-শাসনের ভিতর দিয়া না গিয়া কৃষক-সমাজ গ্রাম্যসমিতিসমুদয়ের সমবায়ের দ্বারা এক কর্ম্মঠ ও প্রত্যক্ষ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে, অপর দিকে পাশ্চাত্য ইয়োরোপের সেই উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) শিল্পের উপর ধনীর একাধিপত্য ও অসংখ্য শ্রমজীবীর নির্য্যাতনের ধারা অতিক্রম করিয়াও আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিযোগিতার উপযোগী এক নূতন ধরণের শিল্প ও ব্যবসায়-প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারি।

বাস্তবিক এই উপায় অবলম্বন করিয়াই আমরা আধুনিক সভ্যতার প্রতিযোগিতা ও নিষ্পেষণ হইতে আমাদিগকে মুক্ত রাখিতে পারিব। দুঃখের বিষয় এই যে, যে সমাজ-গঠনরীতি, রাষ্ট্রের দলাদলির চীৎকার এবং ব্যবসায়জীবনে ধনী অথবা শ্রম-জীবীর অবাধ আধিপত্যের উৎসাহ দিয়া আসিতেছে, সেই পুরাতন আদর্শ যাহা আজ পাশ্চাত্য ও পশ্চিম ইয়োরোপ ত্যাগ করিতেছে, তাহাই চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে এখনও সমাদৃত।

কল-কারখানা

Capitalism অথবা ধন ও কলের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব না আনিলে যে এ দেশে শিল্প ও ব্যবসায়ের বিস্তার অসম্ভব তাহা আমি মনে করি না। আমাদের দেশে যেখানেই বড় বড় কারখানা পাশ্চাত্য শিল্প-প্রণালীর অনুকরণে জাগিয়া উঠিয়াছে সেইখানেই দেখি একটা ভয়ানক বিরোধ; ঘন অন্ধকারময় ক্ষুদ্র ও পঙ্কিল বস্তির অভ্যন্তরে শ্রমজীবিগণ যেমন তাহাদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র হারাইতেছে, তেমনি কারখানার অভ্যন্তরেও ঘূর্ণায়মান, রক্তচক্ষু ও রক্তদন্ত কলের কবলে তাহারা তাহাদের হাড়মাস সঁপিয়া দিয়াছে।

এটা ঠিক, যেখানে আমাদের মজুর মাতাল হয়, স্বাস্থ্য হারায়, যেখানে কুলি-রমণীগণ তাহাদের সতীত্ব বিসর্জ্জন করে, বালকগণ জীবনের প্রারম্ভ হইতেই নির্জ্জিত ও কলুষিত হয়, আমরা সেখানে বর্ত্তমান শিল্প-শরীরের কি কি রোগ ও বীজাণু তাহা অনুধাবন করিতে শিক্ষা করিব। অপর দিকে সমগ্র দেশের আদর্শ ও ইতিহাসের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমান কালে জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠান ও তাহাদের অভাব অভিযোগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নূতন গঠনপ্রণালী অনুসন্ধানের সুযোগ করিয়া লইব।

সমূহতন্ত্র

ভারতবর্ষের জনসমাজে সমূহের প্রতিপত্তি এত বেশী যে, কোথাও ধনী যে আপনার সুবিধামত শ্রমজীবিগণকে ব্যবহার ও নিষ্পেষণ করিতে পারে, তাহার উপায় আমাদের পল্লী-সমাজের রীতিতে নাই। বহুকাল হইতে গ্রামবাসিগণের সাধারণ কল্যাণ-কল্পে পরস্পর সহযোগে নানা অনুষ্ঠান বিকাশ লাভ করিয়াছে, যাহাদিগকে অনুসরণ করিলেই আমরা পাশ্চাত্য সমাজের সেই বিষময় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইব এবং বিস্তার ও সমবায়ের দ্বারা একটা বৃহত্তর জীবন গড়িয়া তুলিব।

শিল্পজীবনে ধনী, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর প্রতিযোগিতার দ্বারা নহে, পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারা, কাহারও অত্যধিক প্রভাবের দ্বারা নহে, প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধের দ্বারা, কোন বিশেষ শ্রেণীর উপর সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনের গুরু-ভার ন্যস্ত করিয়া নহে, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর পরস্পরের সদ্ভাবের ও সমবায়ে প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের কল্যাণ বিধানের দ্বারা যে শিল্পপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে তাহার নাম দিয়াছি সমূহতন্ত্র (Communalism)। ইহাই আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের অভিলব্ধ ফল। ইহাকে আশ্রয় না করিয়া ভবিষ্যৎ গড়িতে গেলে ধনীর ও নির্ধনের শক্তি ও সুযোগের বৈষম্য ও তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ধ্বংসমূলক

সমীকরণ, Socialism, Bolshevism হইতে আমরা রক্ষা পাইব না।

আমি এই সমূহতন্ত্রের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর হইতে আলোচনা করিতেছি। আমার আলোচনা ও লেখার উত্তরে অনেক দেশী ও বিদেশী সমালোচক এই প্রণালীকে দেশের ভবিষ্যৎ শিল্প-বিস্তারের সহজ ও জাতীয় উপায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। পল্লী-সংস্কার ও গ্রাম্য সভ্যতার পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে ইহার যতটুকু প্রযোজ্য কেবল তাহাই এই ক্ষেত্রে আমি নির্দ্দেশ করিতেছি।

ধর্ম্মগোলা

ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে এখনও ধর্ম্মগোলার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। অনেক মন্দিরে গ্রামের শস্য সংগৃহীত থাকে। তাঞ্জোর জেলায় এইরূপ মন্দিরে সঞ্চিত শস্য হইতে দুর্ভিক্ষের সময় ধান দাদন অথবা বিতরণ করা হয়। কুর্গের মন্দির হইতে চাষের জন্য বীজ ধান ও বলদও দেওয়া হয়। এই ধর্ম্মগোলাকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে যৌথঋণদানসমিতি গঠন করিতে হইবে।

আধুনিক সমবায় সমিতির দোষ হইতেছে এই যে, তাহারা কেবলমাত্র টাকার লেন-দেন করে। খাদ্য শস্যাদির লেন-দেন, দেবি, বারি, ও শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অল্প টাকায় যৌথঋণদানসমিতির কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। জমী-

দারেরাও ইহাতে লাভবান হইতে পারে। তাহাদের জমীর ও আয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া গ্রাম্যভাণ্ডার হইতে তাহাদিগকে অল্প সুদে ঋণ দেওয়া যাইতে পারে। জমী বন্ধক রাখিয়া এইরূপ লেন-দেন প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া, জাপানে বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে।

পল্লীভাণ্ডার

গ্রামে গ্রামে পল্লীভাণ্ডার স্থাপন করিয়া সমগ্র গ্রাম্যসমাজের অভাব পূর্ব্ব হইতে নিরূপণ করিয়া কাপড়, কেরাসিন তৈল, চিনি প্রভৃতি একযোগে শহর হইতে পাইকারী দরে ক্রয় করিতে হইবে মাড়োয়ারি অথবা বেনের অমিত লোভ এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। গ্রামবাসিগণ তাহাদের নিত্য-আবশ্যক দ্রব্যাদি ভাণ্ডার হইতে অল্প মূল্যে পাইবে এবং ভাণ্ডারের লভ্যাংশও বৎসরের পর কিছু পাইবে। যেখানে নগদ বিক্রয়ের বিশেষ অসুবিধা সেখানে ভাণ্ডার কৃষক ও শিল্পীর নিকট হইতে শস্য ও দ্রব্যাদি লইবে। ভাণ্ডার একই সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র হইবে। বিভিন্ন গ্রামের ভাণ্ডারগুলি পরস্পরের সমবায়ে জেলার প্রধান ভাণ্ডারের অন্তর্গত হইবে এবং বিভিন্ন জেলার ভাণ্ডারগুলি কলিকাতার একটা বিরাট ভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। তাহা বিদেশী রপ্তানি ও আমদানির প্রধান কেন্দ্র হইবে। বিভিন্ন গ্রামের ও জেলার ভাণ্ডারগুলির দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া অসংখ্য শিক্ষিত যুবক সমাজ-সেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন অন্নসংস্থানের সুযোগ

পাইবে। এই উপায়েই দেশের ব্যবসায় একেবারেই আত্মনির্ভর হইবে।

গাঁতি

গ্রামে গ্রামে এখনও গাঁতি প্রভৃতিতে একযোগে কৃষিকর্ম্মের সুফলের পরিচয় পাই। সকলে মিলিয়া যাহাতে বীজ হাড়গুড়া খঞ্জে প্রভৃতি সার এবং ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক কল কিনিতে পারে তাহার জন্য কৃষকগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে গঠিত করা প্রয়োজন। আখ মাড়াইবার কল, বীজ রোপন করিবার কল, গভীর চাষ করিবার লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রাদি যাহা একজন কৃষকের পক্ষে ক্রয় করা অসম্ভব তাহা সকলে মিলিয়া ক্রয় করিতে পারিবে।

গৃহ-শিল্প ও ছোট কারখানা

সেইরূপ শিল্পিগণের মধ্যেও যৌথক্রয়সমিতির বিশেষ প্রয়োজন। অল্প সুদে কর্জ্জ পাইলে, সুলভ মূল্যে মাল মশলা সংগ্রহ করিতে পারিলে, সমবেত ভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিলে, হস্তশিল্প যে অনায়াসে বড় কারখানার সহিত প্রতিযোগী হইতে পারে তাহা আধুনিক বেলজিয়ম, জর্ম্মাণী ও জাপান সাক্ষ্য দেয়। যেখানে বাজার সঙ্কীর্ণ ও স্থানীয়, যেখানে হস্তশিল্পের

উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, যেখানে শিল্পী তাহার ক্ষুদ্র কারখানায় তাহার পরিবারবর্গের সাহায্যে স্থলভে দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে পারে।

তাহা ছাড়া অনেকগুলি শিল্পী মিলিয়াও বড় কারখানা ও কুটীর-শিল্পের মাঝামাঝি ছোট কারখানা স্থাপন করিয়া অনায়াসে ব্যবসায় চালাইতে পারে। এইরূপ জাতিগত কারখানা আমাদের দেশে কুটীর-শিল্পের সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া মাথা তুলিয়াছে। কাশীর বয়ন-শিল্প, কৃষ্ণনগরের খেলনা তৈয়ারি, দাঁইহাট ও ঘাটালের পিত্তলের কাজ, ঢাকার শাঁখার কাজ, কটকের সোনারূপার কাজ, সবই ছোট খাট কারখানায় সুসম্পন্ন হয়। সেখানে অনেকগুলি শিল্পী একজন মিস্ত্রীর দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাহারই অধীনে কাজ করে এবং অনেক সময় তাহার নিকট বেতনও পায়। ঠিক এইরূপেই ফ্লানডার্সে লেস তৈয়ারি, জাপানে খেলনা তৈয়ারি, টাস্কানিতে বেতের কাজ, ইতালির সূক্ষ্ম রেশমের কাজ আজও চলিতেছে। কলিকাতার বহুবাজারে চেয়ার টেবিল তৈয়ারি, অথবা ভবানীপুরে সোনারূপা কাজের মত আর একটু বড় করিয়া কারখানা যদি কুটীর-শিল্পকে প্রসারিত করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে হস্তশিল্পের পুনরুদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যুৎ, তৈল কিংবা গ্যাস ইঞ্জিন দ্বারা এইগুলি চালিত হইতে পারে এবং যৌথপ্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারাও ব্যবসায় বিষয়ে বিশেষ সুবিধাও হইবে।

সাধারণ ইলেকৃট্রিক ঘর

গ্রামে গ্রামে আমাদের পুকুর পুষ্করিণী, কূপ ও কৃষি-কার্য্যের জন্য খাল সাধারণের সম্পত্তি। গোচারণ ভূমি অথবা গ্রামের জঙ্গলের মত সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রামের পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত। পঞ্জাবের ও মাদ্রাজের অনেকগুলি গ্রাম একত্র মিলিয়া অনেক সময় কৃষির জন্য বহু মাইল দীর্ঘ খাল খনন ও রক্ষা করে। পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডারের নাম "মালবা"। সেইরূপ দাক্ষিণাত্যের সমুদায়ম সম্পত্তি ও ভাণ্ডার হইতেও গ্রামের সমস্ত সাধারণ কাজের খরচ নির্ব্বাহ হয়। গ্রামের যেমন পাঠশালা, ধর্ম্মশালা, মন্দির, লাঙ্গার, চাবড়ি ও সমূহ-মঠম আছে, এইগুলি যেমন সাধারণ সম্পত্তি, এইগুলির জন্য যেমন জনসমাজ জমি দিয়া রাখিয়াছে অথবা বিচিত্র উপায়ে কর স্থাপন করিয়া তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেছে, সেইরূপ ঐ গুলির পার্শ্বে ইলেকট্রিক্ ঘর, বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্র ও কল-কারখানার স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

ইলেকট্রিক ঘর হইতে বিদ্যুৎশক্তি গ্রামে, যেখানে শিল্পী বিরলে বসিয়া আপনার তাঁত বুনিতেছে, ছুতর যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি চিরিতেছে, কামারশালায় যেখানে মানুষের হাত দীর্ঘ-ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রমে অবশ, সেখানে যাইয়া তাহাদের শ্রমশক্তির লাঘব করিবে, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ

বহুল করিয়া দিবে, দৈনন্দিন অভাব মোচনের উপায় বিধান করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বল ও তাহাদিগের মেয়েদের মনে শান্তি দিবে। এই উপায়ে বালুচর ও কুমিল্লার নষ্টপ্রায় বয়ন শিল্প, খাগড়া-কাঞ্চননগর ও দাঁইহাটের পিত্তল, লৌহ ও কাঁসার বহু শ্রমলব্ধ শিল্প-কলা নূতন জীবন লাভ করিবে, গ্রামের পরিত্যক্ত আম কাঁটাল প্রভৃতিতে বহুকাল খাদ্যোপযোগী করিয়া রক্ষা করা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা বৈজ্ঞানিক ও সুলভ হইবে। যেখানে গ্রামে অন্ততঃ একটা করিয়া ডাইনামো বসান অসম্ভব সেখানে গ্যাস ইঞ্জিন বা অয়েল ইঞ্জিন সরবরাহ করিয়া গ্রামের কারখানার কাজে লাগাইতে হইবে, অথবা ধান, ময়দা, তৈল আক পেষার কারখানা ঐ সকল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত করিতে হইবে।

গ্রাম্য পাটের কল

ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলায় যেখানে পাটের চাষ হয় অথবা মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যেখানে পাট সরবরাহ হয়, সেখানকার গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কারখানা বসাইয়া পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে। যে প্রভূত অর্থ পাটচাষী এবং পাটের দ্রব্যাদির খরিদদারের মধ্যবর্ত্তী দালাল, পাইকার অথবা কারখানার অধিকারীর কবলে থাকিয়া যায় সে অর্থ পাটচাষী নিজেই ভোগ করিতে পারিবে। এইরূপ কার-

খানার স্বত্বাধিকারী সমস্ত গ্রামেই হইবে ; প্রত্যেক শ্রমজীবী এই কারখানার লভ্যাংশ পাইবে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েত মজুরী নিরূপণ, লভ্যাংশ বিতরণ ও শ্রমনিয়োগ সম্বন্ধে যথাযথ রীতি প্রবর্ত্তন করিবে। পরে এই সকল গ্রাম্য কারখানার সমবায়ে পাটজাত দ্রব্যাদির একটা প্রকাণ্ড আড়ত হইবে। সেখানে দেশ বিদেশের পাটের দাম বিচার করিয়া বিশেষজ্ঞগণ যথাসময়ে সুবিধামত বিদেশে পাট রপ্তানি করিবে।

পরস্পরের সমবায়ে গ্রাম্য কারখানা তাহাদের মালমশলা ও যন্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া অধিক সস্তায় সেইগুলি পাইতে পারে, এবং সকলে মিলিয়া আড়ত করিয়া এক যোগে বিক্রয় করিতে পারিলে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম।

গ্রাম্য স্বায়ত্ত কর-স্থাপন

কিন্তু ভারতবর্ষীয় পল্লী-সমাজ চিরকাল বিচিত্র উপায়ে নূতন নূতন অর্থ-সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করিয়াছে। বৃত্তি, মুষ্টিভিক্ষা, মার্চ্চা, স্যালী প্রভৃতির সহিত আমরা বাংলা দেশে বিশেষ পরিচিত। মস্‌জিদ ও আরবী স্কুল রক্ষণের জন্য মুসলমানের কর-স্থাপন বা জাকাথ প্রসিদ্ধ। আমি মাদ্রাজের গ্রামে গ্রামে যাইয়া এরূপ বহু মস্‌জিদ ও আরবী স্কল দেখিয়াছি যাহা লঙ্কা ও সিঙ্গাপুর বণিকের লভ্যাংশ হইতে পরিচালিত। সে সকল স্কুলে পেনাং মালয় ও সিঙ্গাপুর হইতেও অনাথ বালকগণ আসিয়া পাঠাভ্যাস

করে। গ্রামে গ্রামে নিজ নিজ সাধারণ অভাব মোচনের জন্য কর-স্থাপন সমগ্র ভারতবর্ষে বিচিত্রভাবে দেখা যায়। ঐ সকল কর-স্থাপন গবর্ণমেণ্টের খাজনা দেওয়ার অতিরিক্ত। ইহাতে একদিকে যেমন পল্লীবাসীর কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাই অপরদিকে তাহাদের স্বাবলম্বনের প্রতিও ভক্তি হয়। এইগুলিকে নূতন অভাব ও আদর্শের অনুযায়ী করিয়া ফিরিয়া পাইলে আমাদের গ্রাম-সংস্কার বিষয়ে আর টাকার অভাব হয় না। দাক্ষিণাত্য হইতে আমি কয়েকটি মাত্র করস্থাপন নির্দ্দেশ করিতেছি—

(১) প্রত্যেক বহির্মুখী খড়ের গাড়ীর উপর দুই আনা।

(২) প্রত্যেক বিঘা জমিতে পাঁচ সের করিয়া চাউল।

(৩) প্রত্যেক ভিটার জন্য দুই আনা।

(৪) প্রত্যেক শিল্পীর নিকট চারি আনা।

এই উপায়ে গ্রাম্য সভার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়।

গ্রামের খাল, বিল ও পুষ্করিণী খনন বা সেগুলির উন্নতির জন্য গ্রামবাসিগণের জমির হিসাবানুযায়ী কর ধার্য্য করা হয়। গ্রাম-সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের অন্যান্য উপায়ঃ—

(১) গ্রামের নিকটস্থ সাধারণ জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ, পশুচারণ, ঘাস কাটা ইত্যাদির জন্য কর ধার্য্য করা হয়।

(২) সাধারণের পুকুরের হাঁস চারণের জন্য কর।

(৩) বাজার-কর (বা তোলা) যথা প্রতি গরুর গাড়ীর পিছু এক আনা, প্রতি ঝাঁকা বা বোঝা এক পয়সা, প্রতি ছাগল এক পয়সা, ইত্যাদি।

(৪) জলাভূমির ঘাসের জন্য কর-স্থাপন।

(৫) সাধারণের জমিতে গাছ রোপণ ও সাধারণের ফলন্ত গাছ জমা দেওয়া ইত্যাদি।

(৬) যে সকল গ্রামে তাঁতি আছে সেখানে প্রত্যেক তাঁত প্রতি কর।

(৭) কসাই-এর নিকট হইতে প্রত্যেক ছাগল প্রতি দুই আনা।

(৮) পান, মাছ, ভেড়া ও ছাগলের মাংস বিক্রয় যে জমা লয় তাহার নিকট হইতে কর আদায়।

(৯) গ্রামের খামারের কাছে শস্য মাড়াই-এর সময় পান স্থপারী, আক কিংবা গুড়ের দোকান যে করে তাহাদের নিকট কর আদায়।

(১০) গৃহস্থের বাড়ী ধানের তোলা তুলিয়া সেই টাকা দ্বারা গ্রাম্য কোন উৎসব, গ্রাম্য ধর্ম্ম-মন্দির বা গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা। এইরূপে গ্রামের আয় অনেক সময় ২০০৲ টাকা হইতে ৫০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। গ্রামের টাকার অভাব নাই। তাহা নিয়োগ করিবার লোক ও পন্থার অভাব।

টাকা জমাইবার টিকিট

এই সকল অনুষ্ঠানের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যাইতেছে। দুই আনা করিয়া সেভিংস্ টিকিট সৃষ্টি

করিয়া তাহা হাটে, মেলায়, শ্রাদ্ধাদির সময় বিক্রয় করিয়া দরিদ্র কৃষককে সাধারণ ভাণ্ডারে অর্থ গচ্ছিত রাখিতে ও মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই টিকিটগুলি দুর্দ্দিনে ফিরাইয়া দিয়া তাহারা অর্থ লইতে পারে। অথবা এই টিকিট বিক্রয়ের সঞ্চিত অর্থ জীবনবীমা অথবা গো-মহিষাদির বীমার সূচনা করা যাইতে পারে। গো-জাতির যেরূপ অবনতি হইতেছে তাহাতে এই বিষয়ে কিছু করা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিক আবশ্যক মানুষের ম্যালেরিয়া বা বার্দ্ধক্যজনিত অবসাদ ও অসহায়তার সময় তাহাকে বীমার টাকা হইতে সাহায্য করা। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার জীবনবীমার অথবা লাঙ্গলের গরুর বীমার জন্য কত দিবে তাহার বিচার বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। শস্য-বীমার ও প্রচলন এই উপায়ে সম্ভব। শুধু আর্থিক ও বৈষয়িক দিক দিয়া নহে, আমাদের পল্লীগ্রাম আনন্দের লীলাক্ষেত্র হইবে ; গ্রাম্যভাণ্ডার হইতেই পূর্ব্বেকার মত এই সকল সাধারণ আনন্দ কৌতুক ক্রীড়া উৎসবের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে।

পঞ্চায়েতের আশা

পঞ্চায়েৎ মামলা বিবাদ নিষ্পত্তি করিবে। আজও আমাদের দেশে অনেক স্থানে বিশ পঞ্চাশ-শতগ্রামের পঞ্চায়েতের অধি-বেশন হয়। পূর্ব্বে গ্রাম্য সভার হাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার শেষ নিষ্পত্তির ভার অর্পিত ছিল। পঞ্জাবে উত্তরাধিকার

ও গ্রাম্য ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গ্রাম্য সভার সম্পূর্ণ অধিকার হাইকোর্ট বিশেষভাবে রক্ষা করিতেছেন। বিভিন্ন গ্রামের পঞ্চায়েতগুলির সন্নিবেশে পরগণা, থোক, পট্টি, নাড়ু প্রভৃতির প্রাদেশিক আদালত গঠন করিয়া পল্লী-স্বরাজ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নূতন সমাজ-শাসনের ইহাই বর্ত্তমান কালের উপযোগী প্রকৃষ্ট উপায়। সব দিকে সমবায়ই প্রাচ্য সমাজের ক্রমোন্নতির ধারা, আর এই ধারা রক্ষা করিতে পারিলেই শুধু যে আমাদের ইতিহাসলব্ধ অনুষ্ঠানগুলি রক্ষিত হইবে তাহা নহে, সাম্রাজ্য ও শিল্পের মাধ্যাকর্ষক শক্তি হইতে আমরা আমাদের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব। পল্লীভাণ্ডার গ্রাম-উৎপন্ন শস্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে, বিদেশ হইতে পাইকারী দরে নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সুলভে গ্রামবাসীর নিকট বিক্রয় করিবে এবং তাহাদিগকে লভ্যাংশেরও কিছু দিবে। কৃষিকার্য্যের জন্য বলদ, বীজ, সারাদি সমবেতভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডার নানাবিধ গ্রাম্য কর উদ্ভাবনে সদা পূর্ণ থাকিবে। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, গোচারণভূমির পার্শ্বে বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিপরিচালনের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখাইবে। টোলের পার্শ্বে শিল্পবিদ্যালয় জাগিয়া উঠিবে; শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে করিতেই বালকগণ কিছু কিছু অর্জ্জন করিতে থাকিবে। কার্পাস গাছ গৃহস্থের বাগানে আবার রোপিত হইবে। নূতন ধরণের চরকা ও টাকু প্রচলিত হইবে। আবার গৃহিণীরা সূতা কাটিবেন এবং অবসর

মত তাঁতে কাপড়ও বুনিবেন। মন্দিরের পার্শ্বে আমরা দেখিব সাধারণ বিদ্যুতাগার যেখান হইতে গ্রামের তাঁত ও কামার-শালার যন্ত্রাদি পরিচালিত হইবে। কর্ম্মশালার পার্শ্বে আমরা দেখিব হাসপাতাল, যেখানে মহামারীর সময় রোগীর পৃথক-করণ ও সেবার ব্যবস্থা হইবে। চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বে আমরা দেখিব নূতন লাইব্রেরী। সেখানে রামায়ণ হইতে মহাভারত, ভাগবত, কৃষি, শিল্প, ধন-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সুলভ সংস্করণগুলি পাঠ করিয়া গ্রামবাসিরা আবার তাহা পুস্তকাগারে ফিরাইয়া দিতে পারিবে। হাটের পার্শ্বে আমরা দেখিব আবার অভিনব সমবায় ভাণ্ডার, যেখানে অতি অল্প মূল্যে গ্রামের লোক নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি যখন ইচ্ছা পাইতে পারিবে। গ্রামের পাঠশালায় ম্যাজিক লণ্ঠন ও বায়স্কোপের সাহায্যে কৃষি, শিল্প, ভূগোল, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

কথকতা।

গ্রামে গ্রামে হরিসভা প্রভৃতিতে আজও যাত্রা, কথকতা হয়। সমবেত ভাবে যাহা কিছু শিক্ষা ও আনন্দদায়ক তাহার উপায় উদ্ভাবন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক দিকেই বিচিত্রভাবে দেখা যায়। কোথাও কথক, কোথাও পৌরাণিক, কোথাও হরিবাসর, কোথাও ভজনওয়ালা নিয়মিতভাবে লোকের শিক্ষা ও আনন্দ-বিধান

করিয়া আসিতেছে। সব ক্ষেত্রেই সাধারণ পাঠশালা, মন্দির, উত্তপুব সমূহমঠম প্রভৃতির ব্যয়ভার পল্লী-সমাজ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। শিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে নূতনভাবে ফিরিয়া আনিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের আদর্শের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষিপ্রধান দেশে শিক্ষা বিস্তারের ইহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও উৎকৃষ্ট উপায়। এই কথকতার দ্বারাই আজ পর্য্যন্ত চীন ও জাপান তাহাদের সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ডেনমার্ক ও বেলজিয়মে এই কথকতার প্রণালী কৃষি ও গ্রাম্য-জীবনের উন্নতির প্রধান আশ্রয়। পাঠশালা মন্দির সবই রহিল, শুধু তাহাদের নূতন পুরোহিত চাই, তাহাদের নূতন শিক্ষা ও দীক্ষার মন্ত্র চাই। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি পূর্ব্বের মত ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে তাহাদের আহার্য্য বিধান হইত। গ্রামের কথক রামসীতা, অর্জ্জুন, ভীষ্মের পার্শ্বে ইতিহাস-বিশ্রুত জাতীয় মহাপুরুষগণকে সসম্মানে বসাইবে। রামলীলা, সীতাহরণ, নন্দোৎসব, রাসযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের ইতিহাসের মহিমাময় ঘটনাগুলির অভিনয় বৎসর বৎসর দেখিব। বার মাসের তের পার্ব্বণের সহিত আরও কত আনন্দ উৎসব দেখা দিবে। যে স্কুলশিক্ষা গ্রামবাসিগণকে এক্ষণে সৌখীন ও অকেজো করিয়া তুলিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে গ্রামের আদর্শক্ষেত্রে ও শিল্পবিদ্যালয়ে স্বাধীন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা দেখিব। যে ধর্ম্ম এখন শুধু আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ তাহা সহজ ও স্বাধীন হইয়া সমাজের অসদ্ভাবের পরিবর্ত্তে মৈত্রী, হিংসার পরিবর্ত্তে

শ্রদ্ধা, ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগকে আনিয়া দিবে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গ্রাম্য-জীবনের সমবায়ে এমন একটা পল্লী সভ্যতা জাগিয়া উঠিবে, যাহা আধুনিক নাগরিক সভ্যতার শোষণের পরিবর্ত্তে সহযোগ, অনটনের পরিবর্ত্তে সমৃদ্ধি আনিবে। সামাজিক ও বৈষয়িক বৈষম্য, যাহা বর্ত্তমান সভ্যতার প্রাণ, তাহার পরিবর্ত্তে আসিবে এক নূতন সাম্য যাহা আমাদের সেই ইতিহাসলব্ধ গোষ্ঠী ও সমূহজীবনকে সঙ্কীর্ণতা হইতে বিস্তারের পথে লইয়া যাইবে। ঘরে, বাহিরে, হাটে, কারখানায়, নগরের সভায়, পঞ্চায়েতের বৈঠকে সব খানেই যে ভয়ঙ্কর বিরোধ আজ মানুষের অন্তর্জীবন ও মানুষের বাহিরের সমাজ-যন্ত্রের সহিত অহরহ জাগিতেছে তাহার সমাধান হইবে এইরূপে,—মানুষ যাহা সৃষ্টি করিবে তাহাই প্রদান করিবে। স্বত্ব ভোগ নয়, লব্ধের বিতরণই লক্ষ্য। ইহা একদিকে যেমন অসংখ্য স্বাধীন কেন্দ্র, স্বাধীন পল্লী-সমাজ, স্বাধীন কুটীর-শিল্প ও কারখানা, স্বাধীন ধর্ম্ম ও আনন্দ-উৎসব সৃষ্টি করিতে থাকিবে অপর দিকে গোষ্ঠী-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া একটানা রাষ্ট্র ও শিল্পের শোষণ-যন্ত্র হইতে মানুষকে রক্ষা করিবে। এই উপায়ে আধুনিক সভ্যতা বিবিধ প্রণালীতে যে ব্যক্তির সৃজন-শক্তিকে বিনাশ করিতেছে তাহার প্রতিবিধান হইবে। প্রাচ্য-সমূহতন্ত্রের ইহাই ভবিষ্যদ্বাণী। আর এই সমূহতন্ত্রের কেন্দ্র হইতেছে আমাদের নিদ্রিত পল্লীসমাজ, যেখানে নারায়ণ মন্দিরে মন্দিরে গভীর মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন। সেইখানে তাঁহাকে জাগাইবার জন্য আজ বর্ত্তমান সভ্যতার পরিশ্রান্ত রক্তাভ

সন্ধ্যায় তরুণ বাঙ্গালী অমল-ধবল শান্তি-শঙ্খ হস্তে পল্লী-দ্বারে দণ্ডায়মান।

গ্রামে স্বাধীন অন্নসংস্থানের আয়োজন

নগরের চিন্তা ও কর্ম্মকে এখন গ্রাম্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে দেওয়া হইবে না। গ্রাম্য সাহিত্য, গ্রাম্য আচার-ব্যবহার, গ্রাম্য শিল্প-বাণিজ্যের এখন উন্নতি সাধনের চেষ্টা দেখিতে হইবে। নাগরিক ব্যক্তিত্বের হীন আদর্শকে এক্ষণে খর্ব্ব করিতে হইবে। প্রধানতঃ গ্রামে অন্নসংস্থানের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সমগ্র সমাজ নাগরিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আর লালায়িত হইবে না—মধ্যবিত্ত সমাজ এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে, পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সে স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় হারাইয়াছে। নগরে চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া তাহার অর্থ গিয়াছে, বল গিয়াছে, সাহস গিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা গিয়াছে। শুধু কৃষক মজুর নহে মধ্যবিত্ত সমাজও দারিদ্র্যের কঠোরতা কিরূপ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। এক্ষণে পল্লীগ্রামে স্বাধীন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিলে মধ্যবিত্ত সমাজ একটা নিকৃষ্ট নাগরিক ব্যক্তিত্বের আদর্শের দ্বারা আর পরিচালিত হইবে না। নিজবাসভূমি ত্যাগ করিয়া প্রবাসী হইবে না।

যে বিজ্ঞানের দ্বারা পল্লীবাসিগণ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া আপনাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা ও তাহার পুষ্টিবিধান করিতে

পারে তাহার নাম সমবায়। পল্লীবাসিগণ সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, এবং মধ্যবিত্ত সমাজ পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তাহাদিগকে এ বিষয়ে পরিচালিত করিলে—শুধু জল-প্রবাহ বায়ুপ্রবাহ পরিষ্কার, পুষ্করিণী খনন, বনজঙ্গল পরিষ্কার কেন উপযোগী শিক্ষা ও স্বাধীন অন্নসংস্থানেরও ব্যবস্থা হইবে। কি উপায়ে সমবায়-পদ্ধতি আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাধীন অন্নসংস্থান ও কৃষি গৃহশিল্পের উন্নতিবিধান করিতে পারে, তাহা আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পল্লীগ্রামেই দেশের ভদ্রসন্তানগণের জন্য স্বাধীন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে পল্লীরক্ষা অসম্ভব। বাটীতে নিজে না থাকিলে বাটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অসম্ভব। কয়েকজন দেশহিতৈষীর উপর বনজঙ্গল পরিষ্কার ও গৃহভার দিয়া রাখিলে গৃহ রক্ষিত হইবে না। ভারতবাসীর গৃহ ত পল্লীগ্রাম। ভারতবাসী যাহাতে রোগ দুঃখে গৃহত্যাগী না হয়, তাহার জন্য সমবায়-বিজ্ঞান প্রচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শুধু পরহিতৈষণার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, নিজ বাসভূমে যাহাতে অন্নসংস্থানের সুবিধা হয় তাহা করিতে হইবে। সমাজ অনশনে থাকিয়া কখনও শুধু পরহিতৈষণা হইতে প্রাণ পাইতে পারে না।

পল্লীজীবনের মূলভিত্তি

অনেকে বলিতেছেন, সভ্যতার ইতিহাসে নগর গ্রাম অপেক্ষা অধিক ক্রমোন্নতি লাভ করিবেই, গ্রাম ক্রমশঃ সমাজ-গঠনে

অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব বিস্তার করিবে; এ ক্ষেত্রে নগরের উন্নতির প্রতিরোধ হইলে সভ্যতার হানি হইবে। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, নগরের উন্নতি যখন অবশ্যম্ভাবী ও অত্যাবশ্যক তখন পল্লীগ্রামগুলিকে নগরের মতন গড়িয়া তুলা হউক। তাহা হইলেই সমগ্র সমাজ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

এই সকল বিষয়ের সম্যক আলোচনা আমাদের দেশের শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় কেন সকলের পক্ষেই এক্ষণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। পল্লীগ্রাম দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—একটা প্রাকৃতিক ভিত্তি,—জমি আর একটা সামাজিক ভিত্তি—ভূমির উপভোগকারী ভূমিতে আবদ্ধ একান্নবর্ত্তী পরিবার। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত একান্নবর্ত্তী পরিবার রক্ষা করা কঠিন হয়, ভূমি ছাড়িয়া লোকের অর্থের উপর অধিক ঝোঁক হয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নগরের আবির্ভাব। নগরে যৌথপরিবারের মর্য্যাদা লোপ পায়, ভূমিস্বত্বের গৌরবহানি ও অর্থস্বত্বের গৌরব বৃদ্ধি দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজ-বন্ধন এক্ষণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে,—ইউরোপে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই বলিলেও চলে, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধও খুব শিথিল হইতেছে। জর্ম্মাণীতে স্ত্রীবর্জ্জন এত বেশী হইয়া পড়িতেছে যে, একজন গণনা করিয়াছেন যে ৩৫ বৎসর পর জর্ম্মাণীতে এমন কোন বিবাহিত পুরুষ থাকিবে না যে একবার একজন স্ত্রীকে না ত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপের সব দেশে যৌনসম্বন্ধ খুব সহজচ্ছেদ্য হইয়া পড়িয়াছে,

স্ত্রী সংখ্যার আধিক্য, পুরুষের পাশবিক ভাব, পরিবার বন্ধন খুব শিথিল করিয়াছে। এই ত গেল পরিবারের কথা। ভূমিস্বত্বের দিকে চাহিলেও আমরা দেখি,—ইংলণ্ডে প্রজাদিগের ছোট ছোট জমি নাই বলিলেও চলে—ডিউক মারকুয়িস শিকারের জন্য জমি রাখিয়াছেন, বড়লোক জমিদার হইবার জন্য জমি রাখিয়াছেন, ব্যবসায়ী অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কে অর্থ জমা দিয়া নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবার জন্য জমি রাখিয়াছেন—শুধু কৃষকের ভূমিস্বত্ব সমাজ সম্মান করে না—তাই গভর্ণমেণ্ট Small Holdings Act করিয়া কৃষককে ক্ষুদ্রাকার ভূমিতে স্বত্ব দিয়াছে —ইংলণ্ডে প্রত্যেকের তিন একর জমি ও একটি মাত্র গরুর (three acres and a cow) অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে—কৃষকগণ যাহাতে ক্যানাডা, নিউজীলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া না যাইয়া ইংলণ্ডের ভূমিকর্ষণ করে তাহার জন্য Colonisation of England আন্দোলন চলিয়াছে। Bannerman, Lloyd George, Masterman-এর আশা কবে পূরণ হইবে কে বলিবে পারে! কৃষকের মজুরী বাঁধিয়া দিয়া গৃহ-নির্ম্মাণের সুবিধা বিধান করিয়া, সমবায়-প্রণালী ও কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধের পর গভর্ণমেণ্ট নানা উপায়ে কৃষির পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছে।

আবার যে ইংলণ্ডে পল্লীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে সেই ইংলণ্ডেই নগরের অত্যধিক উন্নতি।

প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক কারণে ইংলণ্ড ইউরোপের মধ্যে

শিল্পব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, কিন্তু শুধু শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির জন্য পল্লীগ্রামের অবনতি হয় নাই—ইংলণ্ডে উত্তরাধিকার ও enclosure বিষয়ক আইন, অবাধ বাণিজ্যনীতি, অক্ষম গরীবদিগের জন্য পুরাতন আইন, শিকার বিষয়ক আইন প্রভৃতি ধীরে ধীরে জমিস্বত্বহীন শ্রমজীবিদিগের সৃষ্টি করিতেছে—তিন একর জমি ও একটা গরুর অধিকার হইতে কৃষককে বঞ্চিত করিয়াছে।

ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের দুই ভিত্তির উপরই কুঠারাঘাত পড়িয়া ছিল। তাই সেখানে পল্লীগ্রামের এত অবনতি। পক্ষান্তরে শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি হেতু নগরের উন্নতি।

কৃষকের ভূমিস্বত্ব হানি

আমাদের দেশের প্রজারা এখনও তাহাদের ক্ষুদ্র জমি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, দেশের প্রজাদিগের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যে ভূমিস্বত্ব ছিল তাহা হইতে তাহারা যে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ কিন্তু তবুও তাহারা ভূমিস্বত্বের ছায়াটুকু লাভ করিয়া সন্তুষ্ট আছে, জমি চাষ করিয়া কিছু ফসল তুলিয়া লাভ করিতে পারে, ইংলণ্ডের কৃষকের মত তাহাদের অবস্থা এখনও হীন হয় নাই। পল্লীজীবনের যাহাকে আমি প্রাকৃতিক ভিত্তি বলিয়াছি তাহার মূলোচ্ছেদ হয় নাই।

আমাদের কৃষকের ভূমিস্বত্বের এই ছায়াটুকু যদি লোপ পায় তাহা হইলে আমাদের পল্লীর অবনতি অনিবার্য্য। জমিদার যদি জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারে—তাহা হইলে কৃষক দিনমজুরে পরিণত হইবে—হয় কৃষির অবনতি হইবে—না হয় হাজার দুই হাজার বিঘা জমি এক সঙ্গে কর্ষিত হইবে, এক বিঘা দুই বিঘা জমি চাষ উঠিয়া যাইবে, ধনীর খুব ধনবৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইবে—সমাজের একদিকে ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা আর একদিকে দারিদ্র্যের নীরব বেদনা আমরা তখন চক্ষের সম্মুখে দেখিব।

যৌথপরিবারের অমর্য্যাদা

পল্লীজীবনের সামাজিক অথবা মানসিক ভিত্তি একান্নবর্ত্তী পরিবার। ইংলণ্ডে primo-geniture আইন অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী—অন্য পুত্রের পিতার সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব নাই। ইংলণ্ডে আইনই একান্নবর্ত্তী পরিবার-বিরোধী, ইহাতে একদিকে যেরূপ পরিবারের মধ্যে কেবল একটি মাত্র নির্ব্বোধ পুত্রের সৃষ্টি হইতে পারে, বাকী পুত্রের সম্পত্তির কোন অংশ না পাইয়া স্বকীয় বুদ্ধি ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া সমাজের ধন বৃদ্ধির সহায় হয়; অপর দিকে সেইরূপ সমাজে দ্বন্দ্বেরও সূত্রপাত হয়—যাহারা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় তাহারা মনে করে, সমাজ তাহাদিগের দাবী অগ্রাহ্য

করিয়া অন্যায় বিচার করিয়াছে,—ইহা সমাজের পক্ষে ঘোর অকল্যাণপ্রদ।

আমাদের দেশের আইনকানুন একান্নবর্ত্তীপরিবার-রক্ষারই পক্ষপাতী। বরং হিন্দু আইন অনুসারে জমি অনেক সময়ে অনেক সন্তানসন্ততির ভাগে ফসল উৎপাদনের অসুবিধা ঘটে। বিশেষতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে উত্তরাধিকার-বিধি অনেক সময়েই ধনসম্পত্তি বিভাগের অত্যধিক প্রশ্রয় দিয়া বৈষয়িক উন্নতির অন্তরায় হয়।

নানা কারণে আমাদের যৌথ-পরিবারের মর্য্যাদার ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। হাইকোর্টের আইনকানুনও একান্নবর্ত্তীপরিবারের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি যেরূপ একান্নবর্ত্তীপরিবার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রধান কারণ, আমাদের সমাজে সেরূপ চাকুরী যৌথপরিবারের বন্ধন মোচনের প্রধান কারণ হইয়াছে। ইউরোপে নগর যেরূপ শিল্প-ব্যবসায়ের কেন্দ্র; আমাদের সমাজে সেরূপ ইহা চাকুরীর স্থান। ইউরোপে নগর স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের আবাসভূমি; আমাদের সমাজে নগর মুখ্যভাবে স্বাধীনচিন্তা ও কর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক নহে। কিন্তু নানা মতাবলম্বী বিভিন্ন লোকে একত্রে অবস্থান করে বলিয়া নগরই স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের উৎসাহ প্রদান করিতেছে। কিন্তু তাহা করিতেছে গৌণভাবে। নগর যে ব্যক্তিত্ব গঠন করিতেছে তাহা যে দানহীন পরমুখাপেক্ষী, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গ্রাম ও সমাজজীবন

অনুকরণের মোহ

আমরা সব দিকেই বিপরীত পথে চলিয়াছি। আমাদের কৃষকের যে পূর্ব্বে ভূমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাহা আমরা এখন স্বপ্নাতীত মনে করিতেছি,—কৃষক যে ধীরে ধীরে আপনার ভূমিস্বত্ব হারাইয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়াছি। যে স্বত্ব তাহার এখনও আছে আমরা ভাবিতেছি উহা জমিদারের অযাচিত দান। ভূমির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী, ভূমিতে আবদ্ধ কৃষক-পরিবার যে সমাজের সর্ব্বপ্রধান বল ইহা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, আধুনিক জর্ম্মাণজাতি তাহা চক্ষের সম্মুখে দেখাইতেছে। আমরা সে সত্য মানিতেছি না। সমাজের স্থিতি উন্নতির প্রধান সম্বল কৃষকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আমরা দৃকপাত করিতেছি না, সে তাহার ভূমিস্বত্ব হারাইতেছে নীরবে নির্ব্বিবাদে,—কেহই তাহার জন্য কোন কথা বলিবে না, কোন উদ্বেগ প্রকাশ করিবে না।

আমরা নগরে ছুটিতেছি,—আমাদের শস্যপূর্ণ দেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন জীবিকার আবাসস্থল ছাড়িয়া,—শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির দ্বারা সমাজের ধনবৃদ্ধির জন্য নহে, দুর্ব্বলতা ও পরমুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃতির অযাচিত দান উদার উন্মুক্ত আলোক বাতাস নীলাকাশ ছাড়িয়া আমরা মোহের তাড়নায় একটা অস্পষ্ট অস্বাভাবিক সভ্যতার আলোককে চরম

লক্ষ্য জ্ঞান করিয়া নগরে ছুটিয়া আসিয়াছি, আমাদের সভ্যতার অভ্যন্তরীণ আলোক যে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে তাহা এতদিন পরে বুঝিয়াছি,—

"পর দীপশিখা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুকরণ

আমরা অনুকরণপ্রিয়, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমরা পাশ্চাত্য সমাজকে অনুকরণ করিতেছি। কিন্তু কবেকার পাশ্চাত্য সমাজ? বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজ নহে, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজের ভাব ও আদর্শকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। একটা শতাব্দী যে চলিয়া গেল তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। চীনদেশের ইতিহাসের এক শতাব্দী নহে, উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য সভ্যতার এক শতাব্দী যে অসংখ্য ভাব ও ঘটনাপুঞ্জের উপহার দিয়া গেল, আমরা তাহা উপেক্ষা করিয়াছি।

প্রাচীন ও নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতার তারতম্য

পাশ্চাত্য সমাজে এক শতাব্দীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখা গিয়াছে। সে প্রভেদ কি হইয়াছে তাহা এক কথায় ইঙ্গিত

করা কঠিন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞান-বিদের মত যদি বলি শ্রমশক্তি ধনশক্তির সংঘর্ষ এ বিপ্লবের মূলে, তাহা হইলে ঠিক বলা হয় না; রাষ্ট্রনীতির উপদেশ গ্রহণ করিয়া যদি বলি, এই বিপ্লবের মূলে—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রসূত আধুনিক ভাব ও আদর্শের সহিত মধ্যযুগের আদর্শ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের বিরোধ, তাহা হইলে আরও ভুল বলা হইবে। সত্য বলিতে গেলে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজে বিজ্ঞান ও ব্যবসায়মূলক সভ্যতার প্রথম যুগ দেখা গিয়াছে। সে যুগের লক্ষণ সমাজের উপর বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের অত্যাচার। ইহা নানা আকার ধারণ করিয়াছে,—শ্রমজীবীর উপর ধনীর নির্য্যাতন মনুষ্যের উপর কলের নির্য্যাতন, বিজ্ঞানের নির্য্যাতন, অর্থের নির্য্যাতন, আর্ট নীতি ও ধর্ম্মের নির্ব্বাসন—সকল দিকেই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অসামঞ্জস্য, অশান্তি,—বিজ্ঞান ও ব্যবসায় প্রবলপরাক্রম-শালী হইয়া সমাজকে লণ্ডভণ্ড করিতেছে, সমাজের মূলভিত্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছে, আবার সমুদ্রপারে যাইয়া দেশ বিদেশ জয় করিতেছে, সাম্রাজ্যস্থাপন, ব্যবসায়প্রচার করিতেছে, রণতরী সাজাইতেছে, আকাশতরী (airship) নির্ম্মাণ করিতেছে, রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে, মহাদেশে মহাদেশে যুদ্ধ বাধাইয়া দিতেছে।

নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতায় সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্যোগ

তবুও এই বিরোধ ও অশান্তির ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা সামঞ্জস্য বিধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা সমন্বয় বিধান করিতে বদ্ধ-পরিকর,—ধর্ম্ম, নীতি ও আর্টের সহিত বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের দ্বন্দ্ব দূর করিবার জন্য প্রয়াসী। এ সমন্বয় বিধানের নেতা কাহারা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া কঠিন। রাস্কিন, উইলিয়াম মরিশ, কার্লাইল, কার্ল মার্ক্স—সকলেই যুগান্তর আনিবার সহায়তা করিয়াছেন। আরও কত লোক কত মহাত্মা কত মহানুভব ব্যক্তি যুগান্তর আনিবার আয়োজন করিয়াছেন তাহার নাম করা যায় না। এখনও সে নবযুগ আসে নাই; পাশ্চাত্য সমাজের যুগধর্ম্মই এই যুগান্তর প্রবর্ত্তক। তাই আধুনিক সমাজের প্রত্যেক ভাবুক ও কর্ম্মবীর কোন না কোন উপায়ে নবযুগ আনয়নের সহায়তা করিতেছেন।

সমাজতন্ত্র-সমবায়

পাশ্চাত্য সমাজের আশা,—সমাজতন্ত্রবাদ অর্থের নির্য্যাতন দূর করিবে, ধনশক্তি ও শ্রমশক্তির দ্বন্দ্ব নিবারণ করিবে, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অসাম্যের পরিবর্ত্তে সাম্য আনয়ন করিবে; সমবায়—দ্রব্যোৎপাদন দ্রব্য বিক্রয়ে সমবায়—সমাজ-শক্তি ও ব্যবসায়

শক্তির দ্বন্দ্ব নিবারণ করিবে, ব্যবসায়কে সমাজের কল্যাণকর করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ব্যবসায় যাহাতে সমগ্র সমাজের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত হয়, ব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিযোগিতা দমন ও সহযোগিতার উৎসাহের ফলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের যাহাতে সুবিধা হয়, সমবায় সেই বিধান করিবে।

উদ্যানপুরী নির্ম্মাণ

সব দিকেই একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হইতেছে—সমাজ গঠনে গ্রাম ও নগরের সামঞ্জস্য বিধান হইতেছে। শিল্প ও ব্যবসায়কেন্দ্র নগরগুলি যাহাতে সমাজের সমস্ত ধন ও বুদ্ধিকে গ্রাস করিয়া পল্লীগ্রামের শক্তি শোষণ করিয়া স্ফীত কলেবরে সদর্পে সভ্যতার সর্ব্বেসর্ব্বা না হইয়া উঠে, সমগ্র সমাজেই যাহাতে দেশের শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার জন্য নগর ও পল্লীসংস্কারের (Civics) আয়োজন চলিতেছে। নগরে বিলাসিতা ও সৌখীনতার পার্শ্বে কঠোর দৈন্য দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা যাহাতে মাথা তুলিয়া না দাঁড়ায় তাহার জন্য উদ্যানপুরী (Garden city) নির্ম্মাণের ব্যবস্থা চলিতেছে। সহরনির্ম্মাণ কার্য্যে শ্রমজীবীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে।

গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের সামঞ্জস্য-স্থাপন

পোর্ট সনলাইটে একটি সুন্দর নূতন নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রমজীবীদিগের জন্য সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, নগরের

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে। বোর্ণ্‌ভিল আর একটি সুন্দর ও নূতন গ্রাম—পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গ্রাম অনেকে বলিয়া থাকেন। উদ্যানপুরী সমিতি (Garden City Association) প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার এবেনেজার হাওয়ার্ড এই গ্রাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—Bournville is one of the most beautiful villages in the world, largely because of the potentialities of a new site acquired for the definite purpose of building thereon a village in wich overcrowding shall be deliberately and permanently prevented and in which work inside the factory may be relieved by work in the Garden. লোক সংখ্যার যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না হয় এবং সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যহানি না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে। লণ্ডন হইতে প্রায় কুড়ি ক্রোশ দূরে লেচ্‌ওয়ার্থে যে উদ্যানপুরী স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ৩০,০০০ লোকের স্থান হইবে। সহরের মধ্যে উদ্যানবেষ্টিত আদর্শ কুটীর স্থাপিত হইয়াছে, সহরের বাহিরে জমিতে কৃষিকার্য্য হইবে। পুরাতন নগরও সংস্কৃত হইতেছে। অধ্যাপক গেডিস এডিনবারা নগরকে একই সঙ্গে উদ্যানপুরী ও শিল্পকেন্দ্র করিয়া গঠন করিতে চাহেন—(an industrial city and a grand city in one) এবং তাঁহার জরিপে (Civic Survey) চরম ভাবুকতা ও কঠোর বাস্তবিকতার সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে,—নগরকে তিনি

আর্ট ও কর্ম্ম, সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি করিয়া গড়িতে চাহেন—the Town as Place, as Work, as Folk,—the City of Etho-Polity, Culture and Art.

গেডীস প্রতিষ্ঠিত নগর-বিজ্ঞান

আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী অ্যাণ্ড্রু কার্ণেগী তাঁহার স্বগ্রাম ডাম ফার্ম্মলিনের উন্নতির জন্য আধ মিলিয়ন পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক গেডীস সেই উপলক্ষ্যে নগরের উন্নতি-সাধন-প্রণালী তাঁহার একখানা সুন্দর রিপোর্টে আলোচনা করিয়াছিলেন।* নগর-বিজ্ঞানের (Civics) সেই প্রথম সৃষ্টি। উদ্যানপুরী-নির্ম্মাণ গেডীস-প্রতিষ্ঠিত নগর-বিজ্ঞানের অঙ্গমাত্র। পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞান সভ্যতা-বিভাগ নীতি অবলম্বন করিয়া বিরোধ আনিয়াছে, পৃথক করিতে যাইয়া শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছে। বিরোধ ও পৃথককরণ-নীতি ত্যাগ করিয়া এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা সমন্বয় বিধান, সামঞ্জস্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর। সমাজ-তন্ত্রবাদ সমবায়-নীতির মত উদ্যানপুরীনির্ম্মাণব্যবস্থাও পাশ্চাত্য সমাজের সমন্বয় বিধানের চেষ্টার একটা প্রধান লক্ষণ।

নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ

বিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতা কানাডার বন্দরে

* P. Geddes. City Development. Park, Gardens and Culture Institutes ; a Report to the Carnegie Dumfermline Trust. Edinburg.

জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শস্যোত্তোলনের কল ভাঙ্গিয়া আরও প্রকাণ্ড কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য পাতালের নিভৃত প্রদেশে আলোক জ্বালিয়া কল পাঠাইয়া কুবেরের সঞ্চিত ধন কাড়িয়া লইয়াছে, চিকাগো সহর ভাঙ্গিয়া আবার দীর্ঘায়তন উদ্যানবেষ্টিত আদর্শ-কুটীরপূর্ণ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে, পানামা খাল কাটিয়া মহাদেশের সহিত মহাদেশের ব্যবসায় সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিয়াছে,—শিল্পচাতুর্য্যের উৎকর্ষ সাধন দেখা গিয়াছে। শিল্প সভ্যতার প্রথম যুগ অতীত হইয়াছে, Poleo-technic সভ্যতা বিদায় লইতেছে, শিল্প-সভ্যতার নূতনযুগ আসিতেছে, neo-technic সভ্যতা নূতন ভাব ও আদর্শ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে,—রাস্কিন ও কার্ল মার্ক্স নূতন বেশে আবার সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—নূতন শিল্প-সভ্যতার লক্ষণ—বিরোধ নিবারণ, সামঞ্জস্য স্থাপন। নূতন সভ্যতার ভাব ও আদর্শ synthetic. শিল্পচাতুর্য্য এইবার ভেদবুদ্ধির প্রভাবে সমাজ-বিরোধী হইবে না। শিল্পচাতুর্য্যের সহিত মহনীয় ভাবুকতার সম্মিলন হইবে। ধনীর অট্টালিকা ও শ্রমজীবীর ভাঙ্গা ঘর, ব্যবসায়ীর কারখানা ও শিল্পীর আর্টস্কুলের মধ্য দিয়া সমাজের শক্তি পৃথকভাবে সঞ্চারিত হইয়া যে পরস্পর বিরোধী হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান হইবে, দিনমজুর ও ব্যবসায়ী, সাধারণ লোক ও উকিল ডাক্তারের পরস্পর বিরোধ-পূর্ণ নগর, ভূমিস্বত্বহীন কৃষক ও শিকারপ্রিয় বিলাসী জমিদারের বিরোধপূর্ণ হতশ্রী

পল্লীগ্রাম সংস্কৃত পুনর্গঠিত হইবে। শিল্পসভ্যতা শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবে না। গাল্টন ও পিয়ার্শন প্রভৃতি ডারুইন ও ভিস্‌মানের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। *পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতা প্রাণবিজ্ঞানের* নিয়মানুসারে আর্ট, ধর্ম্ম, নীতিকে অবলম্বন করিয়াই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে—সমগ্র জনসমাজের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি তাহার লক্ষণ হইবে—তাহার আদর্শ Eugenic, Eudemic.

প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুকরণ হেতু ভারতীয় সমাজে বিরোধ ও অশান্তি

পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতার দ্বিতীয় যুগের ভাব ও আদর্শ সম্বন্ধে যে এত কথা বলিলাম তাহা কি অবান্তর হইল? তাহা নহে। যদি কাহারও তাহা মনে হয় তবে আমার আলোচনা ও আলোচনার বিষয়ের জটিলতা তাহার জন্য দায়ী। যদি স্পষ্ট ও খুব সোজাভাবে কথাটা বলিতে হয়, তবে তাহা এই, ভারতবর্ষ যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এক্ষণে অনুকরণ করিতেছে তাহা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজের অতীত ও হতগৌরব poleo-technic শিল্প-সভ্যতা। আমরা বিজ্ঞান ও শিল্প-শিক্ষায় অন্ততঃ একশত বৎসর পশ্চাতে রহিয়াছি। আধুনিক neo-technic পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতার ভাব ও আদর্শ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—তাই আমরা বিরোধমূলক

poleo-technic সভ্যতাকে অনুকরণ করিয়া নাগরিক জীবনকে চরম লক্ষ্য মনে করিয়াছি, নগরে আসিয়া কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া ধনশক্তি ও শ্রমশক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতেছি, শিল্পোন্নতিকে লক্ষ্য না করিয়া চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়াছি, জনসাধারণ ও উকিল ডাক্তার ব্যবসায়ীদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছি, দৈন্য ও দারিদ্র্যের পার্শ্বে বিলাসিতা ও সৌখীনতাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি, নগরে এক আর্ট নীতি ধর্ম্মবিবর্জ্জিত শিল্প ব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছি—পল্লীজনপদের সমস্ত ধন ও বুদ্ধি শোষণ করিয়া, পল্লীগ্রামের বৈষয়িক জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তি কৃষকের ভূমিস্বত্বের লোপ-সাধন করিয়া এবং তাহার মানসিক ভিত্তি যৌথ-পরিবারের সম্বন্ধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া। পাশ্চাত্য-শিল্প-সভ্যতায় আধুনিক যুগে যে উদ্যানপুরী নির্ম্মাণ, পল্লীসংস্কার, নগরসংগঠন, নগরকে গ্রামের সৌন্দর্য্য শ্রীতে মণ্ডিত করিবার আয়োজন চলিয়াছে তাহার খোঁজ আমরা রাখি না। আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজ নগর ও পল্লীগ্রামের বিরোধ দূর করিবার জন্য যে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, আধুনিক neo-technic সভ্যতার পক্ষে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা যে খুব বড় সমস্যা তাহার দিকে দৃকপাত না করিয়া আমরা অন্ধ হইয়া পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতার প্রথম যুগের অশান্তি ও বিরোধ আমাদের সমাজে আনয়ন করিতেছি। তাই বলিয়াছি আমরা ইউরোপীয় সভ্যতাকে অনুকরণ করিতেছি না, ইউরোপীয় সভ্যতার জীর্ণ পুরাতন সংস্করণের দুই চারিটা

পাতা আমরা ছিঁড়িয়া আনিয়াছি, তাহার বুলী আওড়াইয়া মনে করিতেছি আমরা সভ্য, উন্নত, বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ে পারদর্শী হইলাম ; এরূপে আমাদের দৈন্য ও অপমানের ত সীমা নাইই, আমরা ইউরোপীয় সভ্যতাকেও অপমান করিতেছি।

সভ্যতার প্রবাহে পল্লী ও নগরের স্থান নির্ণয়

ক্ষুদ্র একটি নির্ঝর বৃষ্টির জলে প্রাণ পাইয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছে, আরও অনেক নির্ঝর আসিয়া তাহার সঙ্গে মিশিল ; পর্ব্বতের সানুদেশে একটা স্রোতের মত দেখা গেল। স্রোত নদীতে পরিণত হইল। নদী চলিতে লাগিল, কত বন, উপবন, কত বনে-ঘেরা গরু চরাইবার মাঠ, কত শ্যামলক্ষেত্র, কৃষকের কতক ছোট ছোট কুটীর, কত হাট বাজার অতিক্রম করিয়া নদী চলিতে লাগিল, লোক-বহুল সহর আসিল, সহরের কল কারখানা চিমনির ধূম, আফিস আদালত পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, নদী তবুও চলিতে লাগিল, আরও নদ নদী আসিয়া তাহার সঙ্গী হইল। বন্দর ছাড়িয়া নদী শেষে সমুদ্রে পৌছিল। ঠিক এই প্রকারে সবকালে সব দেশে মানুষও কি নির্ঝরের সঙ্গে, সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে না? বন্য পশুর আবাসভূমি পার্ব্বত্য প্রদেশে—যেখানে মানুষ শিকারী হইয়া অতিকষ্টে আপনার জীবনরক্ষা করে—তাহার নিম্নে পর্ব্বতের সানুদেশে, গরু চরাই-বার মাঠে কিছু দূরে দুই একটা বনে-ঘেরা কুটীর—আরও নিম্নে

পার্ব্বত্য প্রদেশের একটা ছোটখাট গ্রাম ও বাজার, যতই আমরা নির্ঝরের সহিত নিম্নে নামিতেছি ততই মানুষ সংখ্যায় ও সভ্যতায় উন্নতির পথে চলিয়াছে। আরও নিম্নে আসিয়া একটা বড় গ্রামে পৌঁছিলাম,—যে সমতল ভূমির উপর দিয়া নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, তাহার মাঝখানে গ্রামটি অবস্থিত—কৃষিশিল্প ব্যবসায়ের দ্বারা মানুষ যেখানে সহজে জীবন ধারণ করিতেছে, সেখানে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন হইতেছে—কত রাস্তা রেল-লাইনও সেখানে আসিয়া মিশিয়াছে এবং মিশিয়া শিল্প বাণিজ্য সভ্যতার পুষ্টিবিধান করিতেছে। সেখান হইতে একদিনের পথ গেলে নগর—অনেকগুলি নদীর দ্বারা সেবিত, সমতল ভূমিসমূহের কেন্দ্র, নগর—শিল্প, বাণিজ্য ও সভ্যতার পরিপোষক। আরও দূরে নদী পৌঁছিবার পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড বাণিজ্য-কেন্দ্রের কারখানার গোলমাল ও চিম্‌নীর ধূমে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। দেশের উদ্বৃত্ত ধনসামগ্রী সেখান হইতে বাহিরের জগতে রপ্তানি হয়। সভ্যতার আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা যদি পল্লীগ্রাম লইয়া আরম্ভ করি, বন-উপবন সানুদেশের কথা ভুলিয়া যাই, যদি আমরা শিকারী মানুষকে একেবারে ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আমরা সমাজের আভ্যন্তরীণ রক্ষা ও পালনশক্তির বীজ খুঁজিয়া পাইব না, মণ্ডল পঞ্চায়তের উৎপত্তি কোথায় জানিব না, সমাজ শাসনের ঐতিহাসিক শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। সভ্যতার আলোচনায় নগরকে কেন্দ্র করিলে, পল্লীগ্রামকে ভুলিয়া গেলে, আমরা যাবতীয় মহনীয় ভাবের উৎসকে অগ্রাহ্য করিব, শুধু ধর্ম্মের

লীলাক্ষেত্র নহে, সুকুমার সাহিত্য, দর্শন, কলা, শিক্ষা, দীক্ষার উৎস—সকল প্রকার ভাবুকতাকেই অগ্রাহ্য করিব। পর্ব্বত, পর্ব্বতের সানুদেশ, সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র, ও বিশালনগর সকলই সভ্যতাকে তাহার আপনার দান দিয়াছে ও এখনও দিতেছে। যে নদী বিশাল নগরের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া বন্দরের দিকে যায় সেই নদীই ত পর্ব্বত, পর্ব্বতের সানুদেশ ও নিম্নের শ্যামল শস্যক্ষেত্রের স্মৃতি বক্ষে করিয়া আসিয়াছে।

জাতীয় সভ্যতা গঙ্গার পুণ্যপ্রবাহ

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশাল নগরের সমৃদ্ধি দর্শনে স্ফীত হইয়া দম্ভ করিয়া এত দিন সেই সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র পর্ব্বত পল্লীগ্রামকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল। সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, ভুল সংশোধন করিতেছে। আমাদের জাতীয় সভ্যতা-গঙ্গা পুণ্যতীর্থ গঙ্গোত্রি যমুনোত্রি অতিক্রম করিয়া কত বন উপবন শ্যামল প্রান্তর শস্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্রে মিশিবার জন্য ছুটিয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সভ্যতা গঙ্গার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গতিরোধ করিয়াছে, জাতীয় সভ্যতার পুণ্য সলিলকে খাল কাটিয়া নানা প্রবাহে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে,—তাই আমাদের সভ্যতা গঙ্গা, আমাদের সেই হরিদ্বার প্রয়াগ কাশীতলবাহিনীচিরকলতাননাদিনী গঙ্গা, বিশীর্ণদেহা, ক্ষীণকণ্ঠা হইয়াছে। আজ এই শ্রাবণের ঘন বরষায়

যখন গঙ্গার সেই ক্ষীণকায় অস্থিপঞ্জরসৈকতসার দেহ আর দেখিতেছি না, যখন সেই পূতকলতানমুখরা পূর্ণাবয়বা আবার আমাদের কর্ণে তাহার সেই পতিতোদ্ধারণ জলকল্লোল উচ্চারণ করিতেছে, আমাদের মোহান্ধ নয়নে তাহার সেই স্নিগ্ধ শীতল তরঙ্গধারা লেপন করিতেছে, আমাদের এই মোহ-পাপ-কলুষিত দেহের উপর তাহার মোক্ষদসলিলবিন্দু বর্ষণ করিতেছে,—তখন মনে হইতেছে আমাদের অনুকরণের মোহ দূর হইবে, আমরা অনুকরণের মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার সতেজ, সবল হইব, আর আমাদের জাতীয় সভ্যতা নানা সেতুর নানা বিঘ্ন নানা প্রবাহের নানা বিক্ষেপ অতিক্রম করিয়া সেই মহাসাগরে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবে—সাগরসঙ্গমের সেই মহাতীর্থে, যেখানে শুধু কলিকাতা মহানগরীর জোয়ারের জল নহে, গঙ্গা-তীরের অসংখ্য পল্লীগ্রামের তীর্থের জল আসিয়া মিশিবে—কলিকাতার মত শত নগরের কারখানার তেল ও ময়লা সে জলকে মলিন করিতে পারিবে না, নবদ্বীপের মত শত পল্লী-গ্রামের শঙ্খমুখরিত দেবমন্দিরের ছায়া সে জলে ভাসিয়া উঠিবে আর তীর্থযাত্রীকে সেই মন্দিরের দেবতার দিকে আহ্বান করিবে।

—সম্পূর্ণ—